মুজাহিদুল ইসলাম খান (সেলিম)
২/৩, নয়াপল্টন
ঢাকা-১০০০
নাসিমা সুলতানা

গাঞ্জে ফেরেস্তে

[চলচ্চিত্র ইতিহাসের দলিলগ্রন্থ]

সা'দত হাসান মান্টো

অনুবাদ

মোস্তফা হারুন

মুক্তধারা

প্রথম সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭

প্রকাশ করেছেন ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
প্রচ্ছদ এঁকেছেন ঃ
হাশেম খান
ছেপেছেন ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ
মূল্য ঃ পনর টাকা মাত্র।
[স্বঃ] জাহানারা হারুন

GANJE FERESTEY BY SADAT HASAN MANTOO
(AN ILLUSTRATED BIOGRAPHY on History of Film Industry)
Translated by Mustafa Haroon

MUKTADHARA
[Swadhin Bangla Sahitya Parishad]
74 Farashganj
Dacca—1
Bangladesh.
Price Taka 15·00

উৎসর্গ

মরহুম জহির রায়হান
ওবায়েদ-উল-হক
আজিজমিসির

ভূমিকা

সা'দত হাসান মাণ্টোর 'গাঞ্জে ফেরেস্তে' উপমহাদেশের চলচ্চিত্রে ইতিহাসের একটি দলিলগ্রন্থ বিশেষ। ১৯৬৬ সালে এই বইটি ধারাবাহিকভাবে চিত্রালীতে ছাপাবার জন্যে আমরা পাঠকদের কাছ থেকে অসংখ্য চিঠি ও অনুরোধ পাই। অনুজপ্রতিম মোস্তফা হারুন তখন উর্দু অনুবাদে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। তাকে এ ব্যাপারে বলা হলে সানন্দে রাজী হন এবং বইটি সংগ্রহ করে ১৯৬৭ সালের জুন মাস থেকে চিত্রালীতে ধারাবাহিকভাবে দিতে থাকেন। তখনকার দিনে চিত্রালীর পাঠকদের জন্যে প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় ছিল এই ধারাবাহিক লেখাটি।

সিকি শতাব্দী পূর্বে আমাদের চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি ছিল বোম্বে। বোম্বের নায়ক-নায়িকা ও চলচ্চিত্র কর্মীগণ আমাদের চিত্রদর্শকদের স্মৃতি জুড়ে আছেন এখনো। তাদের সম্পর্কে কিছু শোনার বা পড়ার নেশা আমাদের সহজাত। আজ আমাদের দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে, কিন্তু ছবির কোয়ালিটি এবং উৎকর্ষতার প্রশ্নে এখনো আমরা পরোক্ষভাবে এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দিকে দৃকপাত করি। কারণ, আমাদের চলচ্চিত্র ইতিহাসের যাত্রাশুরু হয়েছে সেখান থেকে। তাই মাণ্টোর 'গাঞ্জে ফেরেস্তে' এই উপমহাদেশ তথা আমাদের চলচ্চিত্র ইতিহাসেরই আদি উপাদান বলে আমি মনে করি। গাঞ্জে ফেরেস্তের রচনারীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে কালক্রমে আমাদের লেখকরাও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের পাঁচালী লিখবেন বলে আশা পোষণ করি।

এস. এম. পারভেজ
সাপ্তাহিক চিত্রালী, ঢাকা।

নিবেদন

উপমহাদেশের চলচ্চিত্র নগরীর উপাখ্যান খ্যাত ‘গাঞ্জে ফেরেস্তে’র মাত্র কয়েকটি অধ্যায় ’৬৭ সালে চিত্রালীতে ছাপা হয়েছিল। বাকী অধ্যায়গুলো অতি সম্প্রতি অনুবাদ করি। দেশ বিভাগের সময় মান্টো যখন পাকিস্তানে হিজরত করেন ‘লাউডস্পীকার’ নাম দিয়ে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড বের করেন। আমি এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য লাউডস্পীকারের কয়েকটি অধ্যায় অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু যখন জানতে পারলাম যে, অগ্রজ অনুবাদক কাজী মাসুম লাউডস্পীকারের কয়েকটি অধ্যায় পূর্বেই অনুবাদ করেছেন, এজন্য তার সাথে আমি সম্পূর্ণ দায়মুক্ত একটি চুক্তি সম্পন্ন করে শুধুমাত্র ‘নুরজাহান’ অধ্যায়টি এই বইতে গ্রহণ করি।

উপমহাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাস-ভিত্তিক এ ধরনের বই বাংলা ভাষায় এ-ই প্রথম। স্বনাম ধন্য প্রকাশনী ‘মুক্তধারা’ এই বইটি প্রকাশ করে একটি মহান দায়িত্ব সম্পাদন করলেন। বইটি চলচ্চিত্র-জগৎ তথা শিল্প-সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের উপকারে আসলে তবেই বুঝব আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

মোস্তফা হারুন
বি ৭৫/জি-৮, মতিঝিল
কলোনী, ঢাকা।

মুজাহিদুল ইসলাম খান (সেলিম)
২/৩, নয়াপল্টন
ঢাকা-১০০০
নাসিমা সুলতানা

সূচী

জীবন-শিল্পী মান্টো ৯
আমার কথা ১৩
অশোক কুমার ১৯
পরিরাণী নাসিম বানু ৩৭
শ্যাম ৫৩
নার্গিস ৭১
"ভি এইচ দেশাই" ৯০
হানিফ আজাদ ও জিন্নাহ্ সাহেব ৯৬
আগা হাশর ১১২
বারী সাহেব ১২৭
সম্পাদক বাবুরাও প্যাটেল ১৫৫
ইসমত চুঘতাই ১৬৯
কবি আখতার শিরানী ১৮৮
কোকিল-কণ্ঠি নূরজাহান ২০২

মুজাহিদুল ইসলাম খান (সোহাগ)
২/৩, নয়াপল্টন
ঢাকা-১০০০
নাসিমা সুলতানা

জীবন-শিল্পী মাণ্টো

সা'দত হাসান মাণ্টো—একটি নিপীড়িত কণ্ঠ। দুঃখ, যন্ত্রণা আর তিতিক্ষা-ক্লান্ত এই অমর কথাশিল্পীর কথামৃতের সাথে পরিচিত নয়, এমন বাঙালী পাঠক বিরল। তিনি কারাবরণ করেছিলেন একটি লেখার জন্যে। একটি গল্পের জন্যে, নাম 'ঠাণ্ডা গোস্ত'। এ দেশের লাঞ্ছিত অবহেলিত মানবতার নিপুণ রূপকার এবং মহান জীবনবাদী সাহিত্যশিল্পী সা'দত হাসান মাণ্টো যেন একটি তীব্র যন্ত্রণামুখর এবং অস্থির অগ্নিকুণ্ডের মতো ধিকিধিকি জ্বলে একদিন নির্বাপিত হয়েছিলেন আমাদের অজান্তে, অলক্ষ্যে। মাণ্টো আমাদের চেতনার রাজ্যে যুগযন্ত্রণা এবং জীবনানুভূতির যে নির্যাস রেখে গেছেন আমরা তার সংস্পর্শে এসে বিস্মিত হয়েছি, বিমোহিত হয়েছি। হৃদয়ের গভীর কন্দরের বাণী খুঁজে পেয়েছি আমরা তাঁর লেখায়। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে এই ভারতীয় উর্দু লেখকের মিল ছিল আশ্চর্যরকম। মাণ্টোর কোন কোন লেখা যেন মাণিকেরই কোন লেখার নকল অথবা মাণিকের কোন লেখা মাণ্টোর বলে ভ্রম হতো। জীবনের এমন অন্তরঙ্গ সুর এবং সমাজের যৌন-বিকারগ্রস্ত মানুষের চরিত্র-চিত্রণ মাণ্টোর কলমের স্পর্শে যে জীবন লাভ করেছে এমন আর হয় না।

শিল্প-সাধনার রাজ্যে এসে মাণ্টো ব্যক্তিজীবনকে নিয়ে যতখানি উপহাস করেছেন এবং দুঃখ-দারিদ্র্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন তার নজির বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নজরুল ছাড়া আর কারো জীবনে খুঁজে পাওয়া যায় না। দারিদ্র্য এবং অভাব-অনটনক্লিষ্ট জীবনের গভীরে প্রবেশ করে মাণ্টো উপলব্ধি করেছিলেন 'দুনিয়া মে জেতনী লানতেঁ হ্যায় ভুক উনকি মা হ্যায়' (বিশ্বের সকল যন্ত্রণার জননী হচ্ছে ক্ষুধা)। প্রবাস যাপনের সময় মাণ্টো একবার সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, আমার জন্ম এমন দেশে যেখানে লেখক বা বুদ্ধিজীবীদের বাড়ীও নেই গাড়ীও নেই।

মাণ্টো আমাদের জন্য প্রচুর লিখেছেন। মাণ্টোর গল্প-উপন্যাস এই উপমহাদেশের সাহিত্য জগতে কালান্তর ঘটিয়েছে। কিন্তু মাণ্টোকে আমরা কিছু দিতে পারিনি। সম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং অনিশ্চিত জীবন আর সহ্য করতে না পেরে একদিন তিনি পাকিস্তান চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু লাহোর নগরীর সাহিত্য পরিবেশ ও চিত্রাঙ্গন এই উন্নতনাসা ও চওড়া কপালের লোকটিকে বরণ করতে পারেনি যথার্থ সমাদরে। লাহোরে মাণ্টো দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছেন জীবিকার তাগিদে। দুঃখ, যন্ত্রণা ও তিতিক্ষা-ক্লান্ত এই লেখক অবশেষে আমাদের সামনে একটি বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন রেখে বিদায় নিলেন।

* * *

১৯১২ সালের এগারই মে অমৃতসরের সিমরলো নামক স্থানে মাণ্টোর জন্ম। মাণ্টোর পূর্বপুরুষরা ছিলেন কাশ্মিরী। বাপ ছিলেন একজন মুন্সেফ। অমৃতসরের কুচাওকায়লান এলাকায় মাণ্টোদের বাড়ী ছিল। পিতার দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে মাণ্টোর জন্ম। মাণ্টো মেট্রিক পাস করে কলেজে (হিন্দুসভা) প্রবেশ করে প্রগতিশীল লেখক বারী সাহেবের সংস্পর্শে আসেন।

মাণ্টোর সাহিত্যজীবনের যাত্রা শুরু অনুবাদের মাধ্যমে হয়। বারী সাহেবের পরামর্শক্রমে তিনি 'ছেরগুজাস্তে আসির' নামে ভিক্টর হুগোর একটি উপন্যাস তর্জমা করেন এবং যথাসময়ে তা প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি অস্কার ওয়াইল্ড-এর একটি নাটক তর্জমা করেন।

বারী সাহেব 'খাল্‌ক্‌' নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করতেন। মাণ্টোর প্রথম গল্প 'তামাশা' এতে ছাপা হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পটভূমিকায় রচিত এই গল্প বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সেকালে।

মাণ্টো এরপর মোপাসা, সমারসেট মম ও গোর্কির মতো লেখকদের রচনার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন। তিনি লাহোরের হুমায়ুন ও আলমগীর পত্রিকার ফরাসী এবং রুশ সংখ্যা প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

পূর্বপুরুষদের জন্মভূমি দেখার জন্য মাণ্টো একবার কাশ্মীর পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কাশ্মীরের স্মৃতি বিবৃত করেছেন তিনি তাঁর 'বিগু' এবং 'একখত' গল্পে। কাশ্মীর থেকে

প্রত্যাবর্তনের পর মাণ্টো আলীগড়ে ভর্তি হন। আলীগড়ে অবস্থানের সময় হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারের পরামর্শক্রমে এক্স-রে তোলা হলো এবং যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলে ডাক্তার রিপোর্ট দিলেন। এখানেই মাণ্টোর শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর মাণ্টোর পিতা পরলোকগমন করেন। জীবিকার অন্বেষণে মাণ্টো লাহোরে চলে যান এবং জনৈক করমচান্দের 'পারেস' নামক একটি পত্রিকায় চল্লিশ টাকা বেতনে চাকরি গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর পত্রিকার মালিকের সাথে মাণ্টোর মতদ্বৈধতা দেখা দেয় এবং চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা তখনো বেজে ওঠেনি। মাণ্টো বোম্বে চিত্রজগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। সেখানেই জীবিকার সন্ধান করতে লাগলেন। বোম্বে চিত্রজগতের কাহিনীকার, গীতিকার ও কলাকুশলীরা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করছিলেন। মাণ্টো এখানে সাপ্তাহিক 'মোসাওয়ার' নামক পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'মোসাওয়ার' সম্পাদনার মাধ্যমে মাণ্টো আবার লেখার জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এখানে তিনি যেন নবজীবন লাভ করেন। বোম্বে চিত্রজগতের বিচিত্র জীবনপ্রবাহ নিয়ে মাণ্টো গভীর অনুসন্ধিৎসায় অবতীর্ণ হন এবং এ সময় তিনি জীবনের সবচাইতে পরিণত ও ভাবসমৃদ্ধ গল্প রচনা করেন। বোম্বেতেই মাণ্টো দারপরিগ্রহ করেন ১৯৩৯ সালে। বড় ছেলে আরিফ এখানেই জন্মলাভ করে।

১৯৪১ সালে মাণ্টো 'মোসাওয়ার'-এর চাকরি ছেড়ে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে যোগ দেন। রেডিওতে থাকাকালীন মাণ্টো প্রচুর একাংকিকা ও ফিচার কথিকা রচনা করেন, যা শ্রোতাদের বিশেষ মনোরঞ্জন করেছিল। দিল্লীতে পুত্র আরিফ হঠাৎ মৃত্যুবরণ করে। মাণ্টো পুত্রশোক কোনদিন ভুলতে পারেননি।

মাণ্টো অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে মাত্র দেড় বছর চাকরি করেন। এরপর বোম্বের ফিল্মস্তান লিমিটেডের কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার হিসাবে নিয়োজিত হন। এখানে থাকতেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গাঞ্জে ফেরেস্ত (বোম্বে নগরীর চলচ্চিত্র উপাখ্যান) গ্রন্থ রচনায় হাত দেন। তাছাড়া কতগুলি জনপ্রিয় ছায়াছবির কাহিনীও তিনি এখানে থাকতেই লেখেন। 'আটদিন' নামক

তাঁর লিখিত একটি ছবিতে তিনি নিজে অভিনয়ও করেন। বিখ্যাত পরিচালক সোহরাব মোদী মহাকবি গালিবের ওপর যে প্রামাণ্য ছবি করেছিলেন মাণ্টো তার কাহিনী লিখেছিলেন।

বোম্বে নগরীতে তিনি তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি অতিবাহিত করেন। একটি শ্রান্তিহীন সংগ্রামমুখর জীবনের পরিশেষে তিনি ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানে চলে যান এবং ১৯৫৫ সাল অবধি লাহোরে বসবাস করার পর দুঃখ-দারিদ্র্য এবং হতাশা নিয়ে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

'খুল দো', খালিবোতল, শহীদ, বদনাম ও টাঙ্গাওয়ালার মতো কাহিনীর স্রষ্টা তাঁর জীবনে এতটুকু শান্তি যেমন পাননি তেমনি পাননি স্বীকৃতি। জীবনের অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা আর বেদনাবিদ্ধ আত্মা নিয়ে মাণ্টো ছুটাছুটি করেছেন—পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের মতো। মাণ্টো মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে নিজের ডায়েরীতে লিখেছিলেন ঃ

'দুঃখ-দুর্দশার এক চরম সন্ধিক্ষণে আমি বেঁচে আছি। সারা দিনমান অক্লান্ত পরিশ্রম করেও দৈনন্দিন প্রয়োজনটুকু মেটাবার মতো উপার্জন করতে পারি না। এই গ্লানি এবং তিতিক্ষা আমাকে সারাক্ষণ নিষ্পিষ্ট করছে। আজ যদি আমি দু'চোখ মুদে ফেলি তাহলে স্ত্রী এবং তিনটি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকার কি উপায় হবে?'

মাণ্টোর গল্পে সমাজের বিকারগ্রস্থ, অপ্রকৃতিস্ত ও যৌন-বিকৃত চরিত্ররা এসে ভিড় করেছে। সব রকম সামাজিক অনাচার ও বিবর্তনের মূলে মানুষের এমন একটি প্রবণতা কাজ করে যাচ্ছে যা তথাকথিত সমাজ সকল আইনের অনুশাসনে চাপা দিয়ে রেখেছে, মাণ্টো একথাই সোচ্চারে বলতে চেয়েছেন তাঁর লেখায়। সে প্রবণতাটি হচ্ছে ক্ষুধা এবং যৌনঅতৃপ্তি। মাণ্টো বলেন, 'বিশ্বের সকল যন্ত্রণার জননী হচ্ছে ক্ষুধা। ক্ষুধা পাপের জন্ম দেয়। ক্ষুধা দেহ বিক্রি করতে বাধ্য করে। ক্ষুধা চরমপন্থী সৃষ্টি করে। ক্ষুধার হামলা অত্যন্ত ভয়াবহ। ক্ষুধা মানুষকে দিশাহারা করে তোলে এবং বেদিশায় পড়ে মানুষ আবার ক্ষুধার্ত হয়ে উঠে।'

—মোস্তফা হারুন

[৭ই ভাদ্র ১০৮২ সালে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত]

আমার কথা

'ঠাণ্ডা গোস্ত' এর মামলা প্রায় এক বছর চলেছিল। নিম্ন আদালতে আমাকে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং তিনশ' টাকা জরিমানা করেছিল। সেসনে আপিল করার পর মুক্তি পেলাম। (এর পরও সরকার আমার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করে রেখেছে যার এখনো শুনানী হয়নি!)

এ সময় আমার দিনগুলো কিভাবে কেটেছে তার কিছুটা আভাস আপনারা 'ঠাণ্ডা গোস্ত' এর ভূমিকাতে পাবেন। মনের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কি করব ভেবে কুল কিনারা পেলাম না। লেখা ছেড়ে দোব কিনা তাই ভাবছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, মন এত তিত বিরক্ত হয়ে উঠেছে যে, ইচ্ছে হচ্ছে কোন কিছুর একটা এলটম্যাণ্ট হলে লেখার চর্চাটা ছেড়ে দিয়ে কিছুকাল নিরিবিলি জীবনটা কাটাব। এর পর মনে কোন লেখার ঝোঁক চাপলে তাকে ফাঁসী দোব। এলটম্যাণ্ট না হলে ব্লাক-মার্কেটিং অথবা বে-আইনী মদের কারবার করব কিনা তাও ভাবছিলাম। শেষোক্তটি এজন্যে সম্ভব নয় যেহেতু আমি ভয় করতাম, পাছে সব মদ নিজেই না পান করে ফেলি। আর ব্লাক মার্কেটিং করতে হলে মেলা টাকার দরকার। সুতরাং তাও সম্ভব না। একমাত্র এলটম্যাণ্টটাই হলে হতে পারে। আপনারা আশ্চর্য হবেন, এ সব আমি সত্যি সত্যি করতে চেয়েছিলাম। অতঃপর বাধ্য হয়ে নিজের গাঁট থেকে নগদ টাকা সরকারের তহবিলে গচ্চা দিয়ে দরখাস্ত করলাম। বললাম, আমি অমৃতসরের মোহাজের। বেকার অবস্থায় আছি। দয়া করে কোন প্রেস অথবা সিনেমার কিয়দংশ আমার নামে এলটম্যাণ্ট করার আজ্ঞা হোক।

দরখাস্তের ছাপানো ফর্মে আজব ধরনের প্রশ্নাবলী ছিল। প্রত্যেক প্রশ্ন এমন যে, উত্তরদাতাকে প্রচুর মিথ্যা কথা বলতে হবে। কিন্তু এ অভ্যাস আমার প্রথম থেকেই ছিল না। আমি এ ব্যাপারে অনেক ঝানু লোকদের

সাথে পরামর্শ করলাম। তারা বলল, তোমাকে মিথ্যা বলতেই হবে। অবশ্য যখন ফরম পূরণ করতে বসলাম তখন শতকরা দুই তিন আনার বেশী মিথ্যা বলতে পারিনি। যখন ইণ্ট রভিউ হল, আমি তাদেরকে সাফ সাফ বললাম, আসলে দরখাস্তে যা লেখা আছে তার সবি মিথ্যা। সত্য হলো আমি ভারতে এমন বেশী কিছু সম্পত্তি রেখে আসিনি। শুধুমাত্র একটা বাড়ী ছিল। আমি আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি না। আমার মতে আমি একজন মস্তবড় গল্প লেখক। কিন্ত এখন বুঝলাম, একাজ আমাকে পোষাবে না। খোদা এম. আসলাম এবং ভারতী দত্তকে সুখে রাখুন। গল্প-গুরু হিসাবে আমি তাদের পায়ে মাথা নত করি। এখন চাচ্ছি সরকার আমাকে এমন একটা এলটম্যাণ্ট দিক যার বদৌলতে আমি কাজ করে দিব্যি মাসে পাঁচ ছ'শ' টাকা রোজগার করতে পারি।

আশ্চর্য যে, আমার কথায় তাদের সুমতি হল। কোন একটা বরফের ফেক্টরীর এলট্ম্যাণ্ট প্রায় পেয়ে যাচ্ছিলাম এমতাবস্থায় কে একজন বলল, এ তোমরা কি করছ? এ লোকটি, যার নাম সা'দত হাসান মাণ্টো—নেহাতই বামপন্থী লেখক। অবশেষে আমার দরখাস্ত নাকচ করে দিল।

এদিকে এব্যাপার হলো, আবার ওদিকে প্রগতিশীল লেখকরা আমাকে রক্ষণশীল বলে আমার অন্নজল সব বন্ধ করার ব্যবস্থা করল। বেশ মজা হ'ল। অনেক ভেবে চিন্তে আবার কলম হাতে নিলাম। কিন্ত কি লিখব তা নিয়ে চিন্তা করলাম। অনেক চিন্তার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, আমার জানা শুনা চিত্র তারকাদের সম্পর্কে কিছু লিখি। এটা কিছু নিরাপদ হবে।

প্রথমেই 'পরীরানী নাসিম বানু' সম্পর্কে লিখলাম। দৈনিক 'আফাকে' ছাপা হলো। ভাবলাম বেশ একটু, পথ খুলে গেল। এবার আর সরকারের কোন মাথাব্যথা থাকবে না। পাঠকদের মধ্যেও সহজেই সাড়া পড়ে যাবে। কিন্ত এটা ছাপা হবার পরই দেশময় একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। আমাকে গালাগালি করে অনেক চিঠি এলো পত্রিকা অফিসে।

৩রা জুলাইর আফাকে কাজি এম. বশির মাহমুদ সাহিত্যরত্নের চিঠি ছাপা হলো। তাতে লেখা ছিল ঃ

“সা'দত হাসান মাণ্টোর লিখিত 'পরীরানী নাসিম বানু' পড়লাম। এবং সেই সাথে ভাইকে লিখিত নাসিম বানুর চিঠিও পড়লাম।

মাণ্টো বড় মুন্সিয়ানা করে বোনটির দোষ-গুণ, এটাসেটা এবং ব্যক্তিগত কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মনে হয় তিনি বোনটির ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদা সম্পর্কে অনেক সত্য কথা জেনেও এড়িয়ে গেছেন। এটা নিঃসন্দেহে তাকে অপমান করার শামিল।

এভাবে লিখতে গিয়ে একটু আড়াল আবডাল বা সংযমের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। তাঁর ভাষা বা বাক্য-বিন্যাসের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। তবে আমি জিজ্ঞেস করি, নাসিম বানু কি মাণ্টোর আপন বোন? মাণ্টো তার প্রেম ইত্যাদি সম্পর্কে লিখবার মত শক্তি বা সাহস রাখেন?

মাণ্টো অত্যন্ত দুষ্টু। আমি তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করি। আমি তাঁর বহু সাহিত্যকর্ম দেখেছি। কিন্তু এবারে যা দেখলাম একেবারে আশাহত। আমি মাণ্টো বন্ধুর 'নাসিম বানু' সম্পর্কে কোন অভিমত পেশ করছি না। তাছাড়া সমালোচনাই বা কি করতে পারি? সে পর্যন্ত পৌঁছতে আমার এখনো অনেক বাকী।”

এ চিঠি পড়ে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তা দূর করার জন্যে আমি আবার কিছু লিখে সরোয়ার সাহেবকে দিলাম।

এ চিঠির প্রতিবাদে আরো চিঠি এলো। আরো অনেক বাদ-প্রতিবাদ চলল।

সরোয়ার সাহেব এদিকে আমল না দিয়ে আমাকে বললেন,

'তুমি লিখতে থাক। বেশ মজার বিষয়। কারো কথা না শুনে তুমি লিখে যাও।'

আমি তাঁর কথা মত লিখে যেতে লাগলাম। আর মানুষের অভিসম্পাত এবং পত্রবৃষ্টিও পড়তে লাগল দেদার। এরপর যেবারে 'শ্যাম' সম্পর্কে লিখলাম, শিয়ালকোট থেকে নাইয়ার বানু নাম্নী এক মহিলার বিরাট চিঠি পেলাম। তা পড়ে আমি অবাক হলাম। তার কিয়দংশ এখানে দিলাম।

'আমি সিনেমা দেখাকে 'কবিরা গুনা' মনে করি না। ছবি দেখলেই চোখে কাপড় বেঁধে পালিয়ে যাই না। কিন্তু আমার ছেলেমেয়ে আছে।

আমি চাই তারা ভালো হোক। সিনেমা দেখে চরিত্র গঠন হয়না। বরং নষ্ট হয়। এ জন্যে আমি সিনেমা দেখা ছেড়ে দিয়েছি। আমি গেলে তারাও যাবে। তাদেরকে নিরস্ত করা যায় না।

আমি এত বড় হয়েছি। এখনো এমন অনেক ছবি আছে যা দেখলে মন বড় খারাপ হয়ে যায়। তখন এমন খারাপ লাগে মনে হয় কারো নগ্ন অবস্থায় আমি সেখানে বিনা অনুমতিতে ঢুকে যাচ্ছি। আর এটা নিঃসন্দেহে শালীনতা বিরুদ্ধ। আপনি বলবেন, এসব ছবির বই পুস্তক পত্রিকা বাচ্চাদের নাগালে না রাখলেই তো হয়। কিন্তু এটা কতক্ষণ সম্ভব? এসব পড়া শুনা করে আর আলমারীতে তো বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয়।

'মুরলীর ধ্বনি' আবার একটু পড়ে বলুনতো এটা কোন ধরনের? একটা লোক যত বড় পাপীই হোক না কেন, এ লেখা ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে কি করে সে পড়বে? সে যত বড় মদ্যপায়ীই হোক বা বেশ্যা বাড়ীতে পড়ে থাকুক বা হাজারো অনাচার করুক, সে যখন মনে করবে 'মাগী কোথায়'? এবং না পেলে বিছানা জালিয়ে দেয়, তখন কেমন লাগে? এটা কোন ধরনের মনুষ্যত্ব। এসব জিনিস খবরের কাগজের মারফতে ছড়ানোর কি মানে আছে?

সবারই ঘর সংসার আছে, ছেলে সন্তান আছে। এদের ধ্যান-ধারণা ঘর-সংসার এবং ছেলেপিলের পরিবেশ মাফিক হওয়া দরকার। সারা-জগৎ তো আর পুরুষদের জন্যেই বরাদ্দ নয় যে যা তা করে বেড়াবে। নিজেরা তো অধঃপাতে যাচ্ছেই, সেই সাথে নিষ্পাপ শিশু-সন্তানদেরকেও সেদিকে টেনে নিচ্ছে। ঘর ছেড়ে পালানোর দশা হয়েছে এখন। এখন উচিত হচ্ছে পুরুষদের হাতে ছেলে সন্তান প্রতিপালনের ভার দেয়া। তখন বুঝবে মজাটা। তখন বাপ ছেলেকে শিখাবে কি করে মদমত্ত হয়ে 'শালী মাগী' বলে মেয়েদেরকে টেনে নিয়ে যেতে হয়। তওবা, তওবা—কি মনুষ্যত্ব—কি সমাজ?

আমি এ চিঠি পড়ে সত্যি দুঃখিত হলাম। আর যা-ই করেছি আর না করেছি, নাইয়ার বানুর প্রতি আমি অবিচার করেছি। তার অবস্থা দেখে আমার খুব দরদ হলো। আমাকে এর প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। আবার ভাবলাম, সত্যিকার অর্থে যেভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা যদি

করি, তাহলে (এ মহিলা যেহেতু কোন কোন ছবি দেখে মনে করেন কারো নগ্ন অবস্থায় বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়েছেন) এ মহিলা হয়ত তা সহ্য করতে পারবেন না। এমনও হতে পারে যে, তিনি মরে যাবেন।

আমি এব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, নাইয়ার বানু মানসিক রোগ-গ্রস্তদের মধ্যে যে পর্যায়ভুক্ত তাদের প্রতি মানুষের করুণা করা উচিত। তার চিকিৎসা সম্পর্কে যতটুকু আমি মনে করি তাহলো, তার সামনে বোতলের মুখ খুলে মদের উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে, মাথায় কাদা মেখে, মুখে গালি গালাজের তুবড়ী ছুটিয়ে মাতলামী করতে হবে। প্রয়োজন হলে এ কাজ যদি নিজে না পারা যায় লোক ভাড়া করতে হবে। এরপর শামা, বিশবী সাদি, রুমান এবং এ ধরনের নানান পত্রিকার লেখাগুলো বিজ্ঞাপন সমেত জোরে জোরে পড়ে তাকে শুনাতে হবে। এভাবে যদি তার রোগমুক্তি না হয় তাহলে সা'দত হাসান মাণ্টোকে যেন বলা হয়, নাইয়ার বানুর পুরনো সেণ্ডেল এনে নিজের মাথায় মেরে নাইয়ার বানুর পূত পবিত্রতাকে উদ্ধার কর।

আমি অনেক চিন্তা করে এই বইর নাম 'গাঞ্জে ফেরেস্তে' রেখেছি। যথার্থভাবে এ বইর জন্যে এ নাম প্রযোজ্য (গাঞ্জে ফেরেস্তের অর্থ দাঁড়ায় নিষ্পাপ ফেরেস্তার দল)।

এরপর 'তিন গুলে' যখন ছাপা হলো, খাজা ফরখান্দা বুনিয়াদী নামক জনৈক ব্যক্তি 'আফাক'-সম্পাদকের নামে এক চিঠিতে জানালো যে,

আপনি 'আফাকে'র সাহিত্য সংখ্যায় সা'দত হাসান মাণ্টোর 'তিন গুলে' ছেপে সিরাজী মরহুম মাণ্টো সাহেব এবং 'আফাকে'র সাথে অবিচার করেছেন। এই প্রবন্ধগুলো কোন বিশেষ মহলের জন্য অবশ্য সুপাঠ্য। কিন্তু একটা রুচিশীল পত্রিকায় এটা ছাপানো মোটেই উচিত হয়নি।

পৃথিবীর প্রায় সভ্য দেশেই এই রীতি প্রচলিত আছে যে, মানুষ মারা গেলে দুশমন হলেও সম্মান সহকারে তার কথা বলতে হয়। তার দোষ ঢেকে গুণগুলো বলতে হয়। সিরাজীর মধ্যে যদি কোন দুর্বলতা থেকেও থাকে তা তার বিশেষ বন্ধুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যাথায় সবাই তাকে একজন বড় কবি এবং সাহিত্যিক হিসাবেই জানতো। কি আশ্চর্য,

তার এক বন্ধু তার মৃত্যুর পর তার সব দোষগুলো জনসাধারণের সামনে বিশ্রী ভাষায় তুলে ধরছে।

ইসমত যেমন 'দোজখী' লিখে নিজের ভাইর গুণ কীর্তন প্রকাশ করেছে, আমাদের লেখকরাও আজকাল সে পথ অনুসরণ শুরু করে চলেছে। আর বিশেষ করে এই লেখার ভাষা এত অশ্রাব্য—নগ্ন এবং অশ্লীল যে রীতিমত তওবা পড়তে হয়। যাদের শালীনতাবোধ আছে তারা এসব কি করে পড়বে? এ প্রবন্ধ ঘরের বৌ-ঝি মায় ছেলে-মেয়ে কেউই পড়তে পারে না। মাণ্টোকে ছাড়া আপনার সাহিত্য সংখ্যা কি অসম্পূর্ণ থাকত?

মরহুম সিরাজী, মাণ্টো এবং 'আফাকে'র উপর যে জুলুম হবার ছিল তাতো হয়েই গেল। তারপর এ সংকলন প্রকাশের পর আরো যে সব জুলুম হবে তার পাপ-পুণ্য আমার মাথায় পেতে নিলাম। আর এ পাপ বুনিয়াদী সাহেবের কথাকে সামনে রেখেই আরম্ভ করলাম। তিনি লিখেছেন, 'সভ্য সমাজে মানুষ মারা গেলে দুশমন হলেও সম্মান সহকারে তার কথা বলতে হয়। দোষগুলো রেখে গুণগুলো বলতে হয়।'

এমন সমাজ এবং সভ্যতার উপর হাজার বার অভিসম্পাত, যেখানে মানুষ মারা গেলে তাদের কৃতকর্মের সম্ভার লণ্ড্রিতে পাঠিয়ে খুব সাফ সাফাই করে ধোলাই করা হয় এবং অতঃপর বিধাতার জন্যে টানিয়ে দেয়া হয়।

আমার প্রসাধন কক্ষে কোন প্রসাধন দ্রব্য নেই ভাই। না আছে এখানে কোন শ্যাম্পু, না আছে পাউডার স্নো, না আছে চুল বানাবার কোন মেশিন। আমি সাজগোজ করতে জানি না। প্রসাধন করে আসল চেহারা ঢাকতে জানি না। 'আগা হাসর'-এর সিক্ত নয়নযুগলকে আমি সাদা চোখে দেখতে পারি না। তার মুখ থেকে গালিগালাজ ছাড়া ফুল ঝরাতে পারিনা। সিরাজীর ভ্রষ্টতাকে আমি ইস্ত্রি করতে পারিনি। বন্ধু শ্যামকে আমি বাধ্য করতে পারিনা যে সে অন্য মেয়েদেরকে 'শালী' না বলুক। এ পুস্তকে যে সব ফেরেস্তাদের সমাবেশ—নিঃসন্দেহে তাদের মাথা মুড়ানো হয়েছে। এবং এ কাজে আমি একটুও শিথিলতা করিনি।

—সা'দত হাসান মাণ্টো

লাহোর, ১১ই জানুয়ারী '৫২ ইং

মুজাহিদুল ইসলাম খান (সোহাগ)
২/৩, নয়াপল্টন
ঢাকা-১০০০
মা. সাহা সুলতানা

অশোক কুমার

নাজমুল হাসান যখন দেবীকা রাণীকে নিয়ে উধাও হলো, বোম্বে টকিজের মধ্যে রীতিমত একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। সবে ছবি তোলা শুরু হয়েছিল। দু'চারটা দৃশ্য গ্রহণের পরই নায়ক তার নায়িকাকে সেলুলয়েডের জগৎ থেকে সাক্ষাৎ বাস্তব জগতে নিয়ে চলে গেল। এ সময় বোম্বে টকিজের হিমাংশু বাবুরই সবচে বেশী বিপদ। বিরাট চিন্তার পাহাড় নেমে এলো তাঁর উপর। কারণ তিনিই দেবীকা রাণীর একমাত্র স্বত্বাধিকারী স্বামী এবং বিখ্যাত বোম্বে টকিজের প্রাণসর্বস্ব।

এ সময় এস. মুখার্জী (অশোকের ভগ্নিপতি) বোম্বে টকিজের সাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার সাবাক ওয়াচার সহকারী ছিলেন। শুধু বাঙালী বলেই হিমাংশু রায়ের প্রতি তাঁর দরদ ছিল। যেভাবে হোক দেবীকা রাণী যাতে ফিরে আসে সে চেষ্টায় তিনি লেগে গেলেন। এ ব্যাপারে 'বস' হিমাংশু রায়ের অনুমতি ছাড়াই তিনি তলে তলে চেষ্টা চালালেন। এবং কোলকাতায় গিয়ে অনেক সাধ্য সাধনা করে অবশেষে দেবীকা রাণীকে ফিরিয়ে আনলেন। প্রেমাস্পদ নাজমুল হাসানের বাহুমুক্ত হয়ে একদিন সত্যি সত্যি দেবীকা রাণী যখন বোম্বে এসে হাজির হলো সর্বত্র একটা সাড়া পড়ে গেল। দেবীকা রাণীকে ফিরিয়ে এনেই এস. মুখার্জীর কর্তব্য শেষ হলো না। এরপর হিমাংশু বাবুকে প্রসন্ন করানো মায় দেবীকা রাণীকে পুনরায় গ্রহণ করানোর ঝকমারিও তাঁকে পোহাতে হলো। অবশ্য বেশী চেষ্টার দরকার হয় নি। সহজেই দেবীকা-হিমাংশু মিলে গেলেন। আর ওদিকে বেচারী নাজমুল হাসান সেসব প্রেমিকদের তালিকাভুক্ত হয়ে রইলো যারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পুঁজিবাদী চক্রান্তে পড়ে প্রেমিকাদের হারিয়েছে।

ছবিটির যে ক'টি দৃশ্য তোলা হয়েছিল কাচি চালিয়ে তার প্রায় অনেকাংশ কেটে ফেলা হলো। তখন প্রশ্ন উঠল, দেবীকা রাণীর বিপরীতে এবারকার নায়কটি কে হবেন? এবার যাতে আর না নিয়ে ভাগতে পারে।

হিমাংশু রায় কঠোর পরিশ্রমী এবং নিষ্ঠাবান চিত্রনির্মাতা। সব ব্যাপারেই তিনি ছিলেন অনুসন্ধিৎসু। অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং যত্ন সহকারে তিনি তিলে তিলে বোম্বে টকিজকে গড়ে তুলেছেন। একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ বিদ্যাপীঠের মত মনে হতো বোম্বে টকিজকে। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে যাতে বোম্বে টকিজের পত্তন হতে পারে এজন্যে তিনি শহর থেকে দূরে 'মিলাদ' নামক গ্রামে বোম্বে টকিজের জায়গা নিলেন।

যাক সেকথা। নায়ক নির্বাচনের ব্যাপারে বাইরের লোককে হিমাংশু বাবু আদৌ পছন্দ করতেন না (নাজমুল হাসানও যেহেতু বাইরের লোক ছিলো)।

এবারেও এস. মুখার্জী হিমাংশু বাবুর সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন। তাঁর শ্যালক অশোক বি. এস-সি পাস করে এক বছর কোলকাতাতে ওকালতি পড়ে অবশেষে বোম্বে টকিজের লেবোরেটারিতে বিনে পয়সায় কাজ শিখছিল। দেখতে শুনতে মন্দ ছিলো না। অল্প স্বল্প গান বাজনাও রপ্ত ছিল। এস. মুখার্জী একদিন কথায় কথায় অশোকের কথা পাড়লেন। হিমাংশু বাবু বললেন, 'আগে ক্যামেরার সামনে টেষ্ট করে দেখতে হয়।'

জার্মান ক্যামেরার সামনে টেষ্ট হলো। জার্মান ফিল্ম ডিরেক্টর মিঃ ক্লান্স অষ্টিন অশোক সম্পর্কে ভাল মত না দেয়া সত্ত্বেও অভিজ্ঞ হিমাংশু বাবু অশোককে পছন্দ করলেন। অতঃপর চতুর্দিকে একটা মিষ্টি খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, দেবীকা রাণীর বিপরীতে অশোক গাঙ্গুলী নায়ক হিসাবে অবতরণ করছে। অশোকের বয়স তখন ২২ বছরের মত হবে।

দু'টা একটা করে অশোক-দেবীকার বেশ কটা ছবিই তৈরী হল। সব ক'টিই দেখবার মত। অশোক-দেবীকা এক রোমান্টিক জুটি হিসেবে চিত্রামোদীদের মনোরাজ্যে স্থায়ী আসন গেড়ে ফেলল! লাস্যময়ী দেবীকা আর নবাগত প্রতিভাদীপ্ত নায়ক অশোক—একেবারে সোনায় সোহাগা। সারা দেশের চিত্রামোদী, বিশেষ করে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অশোকের দেদার ভক্ত গড়ে উঠতে লাগল। সেকালে একমাত্র অশোকই ছিল আইডিয়াল হিরো। কলেজের ছাত্ররা অশোকের বেশবাস অনু-

করণ করত। অনেকেই খোলা আস্তিনওয়ালা অশোক মার্কা বাঙালী পাঞ্জাবী পরতো। পথে-ঘাটে তখন অশোকের মুখের সেই গানটি প্রায়ই শুনা যেত……

তু বন কি চিড়িয়া
মাই বনকা পন্‌ছি
বন বন বুলুঁরে।

আমি অশোকের মাত্র কয়েকটি ছবি দেখেছি। অভিনয়ের দিক থেকে দেবীকা রাণী অশোকের চেয়ে বেশ কয়েক পা আগে ছিল। নায়ক হিসাবে অশোককে প্রথম মনে হতো চকোলেটের মত। কিন্তু পরে অবশ্য তার সে সব বাঙালী আফিম মার্কা জড়তা কেটে যায়।

প্রথম দিকে অশোক যখন লেবরেটরীর বহির্ভাগে কাজ পেল তখন তার বেতন ছিল পঁচাত্তর টাকা। তা দিয়েই অশোক দিব্যি হালে ছিল। একা একজনের জন্যে কতইবা আর লাগতো সেকালে। তাছাড়া থাকত শহরতলীতে। সেখানে খাই-খরচা ছিল নেহাত কম। এরপর অশোকের বেতন যখন বেড়ে দেড়শ' টাকা হলো সে খুব খুশী হলো। কিন্তু যেবারে তার বেতন আড়াইশ' টাকা হলো সে ত হতবাক! তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আমাকে বলল, "বাই গড. মাণ্টো, আমার অবস্থা তখন এমন হয়েছিল, তোমাকে আর কি বলব—আমি কেশিয়ারের কাছ থেকে যখন আড়াইশ' টাকা হাতে নিচ্ছিলাম, তখন উত্তেজনায় রীতিমত হাত কাঁপছিল। ভেবে পাচ্ছিলাম না যে, এত টাকা কোথায় রাখব। ছোট্ট মত একটা বাসা আমার। একটা চারপেয়ে আর গোটা তিন চারেক চেয়ার, এই ছিল কুল্লে আমার আসবাব পত্র। ঘরের চারদিকে ঘন জঙ্গল। যদি কেউ টের পায় যে, আমার কাছে এত টাকা আছে এবং রাতে এসে যদি আমার টুটি চেপে ধরে। ভয়ে আমার গা শিউরে উঠেছিল। অবশেষে বুদ্ধি করে আমি নোটগুলো বিছানার নিচে ছড়িয়ে রাখলাম; সারারাত অনেক আজব আজব স্বপ্ন দেখলাম। সকালে উঠে আমি সোজা পোষ্টাপিসে গিয়ে টাকা জমা রেখে এলাম।"

অশোক তার বাড়ীতে বসে আমাকে এসব বলছিল, এমন সময় কোলকাতা থেকে একজন প্রযোজক এলেন। কণ্ট্রাক্ট তৈরী ছিল। কিন্তু

ভয়ানক দরকষাকষি হচ্ছিল। প্রযোজক ৮০ হাজার পর্যন্ত দিতে রাজী। কিন্তু অশোক পুরো এক লাখ থেকে নিচে নামছেনা, কোথায় আড়াইশ টাকা আর কোথায় এক লাখ।

বোম্বে টকিজে অশোক যেমন দিন দিন উন্নতি করে যাচ্ছিল তেমনি তার ভগ্নিপতি এস. মুখার্জিও দ্রুতগতিতে উন্নতির সোপান অতিক্রম করছিলেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন তিনি। দেখতে দেখতে জাঁদরেল প্রডিউসর হয়ে বসলেন। বোম্বে টকিজের ঝাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে তিনি অনেক গোল্ডেন এবং সিলভার জুবিলী প্রাপ্ত ছবি নির্মাণ করেন। দৃশ্য গ্রহণের ব্যাপারে তিনি এক নতুন টেকনিকের প্রবর্তন করেন, যা পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়।

অশোকের জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। সে বাইরে বড় বেশী বের হতো না। লোকদের সাথে মেলামেশা ছিল না। কালেভদ্রে যখনই সে বের হতো, পথে ঘাটে একটা দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার বেধে যেত। ট্রাফিক বন্ধ হয়ে যেত। তার ভক্তদেরকে নিরস্ত করতে পুলিস বেচারীদের নাকে দম এসে যেত।

কিন্তু কি আশ্চর্য, ভক্তদের উৎপীড়নের মুখে অশোক অত্যন্ত কঠোর মূর্তি ধারণ করত। হঠাৎই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। লোককে গালি দিলে যেমন চটে যায়, অশোকও ঠিক তেমন করত। আমি তাকে অনেকবার বলেছি,

"দাদামণি, তোমার এ অভ্যাসটা বড্ড খারাপ। পৃথিবীতে ক'জনেরই বা এমন ভক্ত আছে? অথচ এতে তুমি খুশী না হয়ে বরং ক্ষেপে যাও লোকরা কি মনে করে? লোকরা যে তোমায় কত ভালবাসে তা কি তুমি জান?"

কিন্তু এসব কথা বুঝবার মতো ওর মস্তিষ্কে কোন আলাদা কামরা ছিল বলে আমার মনে হয় না।

প্রেমের ব্যাপারে অশোক বরাবরই গা বাঁচিয়ে চলতো। মনে হতো নেহাতই অর্বাচীন এ ব্যাপারে (বিভাগ-পূর্ব কালের কথা বলছি)। অসংখ্য সুন্দরী মেয়ে তার জীবনে এসেছে। কিন্তু সবারই বুক ভেঙে দিয়েছে সে। ওর স্বভাবে অনেকটা জাঠপনা ছিল। খাওয়া-দাওয়া চলা

ফেরা—সব কিছুতেই ওর একটা আলাদা গোয়ার্তুমী ছিল।

দেবীকা রাণী ওর সাথে প্রেম করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে সে মোটেই পাত্তা দেয়নি। অন্য এক চটকদার একট্রেস একটু দুঃসাহসিক ভাবেই একদিন তাকে বাড়ীতে ডেকে পাঠালো এবং বেশ চিনি মধু মিশিয়ে প্রেম নিবেদন করল। কিন্তু অশোক যখন তাকে অত্যন্ত কাটখোট্টা ভাষায় প্রত্যাখ্যান করল, তাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল,

'আসলে আমি আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম। আপনি ত আসলে আমার ভাইর মত।'

ওদিকে অশোক কিন্তু তার দেহটা পসন্দ করতো। সাজগোজ করে যখন তার দেহটাকে ফুটিয়ে তুলত অশোকের বড় ভাল লাগত। কিন্তু ভাই ডেকে সে শখ মাটি করে দিল।

যদিও অশোক প্রেমের ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল, কিন্তু অন্যান্যদের মতো একটু উঁকি ঝুঁকি মারার অভ্যেসটা ছিল। যে-কোন মেয়েরই আকর্ষণীয় দিকটা খুঁটে খুঁটে দেখতো এবং তা নিয়ে বন্ধু মহলে বেশ চাটনী তৈরী করতো। কখনো সখনো কাউকে কামনাও করত। কিন্তু সাহস পেতনা। আমাকে বলত,

'সত্যি মান্টো, যা-ই বলো সাহস হয় না।'

এব্যাপারে যদিও সে একেবারে হাঁদারাম ছিল, কিন্তু এটা নিসন্দেহে তার দাম্পত্যজীবনের জন্য পরম আশীর্বাদ। এব্যাপারে স্ত্রী শোভা প্রায়শ বলতেন,

হাজার শোকর ভাই। গাঙ্গুলী এদিক দিয়ে বড় ভালো। ভগবান যেন তাকে সে পথে না নেয়।

রোজ তার নামে নানা ঢংএর প্রেমনিবেদন নিয়ে হাজারো মেয়ের চিঠি আসতো। কিন্তু যতটুকু আমি জানি, বড় জোর শ'খানা চিঠি অশোক পড়ে দেখত। বাকী গুলো তার সেক্রেটারী ডি, সুজা তাকে মজা করে করে পড়ে শুনাত।

দেশ বিভাগের কয়েক মাস আগে অশোক 'চন্দ্র শেখরে'র স্যুটিং-এর ব্যাপারে কোলকাতা এলো। প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সেখান থেকে ১৬ মিলিমিটারের এক ছবি দেখে ডেরায় ফিরছিল।

পথিমধ্যে দুটো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে তার গাড়ী আটকালো এবং লিফ্‌ট্‌ চাইল। অশোক প্রথমটায় ভ্রূ কুঁচকালো। কিন্তু পরে ভাবল, মন্দ কি কিছুক্ষণ মজাতো হবে। অশোক তাদেরকে লিফ্‌ট্‌ দিল। কিন্তু খেসারত বাবত তার দামী সিগারেট কেসটা হারাতে হলো। সিগারেটের সাথে সিগারেটের কেসটাও গায়েব করে দিল।

কুলাপুরে ঢাল, তলোয়ার আর যুদ্ধ-বিগ্রহ মার্কা একটা বিরাট ছবি তৈরী হচ্ছিল। অশোকের কিছু কাজ তাতে বাকী ছিল। তারা খবরের উপর খবর দিত। কিন্তু অশোক যেতে চাইত না। চরিত্রটি তার পসন্দ-সই ছিলনা। কিন্তু করা কি, চুক্তি বদ্ধ যে। অবশেষে একদিনের জন্যে তাকে যেতেই হলো। সংগে আমাকে নিয়ে নিল। ফিলমিস্তানের জন্যে আমি 'আটদিন' এর কাহিনী লিখছিলাম। ছবিটি প্রযোজনা এবং পরিচালনা করছিল অশোক। তাই বলল,

'চলো ইয়ার, সেখানেই আরামসে কাজ করা যাবে।'

কিন্তু আরাম আর কোথায়? লোকরা হঠাৎ জেনে গেল অশোক কুমার এসেছে। অশোকের হোটেল আর কুলাপুরের পথে ঘাটে ভীড় সামলানো দায় হয়ে পড়ল। হোটেলের মালিক অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে লোকদেরকে নিরস্ত করল। আপনারাতো জানেন, ভক্তদের প্রতি অশোক অত্যন্ত বদমেজাজী। এজন্যে সে তাদেরকে টিকিটি পর্যন্ত দেখতে দেয়নি।

এক বিকেলে আমরা বেড়াতে বের হলাম। চোখে কালো গগল্‌স আর আজব ধরনের বেশবাস দিয়ে অশোক ছদ্মবেশ ধারণ করল। এক হাতে ছড়ি আর অন্য হাতে আমার কাঁধ। প্রয়োজন বোধে আগু-পিছু যেন করতে পারে। স্টুডিওর ধূলাবালি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে একটা কিছু প্রতিষেধক ঔষধ তার কেনা দরকার। হাঁটতে হাঁটতে এক স্টোরে যেয়ে উঠল।

দোকানীর কাছে যখন সে ঔষধ চাইল, দোকানী আলমারীর দিকে যেয়ে হঠাৎ সাপ দেখার মত চমকে উঠে বলল,

'আপনি কে?'

'আমি? আমি আমিই।'

'আপনি কি অশোক কুমার নন?'

অশোক কুমার

‘আমি অশোক কুমার হতে যাব কেন? অশোক অন্য কেউ হবে হয়ত। চল মাণ্টো, আর দাঁড়াবার দরকার নেই।’

অতঃপর ঔষধ না কিনেই আমাদেরকে ফিরতে হলো। হোটেলের মোড়ে আসতেই তিনটি মারাঠি মেয়ের আবির্ভাব হলো। বেশ সুন্দরী—সাজগোজও বেশ করেছে। চুলের খোপায় ফুল। পায়ে হালকা চপ্‌পল। সবে কেনাকাটা করে ফিরছিল বোধ হয়। হাতে কি যেন ছিল। অশোককে দেখতেই তাদের একজন রীতিমত কাঁপতে কাঁপতে বলল, ‘ঐ দেখ অশোক।’ এবং হাতে যা ছিল পড়ে রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। এসব কাণ্ডকারখানা দেখে অশোক আমার কাঁধ ছেড়ে দৌড় দিল।

শেষের দিকে এস. মুখার্জী তার দলবলসহ বোম্বে টকিজ ছেড়ে এসে ফিলমিস্তান নামে এক নতুন চিত্রপুরীর পত্তন করেন। এখানে অশোকের সাথে আমার প্রথম দেখা। এমনিতে এখানে সেখানে তাকে ক'বারই দেখিছি। কিন্তু সত্যিকার দেখা যাকে বলে তা ফিলমিস্তানেই হয়েছে। আমি তখন ফিলমিস্তানে চাকরি করি।

এটা চিত্রজগতের বৈশিষ্ট্য চিত্র-তারকাদের পর্দাতে যেমন দেখায় পর্দার অন্তরালে তাদের অন্যরূপ। আমি যখন অশোককে ঘনিষ্ঠ আলোকে দেখলাম, পর্দার অশোকের সাথে তার কোন সাদৃশ পেলাম না। গাঢ় শ্যামলা রং, মোটা কর্কশ হাত, কাট-খোট্টা দেহ, চলাবলায় একটা গোয়ার্তুমী ভাব—সর্বোপরি পদে পদে কৃত্রিম লৌকিকতা। যখন পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো আমি বললাম,—আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশী হলাম। প্রতি-উত্তরে অশোক কর্কশ ভাষায় কিছু একটা বলল। মনে হলো আমার উপর সে চটে আছে।

একবার এক মহারথী ফিলমিস্তান পরিদর্শনে এলেন। অশোকের সাথে পরিচয় হতেই বললেন,—আপনার সাথে পরিচিত হয়ে মনে হয় কত কাল থেকেই যেন আপনাকে চিনি।

অশোক একটু চটে গিয়ে বলল,—“তা আপনার মুখোমুখি তো আমি কোন দিন হই নি।” ‘মুখোমুখি’ শব্দটা যে অপ্রযোজ্য হঠাৎ অশোক তা আঁচ করে ফেলল। কিন্তু বড় পাকামো করে লজ্জাটা হজম করে নিল।

অশোক উর্দু ভালবাসতো। প্রথমদিকে সে উর্দুতে লেখা-পড়া দুটোই শিখেছিল। কিন্তু পরে সব এলোমেলো হয়ে যায়। তবুও মাঝে মধ্যে এক আধটু উর্দু যা লিখতো মন্দ হতো না। দেশ বিভাগের পর আমি যখন বোম্বে টকিজ ছেড়ে চলে এসেছিলাম অশোক আমাকে ফিরে যাবার জন্য উর্দুতে চিঠি লিখেছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, নানা কারণে আমি সে চিঠির জবাব লেখার সময় করে উঠতে পারি নি।

অন্যান্য মেয়েদের মত আমার সহধর্মিণীও অশোকের বড় ভক্ত ছিল। একদিন অশোককে আমার বাসায় নিয়ে গেলাম। ঘরে ঢুকে সাফিয়াকে ডাকলাম,—'সাফিয়া, দেখ অশোক এসেছে।'

সাফিয়া ভেতরে রুটি সেঁকছিল, কয়েকবার ডাকাডাকির পর বের হল। আমি তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম,—'এ হচ্ছে আমার স্ত্রী —দাদামণি হাত মিলাও।'

দুজনের মধ্যেই কেমন জড়তা লক্ষ্য করলাম। আমি অশোকের হাত টেনে নিয়ে বললাম,—'হাত মিলাও দাদামণি, তোমার এত লজ্জা কেন?' বাধ্য হয়ে তাকে মিলাতে হলো। ঘটনাক্রমে সেদিন আমাদের কিমারুটি হচ্ছিল। অশোক অবশ্য খেয়ে এসেছে। তবু যখন সে খেতে বসল তিন তিনটে রুটি শেষ করল।

শুনে আশ্চর্য হবেন, আমাদের মধ্যে একটা শুভযোগ ছিল। যখনি আমার বাসায় কিমারুটি হতো কেমন করে যেন এসে হাজির হতো সে।

অশোককে দাদামণি বলার একটা ইতিহাস আছে। আমাদের বন্ধুত্ব যখন বেশ জমে উঠেছে একদিন অশোক আমাকে বাধ্য করল তাকে দাদামণি ডাকবার জন্যে। আমি অস্বীকার করে বললাম,—'তোমাকে দাদামণি ডাকব কোন্ দুঃখে? তুমি কি বয়সে আমার চেয়ে বড় হবে?'

এরপর সত্যি সত্যি বয়সের হিসাব করা হল। তাতে দেখা গেল, অশোক আমার চেয়ে ক'দিনের বড় অথচ আমার ধারণা ছিল আমি ওর বড় হব। অবশেষে বাধ্য হয়ে তাকে আমার দাদামণি ডাকতে হলো। দাদামণি ডাকটা আমার বেশ পছন্দ হতো। বাঙালীদের এ ডাকটা নাকি অত্যন্ত মিষ্টি।

প্রথমদিকে ও আমাকে মিঃ মাণ্টো ডাকত। কিন্তু দাদামণি ডাকার পর থেকে ও আমাকে শুধু মাণ্টো ডাকত। অবশ্য শুধু 'মাণ্টো' আমার ভাল লাগতো না।

অশোকের বাহুতে এত জোর ছিল যে, সে অনায়াসে দরজা জানালার শিক বাঁকা করে ফেলতে পারত। রোজ ঘরে বক্সিং খেলতো। শিকারের শখ ছিল। কঠিন থেকে কঠিনতর কাজ করতে পারত। কিন্তু আমার বড্ড খারাপ লাগতো ওর ঘরের অগোছালো ভাব। সাজগোজ বা জাঁকজমকের তেমন কোন খেয়াল ছিল না। ইচ্ছা করলে আসবাবপত্র এটা সেটা দিয়ে সে তার বাড়ীকে যথেষ্ট সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে পারতো। কিন্তু সেদিকে তার মোটেই খেয়াল ছিল না। যদি কালেভদ্রে কোন সময় খেয়াল হত, এমন সব পাগলামী করতো যা ভাবলে হাসি পায়। একদিন হয়তো ব্রাশ রং আনিয়ে নিজেই ঘরের আসবাবপত্র নীল করতে শুরু করে দিল। হয়ত বা কোন শোফার পেছনের পদযুগল ভেঙে খাজাঞ্চির টেবিলের মত করে রাখত।

সমুদ্রের তীরে এক নোংরা এলাকায় তার বাড়ী ছিল। জানালার গরাদে এসে লবণাক্ত পানির ঝাপটা লাগত। সমুদ্রের হাওয়া মন উদাস করে দিত। কিন্তু অশোক সে সম্পর্কে নিরাসক্ত ছিল। বাইরের করিডোরে থাকত তার রেফ্রিজারেটর। তার পাশে এলশেসিয়ান কুকুরটা ঘুমাত। পাশের কামরায় হয়ত ছেলেরা হৈচৈ করছে। এদিকে অশোক হয়তো গোসলখানায় বসে দেয়ালে হিসাব করে দেখছে যে, আজকের রেসে কোন, ঘোড়া জিতবে। অথবা সংলাপের খাতা হাতে নিয়ে নিজের অভিনয়ের কথা চিন্তা করছে। অশোক জ্যোতিষ শাস্ত্র মায় হাত গণনা জানত। এসব সে তার পিতার কাছ থেকে শিখেছিল। এ-সম্পর্কে তার রীতিমত স্টাডি ছিল। অবসর সময়ে সে তার বন্ধুদের হাত গুণে দেখত। একদিন আমার হাত দেখে বলল, 'তুমি বিয়ে করেছ?'

—'কেন, তোমার জানা নেই?'

এরপর কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর সে বলল, 'হ্যাঁ, জানি, কিন্তু মাণ্টো একটা সত্য কথা বলবে? অ না……এখনো তো তোমার পুত্র সন্তান হয় নি।'

আমি বললাম,—'আসলে ব্যাপার কি?'

—'না. তেমন কিছু নয়। তবে তোমার মত যাদের হাত তাদের প্রথম সন্তান ছেলে হয়। …কিন্তু সে সন্তান বাঁচে না।'

আসলে অশোক জানতো না যে আমার এক বছরের এক ছেলে মারা গেছে।

অশোক আমাকে বলল, তারও প্রথম ছেলে হয়েছিল এবং ছেলেটি হয়েছিল মরা। সে আমাকে জানালো তার এবং আমার হাত প্রায় এক রকমের। যাদের হাতের রেখা এ ধরনের তার ঘরে অবিশ্যি প্রথম ছেলে হবে এবং হয়ে মরে যাবে।

জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং গণনায় অশোক পয়লা নম্বরের ওস্তাদ ছিল। অশোক বলত, যেমন টাকা পয়সার হিসাবে ১ পাইর হের ফের হলে গোলমাল বেধে যায়, জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনার ব্যাপারটাও ঠিক তাই। একটু এদিক সেদিক হলে আর হলো না।

রেসের জয়-পরাজয়ের ব্যাপারেও অশোক জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর পুরোপুরি বিশ্বাস করত। আমার জানামতে সে একশ' টাকার বেশী কোন দিনই খেলেনি। এবং বড় আশ্চর্যের বিষয়, প্রত্যেক বারেই সে জিতেছে। একেবারে কম পেলেও একশ' টাকার উপর দশ টাকা পেয়েছে। অবশ্য হারজিতের ব্যাপারে তার তেমন মাথাব্যথা দেখি নি। শুধু শখের বশেই রেসের টিকিট কিনত। রেসের সময় তিন সন্তানের মা তার প্রিয়তমা সুন্দরী স্ত্রী শোভাও সাথে থাকত। মেম্বার এনক্লোজার-এ ঢুকে এক কোণে বসে পড়ত। শোভাই টিকেট কিনতেন। তারপর রেস শেষ হলে টাকা তোলার কাজও শোভাই করতেন।

শোভা একান্তভাবে ঘরোয়া স্বভাবের। পড়ালেখা বেশী জানতেন না। অশোক বলত, 'পড়া-লেখা যা-ই থাকুক আমাদের জীবনটা কিন্তু বেশ।' এত টাকা পয়সা হওয়া সত্ত্বেও শোভা ঘরের কাজ-কর্ম নিজ হাতে করতেন। খাঁটি বাঙালী মেয়েদের মত বাসন মাজা, কাপড় ধোয়া থেকে আরম্ভ করে ঘর-কন্নার সব কাজ নিজে করতেন। সব সময় তাঁর আঁচলের কোণায় চাবির গোছা থাকত। যখন হুইস্কি চলত, আনুষঙ্গিক নানা জিনিস শোভাই পরিবেশন করতেন।

আমি বরাবরই বেশী পান করতাম। এজন্যে শোভা অশোককে সাবধান করে দিয়ে বলতেন, 'দেখ গাঙ্গুলী, মিঃ মান্টোকে বেশী দিবে না। মিসেস মান্টো কিন্তু আমাকে ধমকাবে।'

মিসেস মান্টো এবং মিসেস গাঙ্গুলী, পরস্পরে সই ছিল। তাদেরকে দিয়ে আমরা অনেক কাজ বাগিয়ে নিতাম। যুদ্ধের দরুন একবার তো সিগারেট আর পাওয়া যায় না। বাইরে থেকে যাই আসতো সব ব্লাক মার্কেটিং হয়ে যেত।

আমরা তখন এই দুই সইকে মার্কেটিং-এ বের করে দিতাম। প্রায় দোকানীরাই অশোকের সুবাদে শোভাকে চিনত। এবং নির্বিবাদে তাদেরকে ব্লাকের মাল বের করে দিত। তাছাড়া এমনিতেও বোম্বের লোকেরা মেয়েদের ব্যাপারে একটু স্পর্শকাতর ছিল।

অশোক কোন সময়ই তার খ্যাতির সাহায্যে কাজ বাগাতে চাইত না। অবশ্য অশোকের সুবাদে অনেকেই অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকত। এ ব্যাপারে রাজা মেহেদী আলীর একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল।

একদিন অশোকের সেক্রেটারী আমাকে ফোনে জানালো যে, রাজা মেহেদী আলী অসুস্থ। গিয়ে দেখলাম সত্যি অসুস্থ। নানা লক্ষণ দেখে আমি ডিপথেরিয়া বলে আশংকা করলাম। তাড়াতাড়ি অশোককে ফোন করে দিলাম। অশোক আমাকে তার এক পরিচিত ডাক্তারের কথা বলে তার কাছে নিয়ে যেতে বলল, আমি তাড়াতাড়ি গাড়ী আনিয়ে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। ডাক্তারও ডিপথেরিয়া বলে সাব্যস্ত করলেন। আমি তাকে হসপিটালে ভর্তি করিয়ে প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রের বন্দোবস্ত করলাম। পরদিন সকালে আমি আবার অশোককে রাজার অবস্থা জানালাম। কিন্তু অশোক এ ব্যাপারে তেমন ঔৎসুক্য প্রকাশ করল না। আমি রেগে গিয়ে তাকে বেশ কয়েক কথা শুনালাম। সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আজ সন্ধ্যায় যাওয়া যাবে।'

আমার ইচ্ছা ছিল না যে, অশোককে আর এ বিষয়ে কোন কথা বলি। কিন্তু সন্ধ্যার সময় অশোক আমাকে অলির অফিসে এসে পাকড়াও করল। অসুখের আগে রাজা মেহেদী আলী অলির জন্যে একটা

কাহিনী লিখছিল। অশোক হসপিটালে পৌঁছে রাজার কাছে নানা কাজের অজুহাত দেখিয়ে ক্ষমা চাইল।

দ্বিতীয় দিন হসপিটালে পৌঁছে দেখি এলাহি কাণ্ড। রাজার সে অবস্থা আর নেই। রাজা এখন রাজা বনে বসেছে। পরিষ্কার সুন্দর বিছানা। পান সিগারেট আর ফলমূলে টেবিল ভরা। পাশের ফ্লাওয়ার ভাসে নানা রং-এর ফুল সাজানো। একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে রাজা বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার এ অবস্থা কেন রাজা?'

রাজা মুচকি হেসে বলল, 'এ আর কি দেখছ। পাশের রুমে যেয়ে দেখো কি সব কাণ্ডকারখানা। খোদা বাঁচিয়ে রাখুক আমাদের অশোককে। অশোক এলো না কেন?'

আসলে গতদিন অশোককে দেখেই সবার চক্ষু চড়কগাছ। অশোকের বিদায়ের পর ছোট বড় সবাই রাজার কাছে এসেছে। তাকে বেশীর ভাগ যেসব প্রশ্ন করা হয়েছিল তা হলো ঃ 'অশোক কি সত্যি আপনাকে দেখতে এসেছিলেন?'

'অশোক তার কি হন?'

'অশোক আবার আসবেন কি?'

'যদি আসেন কখন আসবেন?'

রাজা তাদেরকে অকপটে জানালো যে, অশোক তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার জন্যে প্রাণ দিতেও অশোক প্রস্তুত। অশোক আজ রাতে হসপিটালেই থেকে যেত কিন্তু স্যুটিং আছে বলে থাকতে পারল না।

এসব শুনে আমি চলতে উদ্যত হচ্ছিলাম, এমন সময় একদল মেডিকেল কলেজের ছাত্রী অশোকের তালাশে রাজার কামরায় প্রবেশ করল।

নিঃসন্দেহে অশোক প্রতিভাবান অভিনেতা। কিন্তু অশোকের একটা রোগ ছিল। তাহলো, জানাশুনা পরিচিত পরিবেশ ছাড়া সে ভাল অভিনয় করতে পারত না। অপরিচিত লোকদের সাথে পার্ট পড়লে কেমন যেন তার অভিনয় খাপছাড়া হতো। অশোকের নিজস্ব একটা গ্রুপ ছিল। চুক্তিপত্রের সময় সে তার গ্রুপকে প্রাধান্য দিত। নিজের গ্রুপের সাথে প্রাণ খুলে অভিনয় করতে পারত। নিজের অভিনয় সম্পর্কে

পুরোপুরি সজাগ থাকত। যাকে তাকে তার অভিনয়ের কথা জিজ্ঞেস করত।

শিক্ষিত, বিচক্ষণ তদুপরি বহুকাল বোম্বে টকিজের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে অশোক চিত্রশিল্পের প্রায় সব দিকেই ভাল জ্ঞান রাখত। ক্যামেরার খুঁটিনাটি মারপ্যাঁচ জানত। লেবরেটরীর পরিস্ফুটন মায় সব রকম টেকনিকেল জিনিস তার জানা ছিল। ভাল এডিটিংও করতে পারত। এত কিছু অভিজ্ঞতা ছিল বলেই ফিলমিস্তানের রায়-বাহাদুর চুনীলাল তাকে একটা ছবি পরিচালনা করতে বললেন। অশোক স্বচ্ছন্দেই রাজী হয়ে গেল।

সেকালে ফিলমিস্তানের প্রচারমূলক ছবি 'শিকারী' সবে শেষ হয়েছে। এই সুযোগে আমি ঘরে বসে কয়েক মাসের ছুটি উপভোগ করছিলাম। এরি মধ্যে একদিন সাভাক ওয়াচা আমার বাড়ী এসে উপস্থিত। নানা কথার পর বলল, 'মাণ্টো, গাঙ্গুলীর জন্যে একটা কাহিনী লিখে দিতে হয়।'

আমি তার কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। কাহিনী লেখাই তো আমার কাজ। ফিলমিস্তানে কাহিনী লেখার কাজের জন্যেই তো আমার চাকরি। তা আবার নতুন সুপারিশ করে বলার কি দরকার?

পরে জানলাম, অশোক নিজেই একটা ছবি প্রডিউস করতে চায়। এবং তার ইচ্ছা আমি যেন তার জন্যে একটা ভাল কাহিনী লিখি। অশোক নিজে আসেনি তার কারণ হলো সে আরও ক'জন থেকে প্লট নিচ্ছে।

অতঃপর এব্যাপারে সাভাক ওয়াচার মনোরম ফ্লাটে আমাদের ত্রিরত্নের সম্মেলন হল। অশোক বলল, 'তা মাণ্টো, আসলে এমন একটা কাহিনী লিখতে হয় যা খুব হিট করবে। জান তো এটা আমার পয়লা ছবি।'

ওয়াচার ফ্লাটেই আমাদের আড্ডা চলল। কিন্তু কাহিনী কি যে লিখবো তার কূল কিনারা পাচ্ছিলাম না। সেকালে আগা খানের ডায়মণ্ড জুবিলি হচ্ছিল। সাভাকের ফ্লাটের অপরদিকে বুরে বুরণ স্টেডিয়ামে মস্তবড় প্যাণ্ডেল তৈরী হয়েছে। আমি তা থেকে একটা কিছু প্রেরণা নিতে চেষ্টা করলাম। সাভাকের সিটিং রুমে একটা চমৎকার ভাস্কর্য ছিল। তা থেকেও কিছু খাড়া করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন কূল-কিনারা পেলাম না।

সারাদিন পর আবার বাইরের ট্রেনে ব্রাণ্ডির পর্ব চলল। সামনে চার্চগেট স্টেশন। নিচে বাজারের চেঁচামেচি। দূরে সমুদ্রের পানি দেখা যাচ্ছে। সড়কে দামী গাড়ীর আনাগোনা। এর একটু পরেই একটা যন্ত্রদানব সড়ক কাঁপিয়ে কোত্থেকে যেন এসে পড়ল। আমি এরকম একটা আশংকাই করছিলাম। জানিনা আমার মাথায় কোত্থেকে এসব খেয়াল আসে। ভাবলাম, হঠাৎ যদি কোন মেয়ে একটা চিরকুট লিখে বাতাসে ছাড়ে এই উদ্দেশ্যে যে, এটা যার কাছে যেয়ে পৌঁছবে তাকেই সে বিয়ে করবে। এবং তা উড়ে এসে যদি আমাদের মধ্যে পড়ে? অথবা সেটা উড়ে যেয়ে যদি কোন প্যাকার্ড গাড়ীতে পড়ে—এমনকি এই সড়ক বিদীর্ণ করা ট্রাক ড্রাইভারের কাছেও যদি পড়ে?

এই 'যদি এমন হতো'র খেয়ালটা আমি ওদেরকে বললাম। অশোক বলল, 'লেখো না, এটা নিয়েই লেখা আরম্ভ কর।'

অতঃপর কাহিনী তৈরী হয়ে গেল। কিন্তু তাতে সুন্দরীর চিরকূট বা বিদীর্ণ করা ইঞ্জিন—কোন কিছুই দেয়া গেল না। কাহিনীর পরিণতিতে কিছুটা বিয়োগান্তক ভাব দেখা দিল। কিন্তু অশোক বলল, কমেডি কর। অবশেষে তাই করলাম। কাহিনী অশোকের পছন্দ হলো। এরপর সে কাহিনীর ছবিও তৈরী হয়ে গেল।

একথা হয়ত কারোই জানা নেই যে, 'আট দিন' নামক আরো একখানি ছবির পরিচালনাও অশোকই করেছিল। ডি. এন. পাইর তাতে এক পাইয়ের কৃতিত্বও নেই। সেকালে বোম্বে টকিজে পরিচালকদের তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। সবাই শলা-পরামর্শ করে ছবি তৈরী করত। ছবি রিলিজ হবার সময় সবাই মিলে এক জনের নাম দিয়ে দিত। ডি. এন. পাই আসলে একজন এডিটর ছিলেন। কিন্তু কাজ-কর্মে ভাল ছিলেন।

'আটদিনের' স্যুটিং-এর সময়ই আমি পরিচালক অশোককে আবিষ্কার করি। তার প্রতিভায় মুগ্ধ হই। প্রতিটি দৃশ্য সে অতি যত্নে গ্রহণ করত। এবং দিনের শেষে বাথরুমে যখন গোসল করতে যেত তখন নখের দিকে তাকিয়ে সব কিছু পুনরায় ভাবত। এটা তার একটা আজব অভ্যাস ছিল যে, কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যা সে বাথরুমে যেয়ে সল্‌ভ্‌ করত।

এ ছবিতে চারজন নতুন মুখ দেয়া হয়েছিল। তারা হলেন, রাজা মেহেদী আলী খান, উপেন্দ্রনাথ আশ.ফ., মোহসীন আবদুল্লা (নায়নার প্রাক্তন স্বামী) এবং আমি হতভাগা। এরপর এস. মুখার্জীকেও একটা চরিত্র দেবার কথা ছিল। কিন্তু যথাসময় তিনি সম্মত হলেন না। কারণ, 'চল. চল রে নওজোয়ান' এ ক্যামেরার ঝলক সহ্য করতে না পেরে আমি কাজ বাদ দিয়েছিলাম। এবং সেটাই এস. মুখার্জীর বাহানা হলো। আসলে সে নিজেও ক্যামেরার আলো সহ্য করতে পারত না। পোশাক আশাক সব কিছু তৈরী ছিল। কিন্তু যথাসময় মুখার্জী বেঁকে বসাতে সব নস্যাৎ হয়ে গেল। ক'দিন স্যুটিং বন্ধ ছিল।

একদিন অশোক আমার বাড়ী এসে উপস্থিত। আমি তখন ক'টা দৃশ্য পুনরায় লিখছিলাম। অশোক আমার লেখার সরঞ্জাম একদিকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'চলো আমার সাথে।'

আমি ভাবছিলাম, নতুন কোন গান বোধহয় তৈরী হয়েছে আমাকে তা শুনাবে। কিন্তু কি আশ্চর্য, আমাকেই সেটে নিয়ে গিয়ে, বলল, 'সেই পাগলের রোলটা তোমাকে নিতে হবে।'

আমি আগেই জানতাম এস. মুখার্জি এ চরিত্রে অভিনয় করছে না। এ চরিত্রের জন্যে অশোক লোকও পাচ্ছে না। কিন্তু এভাবে যে আমাকে পাকড়াও করবে তা আমি ভুলেও চিন্তা করিনি। আমি বললাম, "তুমি পাগল হয়েছ, দাদামণি?"

অশোক বলল, "যাই বলো মাণ্টো, তোমাকে পার্ট নিতেই হবে।" রাজা মেহেদী আলী এবং উপেন্দ্রনাথ অশোকের কথায় সায় দিল। রাজা মেহেদী বলল, 'পাগলের অভিনয় করলে তোমার ক্ষতিটা কি হবে শুনি?"

এরপর আমাকে নিয়ে বেশ মহড়া চললো। দেখতে দেখতে সাদাত হাসান মাণ্টো ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট করবারাম বনে গেল। ক্যামেরার সামনে আমার যে অবস্থা হয়েছে তা একমাত্র খোদাই জানেন।

ছবি তৈরীর পর দেখা গেল অভিনয় মন্দ হয় নি। সমালোচকরা ভাল সমালোচনা করেছে। আমরা খুব খুশী হলাম। ঠিক করলাম পরে আরো এ ধরনের নতুন ছবি করব। কিন্তু কালক্রমে তা আর হয়ে উঠে নি।

সাভাক ওয়াচা 'আট দিনের' স্যুটিং-এর প্রথম দিকেই মায়ের অসুখের ব্যাপারে লণ্ডন চলে গিয়েছিল। দীর্ঘকাল পর সে যখন ফিরে এল তখন চিত্র-শিল্পে বেশ উত্থান-পতন হয়ে গেছে। অনেক সংস্থাই লালবাতি জ্বালিয়েছে। বোম্বে টকিজের অবস্থাও টলমল। হিমাংসু রায়ের তিরোভাবের পর দেবীকা রাণী রাশিয়ার এক যাযাবর নবাবের শিল্পীর পুত্র রোরকের সাথে পরিণয়াবদ্ধ হয়ে চিত্রজগৎ ছেড়ে দিয়েছে। দেবীকা রাণীর পর অনেক মহারথীই বোম্বে টকিজের কর্ণধার হলেন। কিন্তু কেউই বোম্বে টকিজের ভাগ্য ফিরাতে পারলেন না। অবশেষে সাভাক ওয়াচা লণ্ডন থেকে ফিরে এসে অশোকের সহযোগিতায় বোম্বে টকিজ নিজের হাতে নিয়ে নিল।

তখন অশোকও ফিলিমিস্তান ছেড়ে দিয়েছে। এ সময় লাহোর থেকে মিঃ মোতি বি গেরওয়ানী আমাকে মাসিক ১ হাজার টাকার অফার দিয়েছিল; আমি চলে যেতাম। কিন্তু সাভাকের অপেক্ষায় আর গেলাম না। তারপর সাভাক এসে বোম্বে টকিজের বাগডোর নিজের হাতে নিয়ে নিলে আমি তার সাথে থাকলাম। তখন দেশ ভাগাভাগির কাজ প্রায় চূড়ান্ত হয়ে এসেছে। এ সময় চারিদিকে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। এখানে ওখানে ক্রিকেটের উইকেটের মত মানুষের মস্তক উড়তে লাগল। এবং যেখানে সেখানে অগ্নিকাণ্ড দেখা দিল।

সাভাক ওয়াচা সবে বোম্বে টকিজের দুরবস্থা শুধরে নিয়ে সুশৃংখলভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছিল। এ সময় তাকে নানা অসুবিধার সন্মুখীন হতে হয়। কতিপয় দুষ্ট হিন্দু স্টাফকে ছাটাই করে সেস্থলে যাদেরকে নিয়োগ করল তারা সবাই ছিল মুসলমান। তাঁরা হলেন আমি, শাহেদ লতিফ, ইসমত চুগতাই, কামাল আমরোহী, হাসরাত লাখনুভী, নজীর আজমিরি, নাজেম পানিপথি এবং সঙ্গীত পরিচালক গোলাম হায়দার।

এ ঘটনার পর থেকে পদচ্যুত হিন্দুরা সাভাক এবং অশোকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। আমি এ ব্যাপারে অশোকের মনোযোগ আকর্ষণ করলে সে বলল, 'দাঁড়াও, আমি সাভাককে বলব। ও সব দমন করে ফেলবে।'

কিন্তু দমন করার ফল উল্টোভাবে দেখা দিতে লাগল। অনেক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির চিঠি আসতে লাগল সাভাকের নামে। প্রায় চিঠিতেই মুসলমানদেরকে স্টুডিও থেকে বের করে দেবার তাগিদ।

সাভাক এসব চিঠি পড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠত এবং বলত, "শালারা বলে, আমি নাকি ভুল পথে আছি। আমি ভুল পথে থাকলে শালাদের কি? আগুন যদি লাগে সে আগুনে আমি তাদেরকেই ঠেলে দেব।"

অশোক সব সময়ই জাতিগত বিদ্বেষের উর্ধ্বে ছিল। সে এসব কথা ভেবেও দেখত না। সে এসব ধমক শুনলে প্রায়শ বলত, "মাণ্টো, এসব হলো পাগলামী। আস্তে আস্তে সব কিছু থেমে যাবে।"

কিন্তু থেমে যাবার পরিবর্তে এই পাগলামী নিরন্তর বেড়েই চলল। এ ব্যাপারে আমি নিজেকেই বেশী অপরাধী মনে করলাম। কারণ অশোক এবং সাভাকের সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। আমি ভাবতাম, আমার কারণে যদি বোম্বে টকিজের কোন ক্ষতি হয় তাহলে অশোক এবং সাভাককে কি করে মুখ দেখাব।

চারদিকে দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। পথে-ঘাটে খুন-খারাবী চলছে। এমন সময় আমি এবং অশোক বোম্বে টকিজ থেকে বাসায় ফিরছিলাম। অশোকের বাসায় পৌঁছে ভাবলাম কি করে আমার বাসায় যাই। কিছুক্ষণ পর অশোক বলল, 'চল মাণ্টো, তোমাকে রেখে আসি। যা হয় হবে।'

রাস্তা সর্ট করার জন্যে সে মুসলমান বস্তির ভিতর দিয়ে চলল। সামনে থেকে একটা বিয়ের বারাত আসছিল। আমি যখন তাদের বাজনা শুনলাম অশোকের হাত ধরে কেঁদে বললাম, 'দাদামণি, এ তুমি কোথায় এলে?'

অশোক আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'চুপ কর কোন চিন্তা নেই।'

আমি কোন চিন্তা না করেই বা থাকি কি করে? এই মুসলমান বস্তিতে হিন্দু বলতে কোন লোক নেই। অশোককে কে না চেনে? সবাই জানে অশোক হিন্দু। এবং এত বড় হিন্দু যে, যার রক্তপাত করতে পারলে তাদের অস্ত্র সার্থক হবে। আমি আরবী ভাষায় কোন দোয়া কালাম জানতাম না। মনে মনে আমি নিজেকে অভিসম্পাত দিতে লাগলাম। এবং মনে মনে খোদাকে বলতে লাগলাম, হে খোদা, এমন যেন না হয় যে, মুসলমানরা অশোককে মেরে ফেলবে আর আমি তার রক্ত সারা জীবন ভর কাঁধে নিয়ে বহন করব।

গাড়ী যখন বারাতের সামনে এসে ঠেকল অনেকেই 'অশোক অশোক' বলে চীৎকার করে উঠল। আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। অশোক নির্বিকার স্টিয়ারিং ধরে বসেছিল। আমি গলা বের করে বলতে যাচ্ছিলাম যে, সাবধান আমি মুসলমান। অশোক আমাকে বাড়ীতে পেঁাছে দিতে যাচ্ছে। এমন সময় দু'জন যুবক এসে বলল, 'অশোক ভাই, সামনের রাস্তা বন্ধ। বামদিকের গলি দিয়ে কেটে পড়ুন।'

গলি দিয়ে গাড়ী যখন নিরাপদে পার হয়ে গেল। আমার দেহে প্রাণ ফিরে এলো। অশোক হেসে বলল, 'তুমি অযথা ঘাবড়াচ্ছ। আর্টিস্টদের এরা ভালবাসে।'

এর কিছুদিন পর বোম্বে টকিজে নজীর আজমিরীর কাহিনীর (পরে যা মজবুর নামে চিত্রায়িত হয়) আমি কড়া সমালোচনা করলাম। নজীর আজমিরি অশোক এবং সাভাককে বললো আপনারা মাণ্টোকে এই বির্তকের মধ্যে টানবেন না। সে হল গাল্পিক, সব কিছু গল্পের নিরিখেই সে দেখে।

আমি অনেক চিন্তা করে এসব কথার তাৎপর্য পেলাম না। মনে মনে বললাম, মাণ্টো ভাই, সামনের রাস্তা বন্ধ। বাঁ দিকের গলি দিয়ে কেটে পড়ো।

আমি বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে পাকিস্তান চলে এলাম। এখানে এসেও নিস্তার পেলাম না। এখানে আসতেই ঠাণ্ডা গোস্তের মকদ্দমায় ফেসে গেলাম।

পরীরাণী নাসিম বানু

আমার ছবি দেখার শখ অমৃতসরেই মিটে গিয়েছিল। অমৃতসরে আমি অগণিত ছবি দেখেছি, যার ফলে বোম্বেতে যখন 'মোসাবর' পত্রিকার সম্পাদনা করতে এলাম বেশ কিছুকাল ছবি দেখতে যাইনি। পত্রিকাটি ছিল সিনেমা সংক্রান্ত। অনেকে পাস সেধে দিয়ে যেত। তবু আমি ছবি দেখতে যেতাম না।

সেকালে বোম্বে টকিজের 'আছুৎ কন্যা' নামক একটা ছবি বেশ কিছুকাল ধরে চলছিল। ছবির দ্বাবিংশতম সপ্তাহে আমি ভাবলাম, ছবিটার মধ্যে এমন কি আছে যে, এতদিন ধরে চলছে? ছবিটা দেখা দরকার।

এছবিতে আমি সর্বপ্রথম অশোককুমার আর দেবীকারাণীকে দেখি। আশোকের অভিনয় তেমন ভাল হয়নি। কিন্তু দেবীকার অভিনয় বেশ পাকাপোক্ত। মোটামুটি ছবিটা উৎরে গেছে। ছবিটাতে তেমন বাড়াবাড়ি ছিল না। একটা সাদাসিধে কাহিনী, বেশ পরিচ্ছন্ন পরিণতি। এ ছবিটার পরই আমি আবার ছবি দেখতে শুরু করে দিলাম।

সেকালে নাসিম বানু নামে একজন অভিনেত্রীর বেশ নামডাক। চারদিকে তার রূপের চর্চা হতো। সিনেমার পোস্টারে এবং বিজ্ঞাপনে পরীরাণী নাসিম বানু বলে উল্লেখ করা হত। আমার পত্রিকাতে তার বেশ কটি ছবি ছাপলাম আমি। সত্যি তার স্বাস্থ্য চেহারা সবকিছু অনুপম ছিল। সব চেয়ে আকর্ষণীয় ছিল তার চোখ জোড়া।

তখন সবেমাত্র তার দুটো ছবি তৈরী হয়েছে। দুটো ছবিই সোহরাব মোদী বানিয়েছেন। ছবিগুলো বেশ হিট করেছিল বলে শুনেছি। কিন্তু আমি কেন জানি না ছবিগুলো দেখতে পারলাম না। এরপর অনেকদিন গত হলো। একদিন হঠাৎ বিজ্ঞাপন দেখলাম যে, মনরো মুভিটোনের পক্ষ

থেকে 'পুকার' ছবি হচ্ছে আর তাতে পরীরাণী নাসিম নূরজাহানের চরিত্রে অবতরণ করবেন।

ছবিটি তৈরী হতে বেশ সময় লাগল। পত্র-পত্রিকায় পুকারের বিজ্ঞাপনে নাসিম নূরজাহানের রূপসজ্জায় অপরূপ ভঙ্গিতে প্রতিভাত হলো।

'পুকার'-এর প্রথম প্রেস শোতে আমি দাওয়াত পেলাম। সম্রাট জাহাঙ্গীরের ন্যায়-নীতির একটা হাতে-বানানো কাহিনী এর বিষয়বস্তু। বড় আবেগময় এবং নাটকীয়ভাবে ছবির পরিসমাপ্তি করা হয়েছে। ছবিটাতে সংলাপ এবং পোশাকের উপর বেশী জোর দেয়া হয়েছিল। সবদিক দিয়ে ছবিটি ভারতের চিত্রশিল্পের পুরানা রেকর্ড ভেঙে এক নতুনত্ব স্থাপন করে।

নাসিমের অভিনয় তেমন ভাল হয়নি। তবে তার অনুপম রূপশ্রী এবং সাজ-সজ্জা সে অভাব অনেকটা পূরণ করে নিয়েছে। আমার যতটুকু মনে পড়ে 'পুকার'-এর পর নাসিম আর দু'একটা ছবিতে অভিনয় করেছিল। কিন্তু 'পুকার' ছবিতেই তার খ্যাতি হয়েছে বেশী।

এসময় নাসিমের নামে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। চিত্রজগতে স্ক্যাণ্ডাল চলে দেদার। কখনো শোনা যেত সোহরাব মোদী নাসিমকে বিয়ে করবে। আবার কখনো শোনা যেত হায়দ্রাবাদের নিজামের পুত্র মোয়াজ্জেম শাহ্ এবং নাসিমের মধ্যে প্রেম চলছে। অচিরেই তাকে নিয়ে সে চলে যাবে। শেষোক্তটি অনেকাংশে সত্য ছিল। কারণ সেকালে নিজামের পুত্র প্রায় সময় বোম্বেতে আনাগোনা করতেন। এবং অনেকবার তাঁকে নাসিমের বাড়ীতে দেখা গেছে। নিজাম তনয় দেদার টাকা ঢেলেছেন নাসিমের পেছনে। এবং টাকার জোরে শেষ পর্যন্ত নাসিমের মা শামসাদ ওরফে ছামিয়াম বেগমকে প্রসন্ন করিয়ে মা মেয়ে দুজনকেই তিনি হায়দ্রাবাদ নিয়ে গেলেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে তাদের দম আটকে আসতে লাগল। হায়দ্রাবাদটা কেমন যেন রূঢ় ঠেকতে লাগল তাদের কাছে। তাছাড়া নিজাম তনয়ের মেজাজটাও কেমন যেন একটু গোঁয়াড়েপনা। নিজামের রাজত্ব থেকে পালিয়ে আসা দুষ্কর ছিল। তবু কেমন করে নাসিমের মা অবশেষে বোম্বে ফিরে আসতে সক্ষম হলেন, সে কথা ভেবে সবাই আশ্চর্য হল।

নাসিম বানু ফিরে আসলে বোম্বেতে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। খুব পোস্টারবাজী হল। লোকরা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদল নিজাম তনয়ের পক্ষ নিল, অপর দল নাসিমের। বেশ কিছুকাল কাদা ছোঁড়াছুড়ি হল। অবশেষে একদিন এসব থেমে গেল।

আমি ততদিনে চিত্রজগতে ঢুকে পড়েছি। কিছুকাল ইম্পেরিয়ালে মুন্সীগিরি করলাম। পরিচালকদের নির্দেশে চটকদার ভাষায় সংলাপ রচনা করতাম। বেতন ছিল মাত্র ষাট টাকা। এর পর কিছুটা উন্নতি করে হিন্দুস্তান সিনেটোনে নানুভাই দেশাইর সেখানে একশ' টাকায় চাকরি নিলাম। এখানে আমি সর্বপ্রথম আমার চিত্র-কাহিনী রচনা করি। পরে তা 'আপনি নগরিয়া' নামে চিত্রায়িত হয়। এমনি করে আমি চিত্র জগতে প্রায় জানাশুনা হয়ে গেলাম।

এসময় একটা বিজ্ঞাপনে দেখলাম, এহসান নামের একজন লোক মহল পিকচার্স নাম দিয়ে একটা ফিল্ম কোঃ খুলেছেন এবং 'উজালা' নাম দিয়ে একটা ছবির কাজেও নেমে পড়েছেন। বলা বাহুল্য, ছবির নায়িকা হবেন নাসিম বানু।

এ ছবি তৈরীর গোড়ায় ছিলেন 'পুকার' এর কাহিনীকার কামাল আমরোহী এবং পাবলিসিটি ম্যানেজার এম. এ. মুগনী। ছবি তৈরীর প্রথমেই আমরোহী এবং মুগনীর মধ্যে ঝগড়ার সুত্রপাত হয়। এ ঝগড়ার পরিণতি শেষ পর্যন্ত আদালত অবধি গড়ায়। তাদের ঝগড়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মানে মানে ছবিটা তৈরী হয়ে ছিল।

ছবির কাহিনী, সংলাপ, গান, অভিনয় সবকিছু নিম্নমানের হয়েছিল। ফলে ভাল চলে নি। এহসান সাহেবকে অবশেষে বহু টাকা গচ্চা দিয়ে কোম্পানী বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।

কোম্পানী বন্ধ করে দিলেও নাসিম বানুর সাথে হৃদয়ের লেন দেন তাঁর বন্ধ হল না। ছবি তৈরীর সময়ই এহসান নাসিমের প্রণয়াসক্ত হয়েছে অবশ্য এমন কথা বলা ঠিক হবে না। কারণ এর আগেও এদের জানা শুনা নিবিড় ছিল। এহসানের পিতা খান বাহাদুর মোঃ সোলায়মান (চীফ ইঞ্জিনীয়ার) নাসিমের মা সামসাদের প্রণয়াসক্ত ছিলেন। সাদা কথায় তিনি তাঁর দ্বিতীয় পত্নী (উপপত্নী) ছিলেন। অতএব তাঁদের এ প্রেম

অনেকটা বংশানুক্রমে প্রাপ্ত বলা যেতে পারে। কিন্তু লোকেরা বলাবলি করত বলে এহসান অত্যধিক লজ্জা পেত। যার কারণে সে সুটিং এর সময় খোলাখুলিভাবে নাসিমের সাথে মিশতে পারত না। সুতরাং তাদের প্রেম অনেকটা গুজব বই কিছু নয়। কিন্তু এই অনুকূল জনমতকে মিথ্যা করে দিয়ে এহসান যেদিন নাসিম বানুকে দিল্লীতে নিয়ে বিয়ে করে ফেলল সবাই বিস্মিত হল। খবরটা নাসিম বানুর ভক্তদের জন্যে নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক ছিল। ভক্তরা আরো বেশী ভেঙে পড়ল যখন শুনতে পেল নাসিম চিত্রজগতও ছেড়ে ঘর-কন্নায় মনোনিবেশ করছেন।

এহসান-নাসিমের প্রেমের কথাটি আমি জানতাম না। কিন্তু অশোকের বর্ণনা থেকে এর চমকপ্রদ রোমান্টিক গন্ধ পাওয়া যায়।

'চল্‌, চলরে নওজোয়ান' শেষ হতে পুরো দু'বছর লেগেছিল। দুটি বছর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তিতিক্ষায় কাটল। কিন্তু অতঃপর ছবি যখন আশানুরূপ সাফল্য লাভ করল না, আমাদের সবার উপর একটা ম্লান ছায়া নেমে এলো। মুখার্জি তো একেবারে ভেঙে পড়ল। কিন্তু তারপর তাকে তাজমহল পিকচার্স-এর একটা ছবি পরিচালনা করতে হলো। এ ভাঙা মন নিয়ে একাজে তিনি হাত দিতেন না। কিন্তু করা কি, আগে থাকতে এটার কণ্ট্রাক্ট হয়েছিল।

ততদিন এস. মুখার্জির সাথে এহসানের বেশ দহরম মহরম হয়ে গিয়েছিল। কাজেই তাজমহল পিকচার্সের দায়িত্ব এহসান মুখার্জির কাঁধে চাপিয়ে দিল। মুখার্জি আমার সাথে পরামর্শ করল। শেষে সিদ্ধান্ত হল 'বেগম' নাম দিয়ে আমি এমন একটা কাহিনী লিখব যাতে নাসিম বানুর সৌন্দর্যকে বেশী কাজে লাগানো যায়।

আমি মোটামুটি একটা প্লট খাড়া করলাম, মুখার্জি তাতে আবার কিছুটা রদবদল করলেন। যখন ছবি তৈরী হয়ে গেল, আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম আমি যে কাহিনী নিয়েছিলাম সেটা কাগজপত্রেই আটকা রয়ে গেছে। আমার সে কাহিনীর প্রতিচ্ছায়াটা শুধু রূপালী পর্দায় দেখতে পেলাম।

'বেগম' লেখার সময় নাসিমের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়। আমি এবং এস. মুখার্জী দুপুরে নাসিমের সেখানে খেয়ে রাত অবধি সেখানে বসে বসে কাহিনীর রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করতাম।

আমরা ভাবতাম, নাসিম না জানি কত বড় বাড়ীতে থাকে। কিন্তু যখন ঘোরবন্দর রোডে তার বাংলোতে ঢুকলাম, আমার সব ধারণা পাল্টে যেতে লাগল। সেকেলে ধরনের একটা বাড়ী দেওয়ালের আস্তর খসানো, জানলার খড়খড়ি টুটা ফুটা। চারদিকে কিছু মামুলী আসবাব পত্র সম্ভবতঃ সেগুলো ভাড়া করে এনে রেখেছে।

এই বাড়ীর পটভূমিকায় আমি নাসিমকে গভীর করে দেখলাম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে গোয়ালার সাথে দুধের কুপনের হিসাব পত্র নিয়ে বচসা করছিল। সে টেনে টেনে কষ্ট করে গোয়ালার সাথে কথা বলছিল। নাসিমের অভিযোগ হল, গোয়ালা আধাসের দুধের হেরফের করেছে। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, যে নাসিমের জন্যে কতলোক দুধের নহর বইয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত সে নাসিমের আধসের দুধের হিসাবের কি দরকার পড়ল?

আমি আস্তে আস্তে টের পেলাম, 'পুকারে' যে রূপবতী নূরজাহানের রূপসজ্জায় প্রতিভাত হয়েছিল আসলে সে নেহাত ঘরোয়া স্বভাবের একটি মেয়ে। ঘরকন্যার সব বিশেষণের সাথে সে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বেগমের কাজ যখন আরম্ভ হল, ড্রেসের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নাসিম নিয়ে নিল। অন্যথায় ড্রেসের জন্যে আমাদেরকে ১০-১২ হাজার টাকা বরাদ্দ করতে হতো। নাসিম দরজী ডেকে নিজের বাড়ীতেই দরজীখানা বসিয়ে দিল। তার পুরনো শাড়ীর সম্ভার থেকে কাপড় কেটে কেটে প্রয়োজনীয় কামিজ গাগরা ইত্যাদি তৈরী করিয়ে নিল। কাপড় পরিধানের ব্যাপারে নাসিমকে বলা যেতে পারে যে, সে কাপড় পরত, কিন্তু ব্যবহার করত না। যে-কোন পোশাকেই তাকে মানাত। এজন্যে এস. মুখার্জি তাকে 'বেগম' ছবিতে বিচিত্র পোশাকে পেশ করেছেন। এক কাশ্মীরী গেঁয়ো মেয়ের রূপসজ্জায় ক্লিওপেট্রার পোশাক থেকে আরম্ভ করে সর্বশেষ পোশাকে তাকে অবতীর্ণ করেছেন।

আমরা নিশ্চিত জানতাম, অন্তত বিচিত্র পোশাকের কল্যাণে হলেও ছবিটার কাটতি হবে। আফসোস, দুর্বল পরিচালনা এবং দুর্বল মিউজিকের দরুন ছবিটা মার খেয়ে গেল।

এ ছবিটার জন্যে আমরা বেশ পরিশ্রম করেছিলাম। রাত তিনটা অবধি আমরা এহ্সানের বাড়ীতে কাজ করতাম। গভীর রাত অবধি এহ্সানও আমাদের কথাবার্তা, শলাপরামর্শ শুনত। তার একটা অভ্যাস ছিল পা দোলাত। যখন দেখতাম পা আর দোলাচ্ছে না আমরা বুঝতাম, এহ্সান ঘুমিয়ে গেছে। তখন আমরাও ঘুমের প্রস্তুতি নিতাম।

এহ্সানের এ অভ্যাসটা বড় খারাপ লাগত যে, এহ্সান রসঘন একটা গল্পের মাঝখানে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ত। নাসিম এহ্সানের আগে কোন সময়েই ঘুমাত না। আমরা নাসিমের চোখে ঘুমের নোটিশ দেখলে তখন আর মোটেই কাজ করতাম না। বাড়ী ফিরে যাওয়া আমার জন্যে খুব কষ্টকর হত। আমার বাসা ছিল ঘোর বন্দরে। ট্রামে প্রায় পৌণে একঘণ্টা লাগত। আমার এ অসুবিধা সম্পর্কে মুখার্জিকে বললাম। শেষে সবাই সিদ্ধান্ত করল, আমি কিছুকালের জন্যে এহ্সানের বাড়ীতেই অবস্থান করব।

এহ্সান বড় ঢিলে স্বভাবের লোক ছিলো। কোন কথা বলতে তার এক বছর কেটে যেত। সে বলতে চাচ্ছিল আমার কোন কিছুর দরকার হলে বিনা দ্বিধায় যেন তাদের কাছ থেকে চেয়ে নি। কিন্তু আমি তা বলার আগেই বুঝতাম। সব রকম আরাম আয়েশের উপকরণ মজুদ থাকা সত্ত্বেও তারা আমার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখত।

নাসিম চমৎকার পাঞ্জাবী বলতে পারত। চল্ চলরে নওজোয়ানের একজন অভিনেতার কাছে আমি এ খবরটা দিলাম যে, নাসিম চমৎকার পাঞ্জাবী বলতে পারে। সে বিশ্বাস করল না। একদিন স্যুটিং-এর সময় নাসিম, রফিক এবং অশোক উপস্থিত ছিল। আমি রফিককে বললাম, "ইধরুনজা কাকে বলে ?"

রফিক বলল,

'এটা আবার কোন্ ভাষার শব্দ ?'

'কেন, পাঞ্জাবী ! বল এর অর্থ কি ?'

রফিক তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলল,

'মাইনু মালমু নেই। আই ইধরুন.জে দে পুত্তুর।'

নাসিম একটুখানি ঝুঁকে বলল, 'সাচ্চি তিহানু মালুম নেই ?'

এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল যে, নাসিম পাঞ্জাবী জানে।

অশোক প্রায়ই ক্যাপ্টেন সিদ্দিকীর বাসায় যেত। প্রথম প্রথম সিদ্দিকীর বাসাটার পরিবেশ কেমন যেন একটু এলোমেলো মনে হলো। তারপর এক সময় সে রীতিমত উন্নত ধরনের সেন্টের গন্ধ পেতে লাগল। ক্যাপ্টেন সিদ্দিকীকে জিজ্ঞেস করায় সে কথাটা এড়িয়ে গেল।

একদিন ক্যাপ্টেন বাসায় ছিল না। অশোক গিয়ে হাজির হল। সেদিনও সেই সেন্টের গন্ধ। অশোক শুঁকতে শুঁকতে আবিষ্কার করল যে, গন্ধটা উপরের তলা থেকে আসছে। পা টিপে টিপে উপরে চলে গেল সে। দরজা সামান্য খুলতেই সে হঠাৎ দেখলো নাসিম বানু একজন লোকের কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছে। লোকটি হলেন মিঃ এহসান।

এরপর অশোক ক্যাপ্টেনকে ব্যাপারটা বলল। ক্যাপ্টেন বলল, 'এটাতো অনেক কাল থেকেই চলছে।'

আমি যতটুকু জানতাম, নাসিম এহসানের এ প্রণয়ের বিরুদ্ধে তার মা এবং বোনেরা সদা খড়্গহস্ত ছিল। তাদের সাথে এহসানের অনেকবার ঝগড়ায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। কিন্তু পিতা খান বাহাদুর সোলায়মান এদের বিয়েতে রাজী ছিলেন তাই আর তাদের বিয়ে কোনমতে আটকালো না। বিয়ের পর নাসিম দিল্লীতেই বসবাস শুরু করলো, যেখানে তার শৈশব কাল কেটেছিল।

বিয়ের সম্পর্কে এবং বিয়ের ব্যাপারে কিছুকাল খবরের কাগজাদিতে দেদার চর্চা হল। কিন্তু শত চেষ্টাতেও নাসিম আর চিত্রজগতে ফিরে এলো না।

ইতিমধ্যে চিত্রজগতে অনেক উত্থান-পতন হয়ে গেছে। অনেক চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মত। অনেক তারকার উত্থান-পতন হয়েছে। হিমাংসু রায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে বোম্বে টকিজ এক মগের মুল্লুকে পরিণত হল। দেবীকা-রাণী (মিসেস হিমাংসু) এবং রায়বাহাদুর চুনীলাল (জেনারেল ম্যানেজার)-এর মধ্যে ঝগড়া ফাসাদ শুরু হল। অবশেষে রায়বাহাদুর তার নিজের গ্রুপ নিয়ে বোম্বে টকিজ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। সে দলে ছিলেন এস. মুখার্জি, গল্প লেখক এবং পরিচালক জ্ঞান মুখার্জি, অশোককুমার, কবি প্রদীপ, সাউণ্ড রেকর্ডিষ্ট এস. ওয়াচা, কমেডিয়ান দেশাই, সংলাপ রচয়িতা শাহেদ লতিফ এবং সন্তোষী।

এরা নতুন চিত্র প্রতিষ্ঠান তৈরী করলেন যার নাম দেয়া হল ফিলমিস্তান। এস. মুখার্জীকে বানানো হলো প্রডাকসন কণ্ট্রোলার। নতুন নতুন ব্যবস্থাপনায় স্টুডিওকে নতুন আবরণে সাজানো হল। সবকিছু ঠিকঠাক। কিন্তু এস. মুখার্জিকে একটু চিন্তিত মনে হলো। ছবির জন্য কাহিনী ইত্যাদি তৈরী করা হল। এস. মুখার্জি চাচ্ছিলেন, কি করে দেবীকারাণীকে টেক্কা দেয়া যায়।

অনেক আকাশ পাতাল ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন, যদি নাসিম বানুকে পুনরায় চিত্রজগতে আনা যায় তাহলেই বাজীমাত।

অশোকের সুবাদে ক্যাপ্‌টেন সিদ্দিকীর সাথে এস. মুখার্জিরও জানাশুনা ছিল। তাছাড়া রায় বাহাদুর চুনীলালের সাথে এহসানের বাবার সাথে গলায় গলায় খাতির ছিল। সুতরাং নাসিম অবধি তাদের অভিপ্রায় পৌঁছতে দেরী হল না। এরপর সবচেয়ে বড় বাধা ছিল প্রথমত এহসানকে রাজী করানো তারপর নাসিমকে রাজী করানো।

একমাত্র এস. মুখার্জির আত্মবিশ্বাসই নাসিমকে আনার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এহসান প্রথম দিকে অমত করেছিল। কিন্তু পরে রাজী হয়ে গেল। নাসিমকে রাজী করানোর সুখবর নিয়ে বোম্বেতে অবতরণের পরই পত্র-পত্রিকায় এ খবর বড় ফলাও করে ছাপা হল। সর্বত্র একটা আলোড়ন পড়ে গেল যে 'চল্‌ চলরে নওজোয়ান'-এ নাসিমবানু নায়িকা হিসাবে অবতরণ করছে। নাসিমের পুনরায় চিত্রজগতে প্রত্যাবর্তনের খবরটা সত্যি একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল।

তখন আমি দেড় বছর অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সাথে জড়িত থেকে আবার ফিরে বোম্বে চলে এসেছি এবং শওকত হোসেন রিজভীর জন্যে একটা কাহিনী লিখবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছি।

এ কাহিনীটার পর আরো ক'টা কাহিনী লেখা হল। এসময় আমি ঘর থেকে খুব কম বের হতাম। আমার স্ত্রীর এতে খুব খারাপ লাগত। সে ভাবত, আমি অকাজে বসে বসে দিনগুলো কাটাচ্ছি।

আলীগড় ইউনিভার্সিটি থেকেই আমার সাথে শাহেদ লতিফের জানাশুনা। ফিলমিস্তানের কাজ থেকে ছুটি পেলেই আমার কাছে চলে আসত

সে। একদিন আমার স্ত্রী শাহেদ লতিফের কাছে অভিযোগ করে বলল, 'ভাই একে বলুন, কোথাও গিয়ে চাকরি বাকরি করার জন্যে। ঘরে বসে শুধু শুধু স্বাস্থ্য নষ্ট করছে। একটা চাকরি নিলে অন্তত ঘরে থাকার রোগটাতো তার কাটবে।'

এর ক'দিন পর 'মিলাদ' থেকে শাহেদ লতিফের ফোন এলো। শাহেদ লতিফ আমাকে জানালো যে, এস মুখার্জি একটা ইণ্টারভিউ নিতে চাচ্ছে আমার। কারণ তার একজন লোকের দরকার।

চাকরির আমার কোন দরকার ছিল না। তবে 'ফিলমিস্তান' দেখার জন্যে আমি অগত্যা রওনা হয়ে গেলাম। ফিলমিস্তানের পরিবেশ অত্যন্ত ভালো মনে হল আমার। এস. মুখার্জীর দ্বারা আমি বেশ প্রভাবান্বিত হলাম। সুতরাং সেখানেই কণ্ট্রাক্ট হয়ে গেল। বেতন সর্বমোট ৩০০ টাকা। আমার বাসা থেকে সেই 'গোর গাঁয়ে' পেঁছিতে ১ ঘণ্টা লাগত। ১ ঘণ্টার জার্নি করে এ বেতনে আমার পোষাত না। তবু আমি মেনে নিলাম। ভাবলাম, ঠিক আছে এদিক সেদিক থেকে কিছু কামাই করে নেব।

ফিলমিস্তান প্রথম প্রথম আমার কাছে বেখাপ্পা লাগত। কিন্তু পরে বেশ জমে উঠল। এস মুখার্জির সাথেও বেশ খাতির হয়ে গেল আমার।

এসময় আমি নাসিম বানুকে ছিঁটেফোটা কয়েকবার দেখলাম। গাড়ীতে করে কয়েক মিনিটের জন্যে আসতো এবং চলে যেত।

এস. মুখার্জি বড় খুঁতখুতে স্বভাবের লোক ছিলেন। কাহিনী লেখার পর সেটাকে নিয়ে মাসকে মাস বসে যেতেন। তারপর পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের কাজ শেষ হলে স্যুটিং-এর বন্দোবস্ত করতেন। ছবিতে প্রথম দিকের দৃশ্যগুলোতে নাসিম বানুর চরিত্র ছিল না। অবশেষে একদিন তার সাথে দেখা হলো। স্টুডিওর বাইরে ফোল্ডিং চেয়ারে পায়ের উপর পা রেখে বসে ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে ঢেলে চা পান করছিল সে। অশোক আমার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিতে সে বলল, 'হ্যাঁ আমি তো ওঁর লেখা গল্প পড়েছি।'

তারপর আমাদের আলাপ জমে উঠল। নাসিম তখন মেকআপ অবস্থায় ছিল। তার আসল চেহারা দেখতে পারিনি। তবে প্রথম

দেখাতে তার যে জিনিসটি আমি নোট করেছি তা হলো সে কথা বলার সময় কেমন যেন টেনে টেনে কষ্ট করে কথা বলে।

'পুকার'-এর নাসিম আর 'চল্ চলরে নওজোয়ান'-এর নাসিমের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল। পুকারে সে নূরজাহানের রূপসজ্জায় ছিল আর এতে সে এক ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবী মহিলার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রসাধন ছাড়া নাসিম বানুকে আমি যখন দু'তিনবার দেখলাম তখন মনে হলো কোন মহফিল বা মজলিসের জন্যে নাসিম বানুর মত মানানসই মহিলা আর হয় না। মজলিসের যে কোণেই নাসিম বানু বিরাজ করতো রীতিমত আলোকিত হয়ে উঠত সে কোণটা।

পোশাক পরিচ্ছদ এবং রং নির্বাচনের ব্যাপারে নাসিম বানু অনন্যসাধারণ ছিল। গোলাপী রংটা বড় মারাত্মক। এ রংটা মানুষের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। কিন্তু মানুষের চোখের সব রকম প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে নাসিম সে রংটাই নিজের জন্যে বেশী পছন্দ করতো।

নাসিমের প্রিয় পোশাক ছিল শাড়ী। গাগরাও পরতো। কখনো সেলোয়ার কামিজও পরতো। নাসিমের কাছে বহু বছরের পুরনো শাড়ীর বিরাট সম্ভার মজুদ ছিল।

অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় নাসিম অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিল। স্বাস্থ্য এবং চেহারা ছিল একহারা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিস্তর পরিশ্রম করতে পারত। সারাক্ষণ সেটে বসে থাকত। এস. মুখার্জিকে খুশী করানো চাট্টিখানি কথা ছিল না। অথচ তার সব রকম রিহার্সাল সে নীরবে পালন করতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝলসানো সার্চ আলোর সামনে উঠা-বসা করতে হতো। কিন্তু তারপরও দেখতাম, নাসিম কোন রকম পরিশ্রান্ত হয় না। আসলে ব্যাপার হল, নাসিম অভিনয় করাকে খুব ভালবাসতো। আমি স্যুটিং-এর পর রাশপ্রিণ্ট দেখতাম,—নাসিমের অভিনয় ভালই লাগত। যেখানে তার অভিনয় ভাল লাগতো না সেখানে দৈহিক চাকচিক্য ভাল লাগতো। সবদিক দিয়ে বিচার করলে 'চল্ চলরে নওজোয়ানে' নাসিম বানুর অভিনয় অনেকাংশে প্রশংসনীয় হয়েছিল।

মুখার্জি চেয়েছিলেন ছবিটার গতি চাঞ্চল্যপূর্ণ হোক। কিন্তু নাসিম স্বভাবতই ঠাণ্ডা মেজাজের বলে তা আর হলো না।

ছবি রিলিজ হলো। তাজ হোটেলে বিরাট পার্টি দেয়া হল। পার্টিতে নাসিমকে অন্য রকম মনে হল। মনে হল, পর্দার নাসিমের সাথে এর কোন মিল নেই। যেন একজন মোগল শাহজাদী সেজেগুজে বসে আছে।

নাসিমের নানী কাশ্মীরী। অমৃতসরের এই মহিলাটির কাছ থেকেই সম্ভবত নাসিম পাঞ্জাবী শিখেছিল। তাছাড়া মায়ের সাথে দিল্লীতে বসবাস করত বলে চমৎকার উর্দুও জানত। ছোটবেলায় কনভেণ্টে পড়াশুনা করত বলে ইংরেজীটাও বেমালুম আয়ত্ত করে নিয়েছিল। অল্প-বিস্তর সঙ্গীতে বুৎপত্তি ছিল। সেটাও তার মায়ের দান। কিন্তু মায়ের মত সুধাকণ্ঠী ছিল না সে। অনেক ছবিতেই সে তার নিজের মুখের গান নিজে গেয়েছে। কিন্তু তার গানে তেমন রসকস নেই। সম্প্রতি গানের চর্চা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছে নাকি সে।

নাসিমের চারপাশে তার বন্ধুদের যে একটা চক্র গড়ে উঠেছিল সেটা বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। নাসিমের গোছলখানায় স্নান করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তার গোছলখানা দেখে আমি একেবারে নিরাশ হয়ে পড়লাম। আমি ভেবেছিলাম, না-জানি তার বাথরুম কত আধুনিক সামগ্রী দিয়ে সাজানো। বিদেশী নানা রকমারী সাবান, আরো কত কি! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কিছুই ছিল না। একটা বিরাট বালতিতে মিলাদের ভারী পানি এবং একটা এলমুনিয়ামের মগ। ঐ পানি এমনই ভারী যে গায়ে সাবান মেখে যতই আপনি ঘষতে থাকুন না কেন, ফেনা হবে না।

কিন্তু নাসিমকে যখনি দেখতাম একেবারে সজীব সতেজ মনে হ'ত। মাঝারি ধরনের হালকা প্রসাধন করত। গোলাবের পাপড়ির মত মনে হত তার ত্বক।

হরেক রকম সেণ্ট লাগানোতে তার জুড়ি কেউ ছিল না। তার কাছে বহু দুষ্প্রাপ্য সেণ্ট পাওয়া যেত। গহনা-পত্রের বেলায়ও কারো চেয়ে কম যেত না সে। নিত্য-নতুন গহনা পরত। কখনো হিরার কাঁকন, কখনো জড়োয়া চুড়ি আবার কখনো বা মোতির হার।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে চলত সে। প্রায়শই এহসানের অজীর্ণ এবং নাসিমের সর্দি লেগে থাকত। নাসিম

কাচামরিচ নিয়ে ভাত খেতে বসে যেত আর এহসান তার খাবার কেড়ে খেয়ে ফেলত। প্রায় প্রত্যেকদিনই খাবার সময় তাদের ঝগড়া হত। তাদের ঝগড়ার ধরন দেখলে মনে হত তাদের প্রেম কি ধরনের।

আমার স্ত্রী নাসিমকে একবার নিমন্ত্রণ করেছিল। সালুনে যে ঘি দেয়া হয়েছিল তা নাকি বেশ ভাল ছিল। নাসিম খাবার টেবিলেই আমার স্ত্রীকে ধরে বসল এ ঘি কোথায় পাওয়া যায় সে খবর দিতে। সাফিয়া বলল, 'এ ঘিতো হরদম বাজারে পাওয়া যায়। পলসনের ঘি।'

'তাহলে আমাকে দুটা টিন আনিয়ে দাও না।'

আমি চাকরকে বললাম। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই পাশের যে দোকানটীতে আমার হিসাবপত্র ছিল, সেখান থেকে দুটো টিন নিয়ে এল সে। এরপর সে মোট গোটা আটেক নিয়েছিল। একদিন হঠাৎ সে আমাকে বলল, 'আপনার ঘির টিনের হিসাবটাতো করলেন না।'

'হিসাবের আবার কি দরকার পড়ল?'

কিন্তু সে কথায় তাকে দমানো গেল না। টিনের দাম সে দেবেই। অবশেষে বাধ্য হয়ে আমি পুরো হিসাব দিলাম। নাসমি একটু চিন্তা করে বলল,

'আপনি বলছেন আটটা। আমার তো মনে হয় সাতটা।'

আমি একটু লজ্জিত হয়ে বললাম, 'হাঁ, সাতটাই হবে তা'হলে।'

'না, না, সাতটাই বা হবে কেন? তাহলে আটটাই।'

এ ভাবে সাত এবং আট নিয়ে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেশ কথাকাটাকাটি হল। শেষে নাসিম তার চাকরকে খালি টিনগুলো বের করে গুণে দেখতে হুকুম করল। চাকর বের করে দেখল সাতটাই। নাসিম বিজয়ীর ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল,

'এখন গুণে দেখুন তো।'

'হাঁ, সাতটাই তো দেখছি।'

এমন সময় চাকরটি বলল, বিবিজান, আসলে টিন আটটা ছিল। একটা 'ভঙ্গন' নিয়ে গেছে।

আমি প্রতি মাসে পাঁচশ' টাকা পেতাম। প্রতি মাসে আমাকে পাই

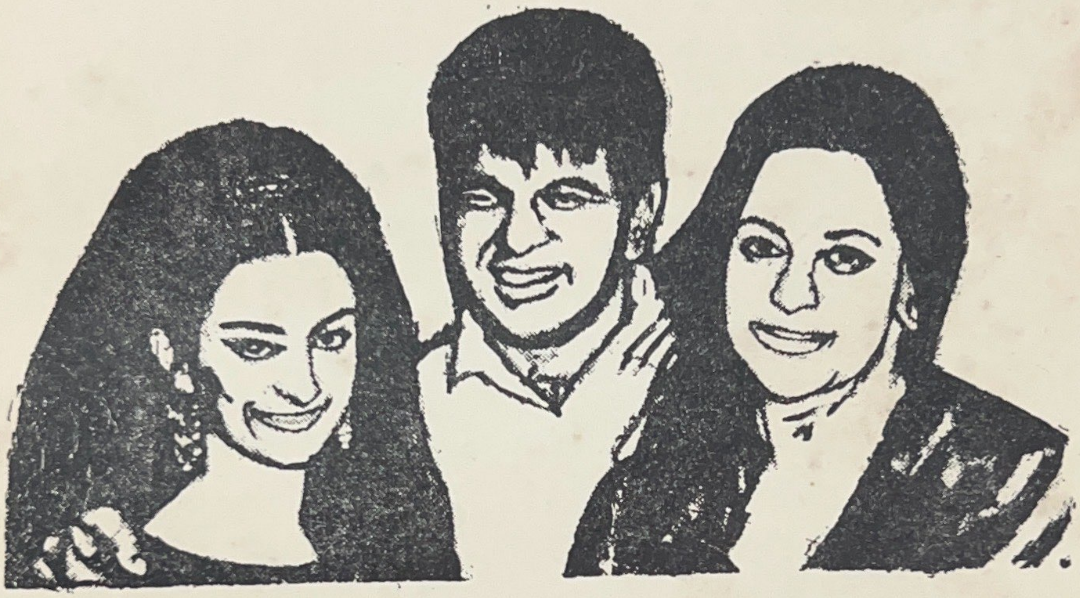

সায়েরা বানু, দিলীপ কুমার ও নাসিম বানু

পাই হিসাব দিতে হতো তাকে। কিন্তু তাতে কোন রকম সাত আট এর হেরফের হয়নি।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আমার কাজে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু এহসান মাঝে মাঝে আমার তিরিক্ষি মেজাজে রুষ্ট হয়ে উঠত। অবশ্য তা বাইরে তেমন প্রকাশ করত না।

মিঃ এহসান এমনিতে খুব দরাজ দিল ছিল। কিন্তু নাসিমের বেলায় সে যথার্থ সংকীর্ণ ছিল। বিশেষ বিশেষ ক'জন লোকছাড়া নাসিমকে আর কারো সাথে কথা বলতে দিত না। এমনিতে নাসিমও তেমন হৈ হুল্লোড় বা জমজমাট পার্টি পছন্দ করতো না। কিন্তু একবার বাধ্য হয়ে তাকে এক উচ্ছৃংখল কাজে যোগ দিতে হয়েছিল। সেটা ছিল হোলির উৎসব। আলীগড় ভার্সিটিতে 'মুডপার্টির' একটা ট্রাডিশন আছে। বোম্বের চিত্র-জগতের হোলি উৎসবের একটা ট্রাডিশন আছে। এটা প্রথমত বোম্বে টকিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরে ফিলমিস্তানে তা সংক্রমিত হয়।

ফিলমিস্তানে 'হোলি' উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এস. মুখার্জি। মিসেস মুখার্জিও (অশোকের বোন) এব্যাপারে কম যেত না। সে ছিল মেয়েদের লিডার। হোলির দিনে আমি শাহেদ লতিফের বাড়ীতে বসেছিলাম। শাহেদের স্ত্রী ইসমত (চুগতাই) আর আমার স্ত্রী সাফিয়া কি কথা নিয়ে যেন বাড়ীটা তোলপাড় করে তুলেছে। এমন সময় ওদের উপর হোলির আক্রমণ হল। ইসমত আত্মরক্ষার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে এমন একটা ভাব করল যে তার গায়ে যদি কেউ রং দেয় তাহলে ভাল হবে না কিন্তু। আনন্দের দিনে কে কার মুড দেখে। ইসমতের ভাবকে তিরোহিত করতে হল। এবং চোখের পলকে অন্যান্যদের মত সেও রঙ্গে লাতপাত হয়ে গেল।

আমি আর শাহেদ বাকী ছিলাম। কিন্তু কয়েকটা পিচকারীর পর আমাদেরকেও আর চেনার উপায় ছিল না।

আমাদের মধ্যে যখন আর কেউ বাকী ছিলনা, শাহেদ লতিফ দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, 'এবারে চলো নাসিম বানুর বাড়ী যাই।'

রঙের পিচকারী নিয়ে হৈ হল্লা করে আমরা নাসিমের ঘোরবন্দর রোডের বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম। আমাদের হৈ হল্লা শুনে নাসিম এবং এহসান

বেরিয়ে এল। নাসিমের পরণে হালকা রং এর জর্জেট শাড়ী ছিল। শাহেদ লতিফ রং ছিটাবার জন্যে পিচকারীতে হাত দিচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'আগে ওকে কাপড় বদল করতে বলো।'

নাসিম একটু মুচকি হেসে বলল, 'কাপড় বদলাতে হবে না।'

একথা বলতে না বলতেই একাধিক পিচকারীর নানা রং এ নাসিম একেবারে জবুথবু হয়ে গেল। নাসিমকে একটা রঙিন চিড়িয়ার মত মনে হল তখন।

রঙ ছিটানোর পালা শেষ হতেই হাডুডু পর্ব শুরু হল। প্রথমে পুরুষরা তারপর মেয়েরা। হাডুডু খেলাটা জমেছিল বেশ। এস. মুখার্জীর মোটা বউ যখনি ধরাশায়ী হত অট্টহাসির রোল পড়ে যেত সবার মধ্যে। আমার স্ত্রীর চোখে রঙিন চশমা ছিল। এজন্যে সে একজনকে ধরতে গিয়ে আরেকজন ধরে বসত।

নাসিম বেশী দৌড়াদৌড়ি করতে পারত না। আসলে সে বুঝাতে চাইত যে, দৌড়াদৌড়িটা তার ধাতে সয়না। অবশ্য খেলাতে সে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছিল।

নাসিম-দম্পতি আজব ধরনের ধর্মভীরু ছিল। পথে কোন উর্দু কাগজ পড়ে থাকলে সসম্ভ্রমে তুলে নিয়ে চুমা দিত। জ্যোতিষ শাস্ত্র, হাত গণনা এবং অদৃষ্টবাদ ইত্যাদিতে তাদের পুরোপুরি আস্থা ছিল। এব্যাপারে এহসান বরং নাসিমের চেয়ে একপদ বেশী অগ্রসর ছিল। রেসের দিন তার অবস্থা দেখার মত ছিল। একটা ভাল ঘোড়ার উপর হয়ত সে টিকেট ধরে বসবে এমন সময় সেখান দিয়ে একজন কানা লোক চলে গেল। ব্যস, তাহলে টিকেট ধরা তার ও পর্যন্তই। এরপর বাড়ীতে এসে সব দোষ নাসিমের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলত, 'আসলে তুমিই সব অনিষ্টের মূল।'

এমন দিন যেতনা, যেদিন ওদের মধ্যে এটাওটা নিয়ে ঝগড়া না হত।

নাসিমের সন্তান দুটো নানার কাছেই থাকত। তাদেরকে স্টুডিওর আবহাওয়ায় আসতে দিতনা।

মৃত পিতার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। তার ভ্যানিটি ব্যাগে সব সময় তার পিতার ফটো থাকত। আমার আবার চুরি করে মেয়েদের ব্যাগ দেখার অভ্যেসটা বরাবর ছিল। একদিন আমি চুরি করে তার ব্যাগ দেখছিলাম

এমন সময় নাসিম এসে উপস্থিত হল। 'ক্ষমা করবেন, এটা আমার একটা বাজে অভ্যেস। সুযোগ পেলেই আমি মেয়েদের ব্যাগ না দেখে পারি না। আচ্ছা এ ফটোটা কার?'

'কেন, এটা আমার আব্বার ফটো।'

এমন ভঙ্গিতে বলল, যেন ছোট একটা মেয়ে তার বাপ সম্পর্কে বলছে।

যাক, আর একটা ঘটনা বলে আমি নাসিম পর্ব সমাপ্ত করছি।

'বেগম' এর কাহিনী লেখার সময় এস, মুখার্জির সাথে একটা দৃশ্য নিয়ে বচসা হতে অনেকরাত হয়ে গেল। রাত দুটো তখন। সাড়ে তিনটায় একটা ট্রেন আছে। আমার সাথে সাফিয়াও ছিল। আমরা যাবার জন্যে পা বাড়াতেই নাসিম বলল, 'এখন একটা যাবার সময় নাকি? এখানেই থেকে যাও।'

আমি বললাম, 'কোন অসুবিধা হবে না। কিছুক্ষণ প্ল্যাটফরমে পায়চারী করতে করতে ট্রেন এসে পড়বে, তারপর দিব্যি আরামে বসে বাড়ী চলে যাব।'

কিন্তু নাসিম এহসান দুজনই নাছোড়বান্দা হয়ে ধরল। বাধ্য হয়ে থেকে গেলাম। ততক্ষণে এস. মুখার্জী চলে গেছেন। আমি বারান্দায় শুয়ে পড়লাম। এহসানও আমার কাছে একটা শোফায় শুয়ে পড়ল।

সকালে নাস্তা করে আমরা যখন বাড়ী রওনা দিলাম, সাফিয়া আমাকে ঘটনাটা বলল।

সাফিয়া এবং নাসিম শোবার ঘরে ঢুকলে নাসিম বলল, 'তুমি শুয়ে পড়ো।'

বলেই পালং-এ একটা নতুন চাদর বিছিয়ে দিল। তারপর একটা নতুন স্লিপিং স্যুট বের করে নাসিম সাফিয়াকে বলল, 'এটা পরে নাও। একেবারে নতুন স্যুট।'

সাফিয়া কাপড় বদল করে শুয়ে পড়ল। ওদিকে নাসিমও কাপড় বদল করে নিল এবং মুখের মেকআপ ধুয়ে ফেলল। সাফিয়া তার মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলল, 'একি তোমার চেহারা নাসিম? তুমি দেখছি একেবারে শ্যামলা। অথচ—'

নাসিম মুচকি হেসে বলল, 'এ শুধু প্রসাধনেরই কারসাজি নইলে আমিও একটা বাজে মেয়ের মতই তো।'

মেকআপ ধুয়ে ফেলে নানা ধরনের তেল মালিশ করল মুখে। তারপর অজু করে কোরান শরীফ পড়তে শুরু করে দিল সে। আমার স্ত্রীর মুখ থেকে অলক্ষ্যে বেরিয়ে'এলো, 'হায় নাসিম, তুমি দেখছি আমাদের চেয়েও অনেক ভাল মেয়ে।

কোরান তেলাওয়াত করে নাসিম শুয়ে পড়ল।

বোম্বের পরীরাণী, পুকারের নূরজাহান, এহসানের জীবনসঙ্গিনী, ছামিরান বাঈর মেয়ে এবং দু'সন্তানের জননী নাসিম বানু।

শ্যাম

তারিখটা আমার ঠিক মনে নেই। পানাভ্যাস ছাড়বার জন্যে মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলাম। এমন সময় পত্রিকায় শ্যামের মৃত্যু সংবাদ পড়লাম। চেতন-অচেতনের মাঝামাঝি একটা অবস্থায় আমার মানসিক অবস্থা তখন দোদুল্যমান ছিল।

শ্যামের মৃত্যু সংবাদ পড়ে প্রথমত আমি ভাবলাম এসব আমার মানসিক বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। মদ্যপান ছেড়ে দেওয়াতেই আমার এ অবস্থা। কারণ এর আগেও তো এমন অনেক বন্ধুদের মৃত্যু সংবাদ পড়েছি, যারা এখনো দিব্যি বেঁচে বর্তে আছে।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি খবরটা পড়ে পাশের কামরায় পাগল বন্ধুটিকে ডেকে বললাম, 'জানো আমার এক অকৃত্রিম বন্ধু মারা গেছে।'

'কে সে?'

'শ্যাম।'

'কোথায় মারা গেছে, এখানে?'

আমি কোন জবাব দিলাম না। হঠাৎই আমার মানসপটে শ্যামের নানা অভিব্যক্তির ছবি ভেসে উঠতে লাগল। চির উজ্জ্বল হাস্যমুখর বন্ধু-বৎসল শ্যাম। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা শ্যাম। মৃত্যুকে যে কোনদিন স্বীকার করতো না সেই চির দুর্দম হৈ-হুল্লোড়প্রিয় শ্যাম—না, এমন হতে পারে না। শ্যাম কোনদিন মরতে পারে না। এসব খবর আর খবরের কাগজ আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি। আমার মানসিক বৈকল্য!

আস্তে আস্তে এলকোহলের নেশাটা যখন কেটে গেলো তখন সত্যি সত্যি জানলাম, শ্যাম আর ইহজগতে নেই। একটা ভীষণ মর্মান্তিক ব্যথায় আমায় খান খান হয়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু সে সব কিছুই আমার মনে হল না। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই যেন শ্যামের মৃত্যু হয়েছে। শ্যামের

মৃত্যু হয়েছে এ যেন বহুদিন আগের ঘটনা। এখন শ্যামের স্মৃতি নিয়ে শোকতাপ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার।

শ্যামের হাসি গান আর উজ্জ্বল হৈ-হুল্লোড় এখনো যেন শুনতে পাই আমি। শুনে শুনে কানে তালা দিতে হয় এখনো।

হাসপাতালের বাইরের লোকরা বলাবলি করছিল যে, শ্যামের মৃত্যু সংবাদ শুনে সাদাত হাসান মান্টো পাগল হয়ে গেছে। আসলে যদি সত্যি তাই হতো তাহলে আমি খুব দুঃখিত হতাম। কারণ, শ্যামের মৃত্যু মূলত আমাকে প্রকৃতিস্থ করে দিয়েছে। শ্যামের মত লোকই যখন মরতে পারে তখন বিশ্বের সব কিছুর অস্তিত্বই পদ্মপত্রে নীর। শ্যামের মৃত্যু সংবাদে যদি সত্যি পাগল হতাম তাহলে সেটাও একটা পাগলামী হত। শ্যামের মৃত্যু সংবাদ শুনে পাগল হয়ে যাওয়া মূলত শ্যামকে অপমান করা।

শ্যাম তার পরিবার পরিজনের মাঝে চিরদিন বেঁচে থাকবে। তাজি (মমতাজ) ছিল তার জীবনের দুর্বলতার স্বাক্ষর (শ্যামের মতে)। যেসব মেয়েরা শ্যামের প্রেমে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল তাদের মুখেও আজ আর শ্যাম জিন্দাবাদ ধ্বনি শোনা যাবে না।

মৃত্যুর সময় সে যেন আমাকে ডেকে বলেছিল,

'মান্টো, সত্যি মৃত্যুর স্বাদটা অন্য রকমের, যা কোনদিনই কল্পনা করি নি।'

শ্যামের কথা ভাবতেই আমার বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক আয়ার তাজ বিশিফের নায়ক সিনাইনের কথা মনে পড়ে যায়। শ্যাম ছিল প্রেমিক, কিন্তু প্রেম তার পেশা ছিল না। সব সৌন্দর্যের দ্বারেই সে তার শকট ভিড়িয়ে দিত। মনে হয় মৃত্যুও এক সুন্দর সত্তা। নইলে কোনদিনই সে মৃত্যুর কাছে পরাভব মানত না।

সে উষ্ণ এবং প্রচণ্ডতাকে ভালবাসতো। লোকেরা বলে, মৃত্যুর হাত হিমশীতল। হিমশীতল হলে অবিশ্যি শ্যাম মৃত্যুর হাতটা ঝটকা টানে সরিয়ে দিয়ে বলতো,

'—তোমার হাতটা ওদিকে রাখ দিকিনি, বড্ড ঠাণ্ডা। প্রাণচাঞ্চল্য নেই তোমার হাতে।'

সে এক চিঠিতে একবার আমাকে লিখল,

'প্রিয় মাণ্টো, এখানকার সবকিছু হাপটিল্লা' ধরনের। কিন্তু আসল 'হাপটিল্লার' স্বাদ এখানে নেই। সত্যি বলতে কি, জীবনটা কাটছে বেশ ভাল। মদ আড্ডা সমানে চলছে। তাজি (মমতাজ) ছ'মাস পর ফিরে এসেছে। হতভাগী এখনো আমার বিরাট একটা দুর্বলতা স্বরূপ বিরাজ করছে। তুমি বেশ জানো, মেয়েদের প্রেম পরশের আমেজ আদায় করা কতখানি প্রাণান্তকর। আফটার অল আমি একজন নর্মাল মানুষ।

নিগার (নিগার সুলতানা) মাঝে মধ্যে আসে। কিন্তু 'ত' এর স্থান সর্বোচ্চ।

প্রায় সন্ধ্যাতেই তোমার বকা-ঝকাগুলো মনে পড়ে।

'হাপটিল্লার' একটা ইতিহাস আছে। আমি তখন 'বোম্বে টকিজে' চাকরি করি। কামাল আমরোহীর চিত্র কাহিনী 'হাবেলী' (পরে যা 'মহল' নামে চিত্রায়িত হয়) নিয়ে বেশ মাজা ঘষা চলছে তখন। অশোক, ওয়াচা, হাসরাত লাখনুভী এবং আমি এ মাজাঘষার কাজে প্রতিদিন বসে যেতাম। শেষের দিকে কাজের কথা রেখে আমাদের মধ্যে গালগল্পও শুরু হয়ে যেত। 'মজবুর' ছবির স্যুটিং শেষ হলে শ্যামও এসে আমাদের দলে ভিড়ত।

কামাল আমরোহীর একটা বড় বাজে অভ্যেস আমার ভাল লাগতো না। সে এমনি গালগল্পের আসরেও অলংকারযুক্ত শব্দ ব্যবহার করতো। আর লেখার কথাতো বলাই বাহুল্য।

একদিন ট্রেনে চড়ে বোম্বে টকিজে আসছিলাম। ট্রেনে বসে খবরের কাগজ খুলে স্পোর্টস, কলাম দেখছিলাম। স্টেডিয়ামে ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছে। একজন খেলোয়াড়ের নাম 'হাপটিল্লা' লেখা হয়েছে। আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে ভাবলাম, হয়ত হায়বতুল্লা নামের অপভ্রংশ। টকিজে পেঁছায় পর কামাল আমরোহী তার কাহিনীর একাংশ পড়ে শোনাল। অশোক আমাকে বলল,

'কেমন লাগল মাণ্টো ?'

'মন্দ হয়নি, তবে 'হাপটিল্লা' গোছের হলো না।'

হঠাৎ কেনই জানি আমার মুখ থেকে এই আজগুবি শব্দটা বেরিয়ে

গেল। আসলে আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম, বক্তব্য তেমন জোরদার হল না।

সেই থেকে আমাদের মধ্যে হাপটিল্লার ব্যবহার। হাপটিল্লা থেকে শেষ অবধি হাপটিলিটি এবং হাপ্‌টিলাইজ ইত্যাদি শব্দও তৈরী হল। এবং অতঃপর এ শব্দটি বোম্বের চিত্রজগতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ২৯-৭-৪৮ইং তারিখে শ্যাম আমাকে লিখল ঃ

‘প্রিয় মাণ্টো, আবারও তোমাকে নীরবরোগে পেয়ে বসেছে দেখছি। তোমার এ নীরবতা আমাকে বড় বিচলিত করে। একেক সময় তোমার উপর এত রেগে যাই যে, থর থর করে গা কাঁপতে থাকে। তুমি জানো আমিও তেমন ভাল চিঠিপত্র লিখিয়ে নই। তবে হাপটিল্লা ধরনের কিছু চিঠিপত্র লিখতে বড় ভাল লাগে। কিন্তু হাপটিল্লা বড়ই দুর্লভ।

মাণ্টো, কে যেন বলেছিল কথাটা। যখন কোন প্রেমিকের শব্দভাণ্ডার ফুরিয়ে যায় তখন সে চুমা দিতে শুরু করে। আর যখন কোন বক্তার শব্দ ভাণ্ডার ফুরিয়ে আসে তখন সে কাশতে থাকে। এই সাথে আমিও একটি কথা যুক্ত করতে চাই। যখন পুরুষের পৌরুষ ফুরিয়ে যায় তখন সে অতীতকে টেনে নিয়ে আসে। তুমি ঘাবড়ে যেওনা। শেষোক্ত পর্যায়ে আমি এখনো আসিনি। একটু পাগল হয়ে অতীত নিয়ে মাতলামি করার আমার মোটেই অবসর নেই। অথচ এটার খুবই দরকার আমার।

নাসিমের (চান্দনীরাত) ছবি অর্ধেক প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অমরনাথের সাথে একটা ছবির চুক্তি করেছি। বল দেখি আমার নায়িকা কে হবে ? নিগার সুলতানা। আমি সেধেই নিগারের নাম প্রস্তাব করেছি। পুরনো স্মৃতিকে একবার আবার পর্দার উপর রোমন্থন করে দেখতে চাই কেমন লাগে।

তাজি এখনো আমার জীবনে আছে। নিগারকে বড় মিষ্টি লাগে। গত কদিন থেকে রমলাও এখানে আছে। তার সাথে মিলিত হয়ে বুঝতে পারলাম সে এখনো আমার পূজা করছে। সুতরাং তার সাথেও ওঠাবসা চলছে।

আমি বিশেষ কোন জায়গায় সীমিত বলতে চাই না। আমি মানুষকে ঘৃণা করি। এভাবেই জীবন যাচ্ছে। আসলে এ জীবনটাই এক প্রেমিকা যার জন্যে আমার অগাধ ভালবাসা। জীবন বেঁচে থাকুক আর সবকিছু জাহান্নামে যাক।

লেখকের নামটা মনে নেই।

ভাবটা এই ধরনের। "লোকটি মানুষকে এত ভালবাসতো যে কখনো সে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করতো না (নিজেকে ভালবাসার বেলায়) অনুরূপ সে তাদেরকে ঘৃণাও করতো।"

মমতাজ জেব কোরেশী এম.এ-র ছোট বোন। ভাইয়ের সাথে বোম্বেতে আসার পর জহুর রাজার প্রেমে পড়ে। অতঃপর তার কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে যখন লাহোরে চলে আসে—তখনই শ্যামের সাথে তার সংযোগ। বোম্বেতে আসার পর শ্যামের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হলে মমতাজকে সে বিয়ে করে নিল। মমতাজ মা হতে চলেছিল।

শ্যাম ফুটফুটে ছেলেদের খুব ভালোবাসতো। শ্যামের এ অভ্যাসটা অনেক মেয়েদের ভাল লাগতো না। নাক সিটকাতো। কিন্তু সেসব মেয়েদের মন পাবার জন্যে শ্যাম তার এ ধরনের অভ্যাসগুলোকে মোটেই শোধরাতে চেষ্টা করতো না। তার ভিতর বাহির এক রকম ছিল। সে আমাকে বলত, 'মাণ্টো, আমার অভ্যাসগুলো ভ্রূকুঁচকনো মাগীগুলোর বড্ড খারাপ লাগে তাইনা? শালীরা প্রসাধনের আড়ালে যে কত খুবসুরত তাকি আমি জানি না?'

শ্যাম সব মেয়েদের সাথেই খোলাখুলি ঠাট্টা মস্কারা করত। অশ্লীল আলাপ করত। অনেক মেয়েদের আত্মসম্মানে লাগত তা। শ্যামের এ সব দুষ্টুমি আবার ভালও বাসতো অনেক মেয়েরা।

শ্যামের সাথে আমার প্রথম কোথায় কখন দেখা হয়েছে, তা মনে নেই। মনে হতো, তার সাথে আমার পরিচয় হবার অনেক আগেই পরিচয় হয়ে রয়েছে। তবে যতটুকু মনে পড়ে, সম্ভবত লেডি জামশেদজী রোডেই আমাদের প্রথম দেখা। সে রোডে আমার বোনের বাসা ছিল। 'হাইনেষ্ট' এর উপরের ফ্লাটে ডায়মণ্ড থাকত। সেখানে শ্যাম আসা-যাওয়া করত। সিঁড়িতেই আমাদের পরিচয় এবং কথাবার্তা হয়েছে। শ্যাম ডায়মণ্ডকে মিসেস শ্যাম বলত। অথচ ডায়মণ্ড ছিল অন্য একজনের স্ত্রী। আইনত তারা স্বামী-স্ত্রী না হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর চেয়েও অনেক বেশী ছিল। একবার ডায়মণ্ডকে হাসপাতালে ভর্তি করার সময় শ্যাম ডাক্তারদের খাতায় ওর নাম লিখিয়েছিল 'মিসেস শ্যাম'। তা নিয়ে

‘ডায়মণ্ড’-এর স্বামীর সাথে শ্যামের একচোট হয়ে যায়। অবশেষে এর পরিণতি মামলা অবধি গিয়ে গড়ায়। অবশ্য পরে এসব মিটমাট হয়ে গেছে। এরপর ডায়মণ্ড যখন চিত্র-জগতে হাতেখড়ি নেয় তখন থেকে সে শ্যামের নাগালের বাইরে চলে গেল। তবে সে ডায়মণ্ডকে ভুলতে পারে নি।

পুনার এক মনোরম উদ্যানে একবার আমি আর শ্যাম ভ্রমণ করছিলাম। হঠাৎ শ্যাম আমাকে বলল, ‘মাণ্টো, জানো, ডায়মণ্ডটা লেডি দি গ্রেট। খোদার কছম করে বলছি, এমন মেয়ে আমি দেখিনি। সব রকম বিপদআপদকে সে তুচ্ছ করে চলতে পারে।’

তারপর একটু চিন্তা করে আবার বলল, ‘মাণ্টো’ মেয়েরা সন্তান উৎপাদনকে এত ভয় করে কেন? অবৈধভাবে হয় বলে? আসলে এ পাপ-পুণ্যের আবল তাবলগুলো কি? টাকার নোট জাল হতে পারে, কিন্তু সন্তান হালাল-হারাম হতে পারে না। এটাতো মানুষের আদিম উন্মাদনা। আদম-হাওয়ার প্রবর্তিত এ উন্মাদনা চিরন্তন, অবিনশ্বর। এ প্রবৃত্তিকে কোনদিন মানুষ দমিয়ে রাখতে পারে না।”

শ্যামের চিন্তাধারা, হাসিঠাট্টা—সবই গভীর অর্থবহ এবং উচ্চাঙ্গের হতো। সভা-সমিতিতে যারা টুপি পায়জামা পরে ভাল মানুষটি সেজে বসে থাকত শ্যাম তাদেরকে দেখে সং মনে করতো। মদপানের সময় যদি কেউ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে দার্শনিক বনে যেত—শ্যামের ধৈর্য আর বাঁধ মানতো না। এলোপাথাড়ি গালাগালির তুবড়ি ছুটতো তার মুখ থেকে।

পুনার ‘জোবায়্যুদা কটেজে’ শ্যাম আর মাসুদ পারভেজ একত্রে থাকত। একটা ছবির কাহিনী কিনে নেবার ব্যাপারে আমিও কিছুকাল ছিলাম সেখানে। মাসুদ স্বভাবতই গোমড়ামুখো ছিল। একদিন সকাল থেকে ‘রম’ চলছিল। শ্যাম তার স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় হল্লা করে বাড়ী তোলপাড় করে তুলছিল। কিন্তু মাসুদ সারাটা দিন একেবারে গুম মেরে রইলো। শ্যামের প্রথম দিকে খেয়াল ছিল না। আচমকা খেয়াল হতেই মাসুদকে সম্বোধন করে বলল,

‘কি মশাই, আপনার কাব্য-চর্চা দেখছি এখনো শেষ হলো না?’

এমন সময় সেখানে কৃষন চন্দর এসে উপস্থিত হল। শ্যাম কৃষণকে মাসুদের এ ভাবালুতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করল। দু'চার পেগ পান করলেই কৃষণ চন্দরের মুড এসে যায়। পান করেই কৃষন মাসুদকে নিয়ে পড়ল, 'এ কোন্ ধরনের কবিত্ব? সেই সকাল থেকে বক-ধার্মিকের মত ভাব ধরে বসে আছ, এখনো এক চরণও রচনা হোল না। তোমার এসব পাগলামি রেখে বরং একটু কথাবার্তা বল।'

মাসুদকে নিয়ে আমাদের হাসি-ঠাট্টা বেশ চলছে। হঠাৎ মাসুদ সবাইকে বলল,

'চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি।'

সবাই বেরিয়ে পড়লাম। মাসুদ সবাইকে জুতা পকেটে পুরে হাঁটতে বলল। রাত তখন বারটা। পুনার পথ-ঘাট তখন নীরব নিস্তব্ধ থমথমে। উদ্দেশ্যহীনভাবে আমরা দৌড়াতে লাগলাম। পথে কৃষণ চন্দরের বাড়ী। আগে-ভাগেই সে আমাদের দল ছেড়ে কেটে পড়েছে। আমরা তার বাড়ীতে গিয়ে হানা দিলাম। ঘনঘন দরজার কড়া নাড়ার পর কৃষণ এসে দরজা খুলল। বাড়ীতে একদল মাতাল ঢুকছে টের পেয়ে কৃষণের ছালিনা খাতুন পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। এ ঘটনার জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা আবারও পথে নেমে পড়লাম।

পুনাতে যত্রতত্র মন্দির। প্রত্যেক ফার্লং-এর মাথায় এক মন্দির। মাসুদ একটা মন্দিরে গিয়ে ঘণ্টা বাজাল। আমি আর শ্যাম মন্দিরের দেবতার সামনে সেজদায় পড়ে শম্ভু শম্ভু বলতে লাগলাম। তারপর অকস্মাৎ সবাই মিলে খিল খিল করে হেসে উঠলাম।

এসব মাতলামি করতে করতে রাত তিনটা বেজে গেল। শ্যাম হঠাৎই এক রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে এমন সব অশ্লীল গালি-গালাজ শুরু করে দিল যে, শুনে কানে তালা দেবার জো। আমি আর কখনো তার মুখ থেকে এসব গালি শুনি নি।

রাত চারটায় আমরা 'জোবেদা কটেজে' ফিরে এলাম। বিলম্ব না করে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু মাসুদ তখনো জেগে ছিল। গুনগুন করে কি একটা কবিতার চরণ ভাজছিল সে।

শ্যাম মদ্যপানের বেলায় মধ্যপন্থা কোনদিনই মানতো না। খেলাধুলার ব্যাপারে সারা মাঠ জুড়ে খেলা করত। শ্যাম আমাকে প্রায়শ বলত, ‘আমি সব সময় চৌকা পছন্দ করি, কিন্তু আমার ভাগ্যে ছক্কা এসে যায়।’

দেশ বিভাগের কিছুকাল আগের ঘটনা। বোম্বেতে তখন বড় আকাল অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ। কিন্তু আমাদের মদপর্ব কোনদিনই বাদ যেত না। সেদিন আমরা কথায় কথায় বেশী পান করে ফেললাম। ঘটনাক্রমে শাহেদ লতিফ এবং রাজা মেহদী আলী খানও এসে গেল। কিছুক্ষণ পর জানতে পারলাম বাইরে কারফিউ। রাজা চলে যেতে চাইছিল, আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, পাগল হয়েছ?

শ্যাম বলল,

‘হাঁ ইয়ার, এখানেই থেকে যাও। আজকাল তাজি নেই।’

রাজা বলল, ‘তোমাদের এ পালংএ আমার ঘুম হবে না।’

শুনতেই শ্যাম তাকে গ্লাস ভর্তি করে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘এটা শেষ করে নাও, তা’লেই ঘুম আসবে।’

রাজা একটানে সবটুকু পান করে ফেলল। তারপর আধরাত ভর তাজির কথাবার্তা হল। তাজি শ্যামের সাথে ঝগড় করে বোনের বাড়ী চলে গেল, মনে হলো কোনদিনই সে আর ফিরে আসবে না। আর শ্যামও এমনভাবে তাকে বিদায় করেছে যে, সে কোনদিনই আর তাজির মুখ দেখবে না। অথচ দূরে থেকেই দুজনই দুজনের জন্যে তড়পাচ্ছে। প্রায় সন্ধ্যাতেই শ্যাম তাজির কথা বলতে বলতে অনেকটা পাগলের মত হয়ে যেত। আমি ভাবতাম, হতভাগা সারারাত বোধহয় আর ঘুমাবে না। কিন্তু বিছানায় পিঠ লাগতেই নিঃসাড় হয়ে পড়ত সে।

আমার ফ্লাটে মাত্র দুটো কামরা ছিল। একটা শোবার আর একটা বসবার। শোবার কামরায় শ্যাম আর তাজি থাকত। এখন তাজি নেই বলে সে কামরার পালং রাজা মেহদী আলী অধিকার করে নিল। বসবার কামরায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম।

অনেক রাতে মনে হল কে যেন আমার পাশে শুয়ে আছে। ভাল করে চেয়ে দেখলাম, শ্যাম। সে ছিল ভিতরে। এখানে এল কেমন করে? এরপর কাপড় পোড়ার গন্ধ পেলাম। উঠে ভেতরে গেলাম। শ্যাম যে পালং-এ

শুয়েছিল, যেয়ে দেখি সে পালং জলছে। অন্য পালংএ রাজা মেহদী আলী নাক ডেকে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। আগুন নেভানোর জন্যে কে যেন পানি ছিটিয়ে চেষ্টা করেছে। কিন্তু নারকেলের ছোবড়া থেকে আগুন ধরেছে বলে আগুন সহজে নেভানো সম্ভব হয়নি। আমি রাজাকে জাগালাম। কিন্তু সে পাশ ফিরে আরো আঁটসাট হয়ে শু'ল। আমি তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে এক বালতি পানি এনে ঢেলে দিলাম। আগুন নিভে গেল।

অনেক কষ্টে রাজাকে জাগিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করালাম। সে জেগেই রসিয়ে রসিয়ে বলতে লাগল, 'তোমার এই শ্যাম বেটা আস্ত হনুমান।' রাত দুটো হবে তখন। হঠাৎ দেখি কি, শ্যাম হনুমান সেজে লেজে আগুন ধরিয়ে তোমার পালংএ নাচানাচি করছে। আমি এসব স্বপ্ন মনে করে আবার শুয়ে পড়লাম। আবার ভাবলাম বেচারীর পালংটা যদি একেবারেই জলে যায় কি উপায় হবে? উঠে দেখলাম, শ্যাম লা পাত্তা। তোমাকে খবর দেবার জন্যে তোমার রুমে গেলাম। যেয়ে দেখি, হনুমান শ্যাম ভাল মানুষটি সেজে তোমার পাশে গুটি সুটি মেরে শুয়ে আছে। তার লেজও নেই লেজের আগুনও নেই।

রাজা মেহদী আলী খান বলল, আমি তোমাকে অনেক করে জানালাম। কানে ফুঁ দিলাম, ঘণ্টা বাজালাম—কিন্তু কোন কিছুতেই তোমার কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙল না। এরপর নিরুপায় হয়ে তোমার কানে কানে বললাম,

'খাজা হুইস্কি খাবে—বোতল বোতল হুইস্কি এসেছে।'

একথা শুনতেই তুমি চোখ খুলে বললে,

'কোথায়?'

'আগে ওঠ—দেখ তোমার বাড়ীঘর সব জলছে।'

'রাখো বাজে কথা।'

'সত্যি বলছি—কসম করে বলছি, তোমার পালংএ আগুন লেগেছে।'

"আগুন লেগে থাকলে ফায়ার সার্ভিসে খবর দাও।'

আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লে। এরপর আমি শ্যামকে জাগিয়ে ব্যাপারটা বুঝাতে চেষ্টা করলাম। শ্যাম চোখ পাকিয়ে বলল, 'তুমিই নিভিয়ে দাও না ইয়ার, খামকা কেন বিরক্ত করছ?'

শ্যামের উক্তি শুনে আমি জগ ভরে পানি এনে আগুনের উপর ঢালতে লাগলাম। এবং যখন মনে করলাম, আগুন নিভে গেছে তখন শুয়ে পড়লাম।

শ্যাম যখন ঘুম থেকে জাগল আমি (মাণ্টো) তাকে আগুন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। শ্যাম: ঠাঁট উল্টিয়ে বলল, 'নাতো, আমি তো এ সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

শ্যাম যখন অস্বীকার করল ব্যাপারটা জটিল মনে হল। অবশেষে সবাই মিলে আমরা তদন্তে লেগে গেলাম। আসল ব্যাপার উদঘাটন করতেই হবে আমাদেরকে। তদন্ত শেষে যেটা উপলব্ধি করলাম সেটা হল আগুন শ্যামের কারণেই লেগেছিল। কিন্তু পাছে রাজার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে এই ভেবে শ্যাম আমার কাছে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়েছিল।

শ্যাম প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাজিকে বিয়ে করতে যেতে যে উৎসবের আয়োজন করেছিল, এমন উৎসব আর হয়নি। যুগ যুগ ধরে চিত্র জগতে যেন তার নাম থাকে এজন্যে সে বিয়ের অনুষ্ঠানকে মদে প্লাবিত করে দিয়েছিল। কিন্তু এ প্লাবনের প্রতিক্রিয়া তার জীবনে কোন আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে আসেনি।

শ্যাম শুধু নারী এবং বোতলের জন্যেই পাগল ছিল না, জীবনের সব রকম সুন্দর এবং ভাল জিনিসের প্রতিই সে আসক্ত ছিল। একটা ভাল বইকে সে এতখানি ভালবাসত, কোন মেয়েকেও এত ভালবাসতো না। তার মা ছোট বেলায়ই মারা গিয়েছিল। সৎমা ছিল। সৎমাকে সে আপন মায়ের চেয়েও বেশী ভালবাসত। সে মার গর্ভের যেসব ভাইবোন ছিল, তাদেরকেও সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত।

ধন এবং খ্যাতি অর্জনের জন্যে তার জীবনের একটা বিরাট অংশ সংগ্রাম এবং তিতিক্ষায় কেটেছে। চরম দুঃখের দিনে সে হাতে পয়সা নিয়ে হেসে হেসে বলত, "দোস্ত, আর কত কষ্ট দেবে? একদিন না একদিন আমার পকেটে তোমাকে আসতেই হবে।"

তার এ উক্তি একদিন সত্য হয়েছে। অতি অল্প দিনের মধ্যেই সে বাড়ী গাড়ী এবং খ্যাতি অর্জন করেছিল।"

মৃত্যুর পূর্বেও তার মাসিক হাজার টাকা ইনকাম ছিল, বোম্বের অভিজাত এলাকায় তার সুদৃশ্য বাংলো ছিলো। অথচ এমন এক সময় ছিল, যখন সে মাথা গুঁজবার ঠাঁই পেত না। তার হাসি চিরকালই এক রকম ছিল। দুঃখের দিনেও সে হাসত, সুখের দিনেও হাসত।

যে ধনের জন্যে সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে, ধন যেদিন এসে তার দ্বারস্থ হয়েছে, মোটেই সে তাকে স্বাগতম জানায় নি। তার ভাঙ্গাচোরা খাটিয়াতেই বসতে দিয়েছে তাকে।

আমি আর শ্যাম যখন একত্রে এক বাড়ীতে থাকতাম, আমাদের দিনগুলো বড্ড এলোমেলো যাচ্ছিল। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার মত চিত্রশিল্পের অবস্থাও তথৈবচ ছিল। আমি বোম্বে টেকিজে চাকরি করতাম। আর সে সম্প্রতি একটা ছবিতে দশ হাজার টাকায় কণ্ট্রাক্ট সই করেছে। কিন্তু সময় মত টাকা পেত না। তা সত্ত্বেও আমাদের দিন কোন মতে কেটেই যেত। টাকা হাতে থাকলেই খরচ করতাম। কার টাকা কে খরচ করছে এ ধরনের কোন খেয়াল ছিল না আমাদের মধ্যে। জানি না এমতাবস্থায় বাড়ীতে মেয়েছেলে থাকলে কি অবস্থা হতো।

একদিন অতি কষ্টে কোথেকে যেন সে কিছু টাকা (সম্ভবত পাঁচশ' টাকা) উসুল করেছে। আমার পকেট তখন গড়ের মাঠ। মিলাদ থেকে বাসায় ফিরছিলাম। পথিমধ্যে হঠাৎ শ্যাম প্রোগ্রাম করল যে, সে চার্চ গেটে এক বন্ধুর কাছে যাবে। হঠাৎ সে পকেট থেকে দশ টাকার নোটের একটা বাণ্ডিল বের করে দু'ভাগ করে এক ভাগ আমাকে দিয়ে বলল, 'ধর, টাকাগুলো নিয়ে নাও। আমি আসছি।'

আমি টাকাটা হাতে নিলাম আর শ্যাম 'টাটা' বলে বিদায় হল। যেতে সে বলল, 'সেফটির জন্যে টাকাটা দু'ভাগ করে নিলাম, টাটা হাপটিল্লা।'

সন্ধ্যায় যখন সে ফিরে এলো বাসায় কাবাব হচ্ছিল। জানলাম, চিত্রতারকা কে. কে. (কুলদীপ কাউর) তাকে একটা প্রাইভেট কথা বলার জন্যে ডেকেছিল। ফেরার সময় সে একেবোতল ব্রাণ্ডি নিয়ে এসেছে। গ্লাসে এক পেগ ঢালতে ঢালতে বলল, 'প্রাইভেট কথাটা কি ছিল জানো, মাণ্টো? আমি লাহোরে একবার কার কাছে যেন বলেছিলাম কে. কে.

আমার জন্যে খুব পাগল। আসলে সে সত্যি পাগল ছিল। কিন্তু আমি ওকে পাত্তা দিতাম না। আজ সে প্রতিশোধ নেবার জন্যে ডেকে বলল, 'কে বলল আমি তোমার জন্যে পাগল ছিলাম? সব মিথ্যে কথা। তুমি এসব আজে-বাজে কথা আর বলো না কিন্তু।' আমি হেসে বললাম, 'তুমি আমার জন্যে পাগল নাই-বা ছিলে, এখন না হয় একবার পাগল হও। একথা শুনে সে এমন একটা জবাব দিল যার জন্যে আমাকে একটা ঘুষি অপচয় করতে হয়েছিল।'

আমি বললাম, 'ছি, তুমি মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলেছ?'

শ্যাম হাতের ক্ষত স্থান দেখিয়ে বলল, 'ভাগ্যিস, শালী হঠাৎ সরে গিয়েছিল। সরে যাওয়াতে আমার ঘুষি লাগল দেয়ালে। যার দরুন এই দশা। বড্ড জ্বালাতন করে শালী।'

এসব কথা মাত্র বছর দুয়েক আগের ঘটনা। লাহোর চিত্রশিল্পের মন্দা বাজার এবং 'ঠাণ্ডা গোস্তের' মামলার কারণে ভীষণ রকম ভুগছিলাম। এ মামলায় আদালত আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং তিনশ' টাকা জরিমানা করেছে। আমার মন এত তিক্ত হয়ে উঠেছিল যে, ইচ্ছা হচ্ছিল সমুদয় সাহিত্য-কর্ম এনে আগুনে পুড়িয়ে ফেলি। তারপর কোন অফিসের কেরানীগিরি নিয়ে বিপন্ন বাচ্চা-কাচ্চাদের মুখে কিছু দেবার জন্যে ঘুষ খেতে আরম্ভ করে দিই। এরপর কারো সাতেও থাকব না, পাঁচেও থাকব না।

এ সময় আশ্চর্য অন্তর্দ্বন্দ্বে আমার দিনগুলো কাটছিল। এক ধরনের লোক মনে করত, গল্প লিখে মামলা মকদ্দমা করাটাই বোধহয় আমার পেশা। কেউ মনে করত, সস্তা নাম কামাই করে দু'পয়সা উপার্জন করার জন্যে আমি এসব কাণ্ডকারখানা করছি। আমার বিরুদ্ধে মোট চারটা মামলা হয়েছিল। এ চার মামলায় আমার উপর কি কেয়ামত গেছে তা একমাত্র আমিই জানি।

আর্থিক অবস্থা আমার কোনদিনই ভাল ছিল না। তদুপরি নানা কার্যকারণে একবারে পথে বসার যোগাড় হল। এ সময় 'মাকতাবাই জাদী'দের চৌধুরী ভ্রাতৃবৃন্দ আমার খুব সাহায্য করেছেন। দুঃখ এবং দুশ্চিতা থেকে ভুলে থাকবার জন্যে বেশী বেশী মদ পান করতাম। আমার

পানের মাত্রা যখন বেড়ে গেল, তখন ওরা টাকা-পয়সা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি ক্ষুণ্ণ হব ভেবে তা আর করলেন না।

সে সময় আমার কারো সাথেই যোগাযোগ ছিল না। সারাক্ষণ একটা নিদারুণ অস্থৈর্যে ছটফট করতাম। দিনভর মদ্যপায়ী বন্ধুদের বাড়ীতে পড়ে থাকতাম। সেসব বন্ধুদের কারোই শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আসক্তি ছিল না। এভাবে আমি দৈহিক এবং আত্মিক অধঃপতনের দিকে নেমে যেতে লাগলাম।

একদিন তাহসীন পিকচার্স-এর মালিকের পক্ষ থেকে হঠাৎ এক চিঠি পেলাম। আমি যেন অবিলম্বে তাঁর সাথে দেখা করি। বোম্বে থেকে কে যেন কি একটা খবর পাঠিয়েছে। বোম্বে থেকে আমাকে স্মরণ করার মত কেউ আছে জেনে কৌতূহলবশত আমি তাহসীন পিকচার্স-এ গেলাম। যেয়ে দেখলাম, শ্যাম আমার জন্যে শ' পাঁচেক টাকা পাঠিয়েছে। শ্যাম বারবার তাহসীন পিকচার্স এর দফতরে মালিককে টেলিগ্রাম করে টাকটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবার জন্যে বলছিল। আমি যখন তাহসীন পিকচার্স-এর দফতরে পৌঁছলাম, সেদিন মালিক শ্যামের কাছে উত্তর লিখে জানাচ্ছিল যে, শত চেষ্টা করেও মাণ্টোকে খুঁজে বের করতে পারি নি।

আমি টাকাগুলো হাতে নিতেই অশ্রুতে চোখ ভরে এল। আমি অনেক চেষ্টা করে শ্যামকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলাম যে, শ্যাম শুধু শুধু কেন টাকাগুলো পাঠিয়েছ। শ্যাম কি করে জানল, আমার হাতে টাকা-পয়সা নেই? কিন্তু ক'বারই চিঠি লিখে লিখে ছিঁড়ে ফেললাম এই ভেবে যে, শ্যাম দুঃখিত হবে। বলবে, মাণ্টো এই বুঝি তোমার উত্তর হল?

সেবারে শ্যাম যখন তার নিজস্ব ছবির প্রদর্শন উপলক্ষে অমৃতসর এসেছিল, সময় করে লাহোরেও একবার এসেছিল। লাহোর এসে সে লোকদের কাছে আমার ঠিকানা তালাস করছিল। ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে আমিই জেনে গেলাম যে, শ্যাম এসেছে। এবং একটা ফাংশানে যাচ্ছে। আমি দৌড়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

আমার সাথে শ্যামের পুরনো বন্ধু রশিদ আত্রে ছিল। গাড়ী যখন হলের আঙ্গিনায় প্রবেশ করছিল আমাকে এবং আত্রেকে দেখে ফেলল সে।

শ্যাম হাত নেড়ে একটা চীৎকার দিল । ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বলল। কিন্তু ভক্তদের ভিড় এড়ানোর জন্যে ড্রাইভার গাড়ী থামাতে পারল না। একি পোশাকে শ্যাম আর ওমপ্রকাশ গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। পরনে সাদা স্যুট মাথায় পানামা হ্যাট। হলের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকল ওরা। দৌড়ে এসে দুজন লেপ্টে গেলাম। এরপর এত বেশী হৈ-হল্লা এবং শোরগোল হল যে আসল কাজের কথা কিছুই বলতে পারলাম না। উপরতলার গ্যালারী আমাদের উপর ভেঙে পড়ার জো।

হল থেকে বের হয়ে শ্যাম এক ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে রওনা দিল। সেখানে পৌঁছেও আমরা ভক্তদের ভিড় এড়াতে পারিনি। কথা শুরু করে একটা কথাও শেষ করা গেল না। লোকদের জ্বালায় টিকতে না পেরে শ্যাম বেলকনিতে এসে দর্শন দিল সবাইকে।

লাহোরে এসে শ্যাম সবদিকে সচকিত। রোমান্টিক শহর লাহোরের পথ ঘাটে তার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আজ তো অমৃতসর আর লাহোরের মাঝে হাজার মাইলের ব্যবধান রচিত হয়েছে। কিন্তু এমন একসময় ছিল যখন লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি এবং অমৃতসর ছিল শ্যামের নখদর্পণে।

শ্যাম আমাকে বলল সব সময়ে আমার সাথে থাক। কিন্তু তার অস্থির চঞ্চলতা আমার মোটেই ভাল লাগল না। রাতে তার হোটেলে যেয়ে দেখা করব বলে আমি বিদায় নিলাম।

শ্যামের সাথে এতদিন পর দেখা অথচ কেমন যেন একটা অসামঞ্জস্য ভাব বিরাজ করছে আমাদের মধ্যে। আমার বড্ড বিরক্তি লাগছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল কারো সাথে আমার একটা বড় রকমের মারামারি কাটাকাটি হয়ে যাক এবং আমি পরাস্ত হয়ে একটা দীর্ঘ বিশ্রাম নিই। মনের এই অবস্থা নিয়ে শ্যামের হোটেলে গেলাম এবং একজনের সাথে মদ পান করতে শুরু করে দিলাম।

রাত সাড়ে ন'টার সময় সর্বত্র একটা হৈ-হল্লা শুনে বুঝলাম শ্যাম এসেছে। তার কামরায় দর্শনার্থীদের বেজায় রকম ভিড়। আমি সেখানে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু মন খুলে কোন কথা হল না। আমার মনে হলো আমাদের আবেগকে তালাবদ্ধ করে কে যে চাবিটা দূরে রেখে

দিয়েছে। আমরা চাবিটা এনে যতই খুলবার চেষ্টা করছি কোনমতেই খুলছে না।

আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। সন্ধ্যায় ডিনার শেষে শ্যাম আবেগ-সমৃদ্ধ বক্তৃতা দিল। কিন্তু তার একটা শব্দও আমার কানে গেল না। সব লোকগুলো যখন একসাথে হাততালি দিল তখন বুঝলাম শ্যামের বক বক শেষ হয়েছে। আমি উঠে তৎক্ষণাৎ ভেতরের কামরায় চলে গেলাম। সেখানে ফজলী সাহেব বসেছিলেন। শ্যাম এসে বলল, 'লোকেরা হিরামণ্ডী যাচ্ছে। চলো তুমিও আমার সাথে চল।'

শুনে আমার কেঁদে ফেলতে ইচ্ছা করছিল। আমি বললাম, 'আমি যাব না। তুমি গেলে যাও।' 'তাহলে আমার জন্যে অপেক্ষা কর কিন্তু আমি এই এলাম বলে।'

ওরা চলে গেলে আমি শ্যাম এবং চিত্রশিল্পকে ইচ্ছামত গালি দিলাম। আমি ফজলীকে বললাম,

'মনে হচ্ছে আপনি এখানে থাকবেন। যদি আপনি অসুবিধা মনে না করেন, দয়া করে আপনার গাড়ীতে করে আমাকে একটু বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসেন।'

রাতভর আজব আজব স্বপ্ন দেখলাম। শ্যামের সাথে খুবই লড়াই ঝগড়া হল। সকালে যখন দুধওয়ালা এলো, আমি তাকে নিয়ে পড়লাম, 'তুমি বড় বদমাশ। তুমি পাজি, তুমি চাঁড়াল।'

মাথা থেকে যখন ভূতটা নেমে গেল তখন টের পেলাম আমি একটা মস্ত অন্যায় গালি দিয়ে ফেলেছি।

আসলে সেটা আমার কণ্ঠ ছিল না। রাজনীতির ভূতের কণ্ঠ। এসব কথা ভাবতে ভাবতে আমি হাত বাড়িয়ে দুধ নিলাম, যে দুধের বার আনাই পানি। আসলে দুধওয়ালা কিন্তু চাঁড়াল নয়। আমার মনে একটা জিঘাংসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল যে, প্রকৃতপক্ষে শ্যামতো চাঁড়াল, হিন্দু।

যেকালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রচণ্ড হত্যাকাণ্ড চলছিল, রোজ হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান মারা যাচ্ছিল, আমি এবং শ্যাম রাওয়ালপিণ্ডি থেকে পালিয়ে এসে একটা শিখ পরিবারে আশ্রয় নিলাম। পরিবারের লোকরা লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের তাজা কাহিনী শোনাচ্ছিল।

শুনে শুনে শ্যামের রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল। আমি তা দেখে ভড়কে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে যখন বিদায় নিয়ে পথে নেমে পড়লাম আমি শ্যামকে বললাম, 'আমি তো মুসলমান। তোমার কি ইচ্ছা করে না আমাকে হত্যা করতে?'

'এখন আর ইচ্ছা করে না। তবে যখন হত্যার কাহিনী শুনছিলাম, তখন ইচ্ছা করছিল।'

একথা শুনে আমি বড় আঘাত পেলাম। আমারও খুন করতে ইচ্ছা করছিল ওকে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এসব মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেলাম।

বোম্বেতে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। বোম্বে টকিজের কর্তৃত্ব যখন অশোক এবং ওয়াচার হাতে চলে গেল, কেমন করে যেন বড় বড় পদে মুসলমানরা নিয়োজিত হয়ে পড়ল। এতে হিন্দু স্টাফরা ক্ষেপে গেল। ওয়াচার কাছে গোপনে চিঠি আসতে লাগল যে, অচিরেই স্টুডিওকে ভস্মীভূত করা হবে এবং কাটাকাটি শুরু হবে। কিন্তু অশোক এবং ওয়াচা এসব থোড়াই কেয়ার করত।

ওরা এবিষয় পরোয়া না করলেও আমার কিন্তু চিন্তা ধরে গিয়েছিল। আমি ওদেরকে বললাম, বোম্বে টকিজ থেকে আমাকে মুক্তি দাও। কারণ, হিন্দুরা মনে করবে আমার কারণেই বোম্বে টকিজে গরু খেকোদের আধিপত্য বেড়ে চলেছে। কিন্তু ওরা আমাকে বলল, 'তোর মাথা খারাপ হয়েছেরে মান্টো।'

মাথা আমার সত্যি খারাপ হতে চলেছিল। কারণ, আমার পুত্র পরিজন ছিল পাকিস্তানে। পাকিস্তান যখন ভারতের অংশ তখন তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। কিন্তু এখন হয়েছে ভিন দেশ।

আমার সামনেই বোম্বেতে ১৪ই আগস্ট উদ্‌যাপিত হল। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়ে দুটো জাতিই খুব খুশী হল। কিন্তু মারামারি কাটাকাটি তখনও চলছিল দেদার। বোম্বের পথে ঘাটে 'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদের' পাশাপাশি 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনিও শুনা গেল। কংগ্রেসের পতাকা পাশে পাকিস্তানী পতাকাও দেখতে পেলাম। নেহেরু আর জিন্না, দুজনের কথাই পথে-ঘাটে শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম না, ভারত আমার, না

পাকিস্তান আমার। আর রোজ রোজ এত রক্ত কার জন্যে প্রবাহিত হচ্ছে। যে শবগুলোর ধর্মের মাংসগুলো চিল-কুকুরে খাচ্ছে তাদের হাড়গুলো জ্বালানো হবে, না দাফন করা হবে, বুঝে উঠতে পারলাম না। এতকাল আমরা পরাধীন ছিলাম। স্বাধীনতার প্রয়োজন ছিল। এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি, এখন আবার আমাদের গোলাম হবে কারা?

রোজ এত হিন্দু-মুসলমান কেন মারা যাচ্ছে একথার হিন্দুস্থানী, পাকিস্তানী এবং ইংরেজী সবরকম জবাব ছিল। কিন্তু সত্যিকারভাবে তালাস করতে গেলে এর কোন জবাব ছিল না। কেউ বলত, এর জবাব সিপাই বিদ্রোহ-তে পাবে। কেউ বলত, এর জবাব ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে পাবে। আবার কেউ একটু পিছিয়ে গিয়ে বলত, এর জবাব মোগলদের ইতিহাসে তালাস কর। যারা জবাব তালাস করত তারা ক্রমে পিছিয়েই যাচ্ছিল আর হত্যাকারীরা ক্রমশ এগিয়ে চলেছিল এবং রক্ত দিয়ে লেখা ইতিহাস রচনা করছিল।

পাকিস্তান-হিন্দুস্থান দুটো দেশই স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু মানুষ তাদের দেশেই চিরকাল মূর্খতা, বর্বরতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মের দাস হয়ে রইলো।

আমি শরীর খারাপের অজুহাত করে বোম্বে টকিজে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। অমার এসব দেখে শ্যাম মুখ টিপে হাসত, সে আমার মনের অবস্থা জানত। এরপর পানাভ্যাসের মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে এসব চিন্তা থেকে বাঁচতে চাইলাম। সারাদিন সোফায় গুটিসুটি মেয়ে গম্ভীর হয়ে বসে থাকতাম। একদিন শ্যাম স্টুডিও থেকে ফিরে এসে আমাকে টিটকারি দিয়ে বলল,

‘কিহে খোজা, কাব্য-চর্চা শেষ হল না?’

শুনে আমার বড় বিরক্ত লাগল। শ্যাম কেন আমার মত করে ভাবতে চায় না? আমি আহরোত্র এসব নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম আর ওদিকে শ্যাম হৈ-হুল্লোড়, হাসি, চিৎকার ইত্যাদি করে বেড়াত। মনে হতো, ও এসব চিন্তার এক কিনার করে রেখেছে।

অনেক চিন্তা ভাবনা করে করে আমি ঠিক করলাম এখানে আর থাকব না। শ্যাম রাত্রের স্যুটিং এ গিয়েছিল! আমি মাল সামান বাঁধতে

শুরু করলাম। ভোর রাত্রে শ্যাম ফিরে এসে যখন দেখল সব কিছু বেঁধেছেদে ফেলেছি। শুধু বলল, 'চললে তাহলে ?'

'হ্যাঁ।'

এ ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোন কথা হয়নি। শুধু স্যুটিং এর নানা গালগল্প করে কিছুক্ষণ হাসাহাসি করল। যখন আমি রওনা দেব এমন সময় আলমারি খুলে বোতল বের করে দুগ্লাসে ঢেলে আমার দিকে এক গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলল, 'হাপটিল্লা।' আমিও 'হাপটিল্লা' বললাম। শ্যাম হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'শুয়র কোথাকার ?'

'পাকিস্তানের', আমি বললাম। শ্যাম সজোরে চীৎকার করে বলল, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

'জিন্দাবাদ হিন্দুস্থান।' আমি বললাম।

নিচে ট্রাকওয়ালা আমার অপেক্ষা করছিল। আমি নেমে গেলাম। পোর্ট অবধি শ্যাম আমাকে এগিয়ে দিল। জাহাজ ছাড়তে তখনো বেশ দেরি ছিল। শ্যাম এটা ওটা বলে আমাকে আনন্দ দিতে চেষ্টা করছিল। যখন সিটি বাজল 'হাপটিল্লা' বলে সে বিদায় হল। একবারও পেছন ফিরে আর তাকাল না।

লাহোর পেঁছে আমি ওকে চিঠি লিখলাম। সাথে সাথেই ও জবাব দিল।

'এখানে সবাই তোমাকে স্মরণ করে। আমাদের মাঝে তুমি নেই এটা বড়ই তীব্র হয়ে বাজে। ওয়াচা বলে তুমি চোরের মত চলে গেলে। একবার তাকে বলেও যেতে পারতে। বোম্বে টকিজে মুসলমানদের মধ্যে যে ছিল অগ্রদুত সে কেমন করে পালিয়ে গিয়ে নিজের আদর্শকে শহীদ করতে পারল ? ওয়াচা বলে। খুব সম্ভব তুমি ওয়াচাকে চিঠি লিখেছ। আর না লিখে থাকলে একটুও দেরি না করে লিখে ফেল। ইতি

—তোমার শ্যাম।

আজ আমি মৃত শ্যামের আত্মার কাছে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই যে, বোম্বে টকিজ ছেড়ে আসতে পারলাম, কিন্তু নেহেরু কেন কাশ্মীর ছাড়তে পারছেন না ?

নার্গিস

বেশ কিছুদিন আগে নবাব ছাতারী-তনয়া মিসেস তসনিম সেলিম আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন ঃ

‘তা কেমন লাগল আপনার বোনের স্বামীকে ? আপনার সেখান থেকে ফিরে এসে কিন্তু আমাকে বড্ড জ্বালিয়ে মারছে। মানে আপনার নাম করে আমাকে বিরক্ত করছে। তার ধারণা ছিল, আমার অদেখা ভাইটি তাকে ঠিক মত যত্ন আত্তি করবে না এবং ফিরে এসে আমাকে লজ্জা দিতে পারবে। আর এখন ফিরে এসে শুধু উত্যক্ত করে বলছে, ‘জলদি বোম্বে চলে যাও, মাণ্টো বড় আজব লোক।’ এবং এমন করে বলে, মনে হয় মাণ্টো তারই ভাই, আমার কিছু নয়।

আমি তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলাম, বুঝে সুঝে কথা বলো কিন্তু। মেজাজটা আয়ত্ত করে নিও। যাক্ ফিরে এসে আপনার সম্পর্কে সে খুশি-খুশি ভাব ব্যক্ত করছে। আমার ভাই নির্বাচনটা বৃথা যায় নি।

সে আপনার সাক্ষাতের কথা সবিস্তারে বলেছে সত্য, কিন্তু নার্গিসের আলোচনাটা একেবারে চেপে গেছে। আমার ভাই সাহেব তার আগে ভাগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তার মুখের বিবরণটা সবশেষে শুনলাম। তিনি সেখানকার আদ্যোপান্ত সব খবর বললেন। এমন কি নাখশাব এবং আপনার মধ্যেকার যুদ্ধের খবরটাও বড় রসিয়ে বললেন। জিদ্দন বাইয়ের সেখানে যাওয়ার ব্যাপারটায় ভাই সাহেব সত্যি দুঃখিত। আসলে এতে রসদ যুগিয়েছিল শামসাদ ভাই (সে ও আপনার সাথে দেখা করেছে)। তাঁর ইচ্ছা ছিল পেলে আপনাকে নিয়েই যাবেন। ওর সম্পর্ক তো আপনি জানেন, লীলা চিটনীশের প্রতিই সে একটু অনুরাগী। এত বাজে রুচি তো তার নয়।

সেলিম যখন এসেছিলেন আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। তার সাথে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। যেহেতু তাসনিমের মতে তিনি আমার ভগ্নিপতি এজন্যে যথাসম্ভব খাতির তোয়াজ করতে হয়েছে। ফিল্ম লাইনের লোকদের কাছে 'চিয়ার স্যুটিং' নামের উপঢৌকন-ছবি থাকে। আমি তাদেরকে তাও দেখিয়ে দিলাম। সম্ভবত ছবিটার নাম ছিল 'ফুল'। পরিচালক ছিল 'তাসু' অর্থাৎ কে. আসিফ।

সেলিম এবং তার সাথীদেরকে সবদিক দিয়ে খুশী করে দেয়া উচিত। কিন্তু তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হল বোম্বেতে তারা রীতিমত প্রোগ্রাম বানিয়েছেন। কথা প্রসঙ্গে সেলিম আমাকে বললেন, 'নার্গিস আজকাল কোথায় থাকছে?'

'কেন, 'তার মা'র কাছে।'

আমি একটু রসিকতা করে বললাম, কিন্তু আমার রসোক্তিটা মাঠে মারা গেল মনে হল।···মেহমানদের মধ্য থেকে একজন নবাবী ঠাটে বলল, 'জিদ্দন বাইয়ের কাছে?'

'জি হাঁ।'

সেলিম বললেন, 'তার সাথে দেখা করা কি সম্ভব? আসলে আমার এ বন্ধুটি তাকে দেখার জন্যে খুব উদগ্রীব। আপনি কি তাকে চেনেন?

'হাঁ, সামান্য।'

একজন পেছন থেকে অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'কেন?'

কারণ আমরা একত্র হয়ে কোন ছবিতে কাজ করিনি এখনো।'

সেলিম একথা শুনে বললেন, 'রাখুন ওসব কথা। আমরা আপনাকে বেশী বিরক্ত করতে চাই না। থাক তাহলে।'

কিন্তু আমার নিজেরই নার্গিসের কাছে যাবার দরকার ছিল। ক'বারই যাবার মনস্থ করেছি। কিন্তু একাকী যেতে ভাল লাগছিল না। যাকে তাকে নিয়ে গেলে নার্গিসকে হাঁ করে গিলতে থাকে শুধু। এদেরকে নিয়ে যাওয়া যায়। সাদাসিধা লোক এরা শুধু একটু চোখের তৃপ্তির জন্যেই নার্গিসকে দেখার অভিপ্রায়। দেশে ফিরে প্রজা এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছে কাছে গর্ব করে ফিল্ম স্টার নার্গিসের গল্প বলতে পারবে। আমি সেলিমকে বললাম, 'না, বিরক্তির কি আছে? চলুন নিয়ে যাচ্ছি। সম্ভবত দেখা করা যাবে।"

আমি নাগিসের কাছে কেন যেতে চাচ্ছিলাম এটা একটা প্রশ্ন বটে। বোম্বেতে কত ফিল্ম একট্রেস রয়েছে। সবার কাছেই আমার যাওয়া-আসা ছিল কিন্তু নাগিসের কাছে বিশেষভাবে প্রোগ্রাম করে কেন যেতে চাচ্ছিলাম সেকথা বলার আগে একটা কাহিনী বলে নেয়া দরকার।

আমি তখন ফিলমিস্তানে কাজ করি। সকাল আটটায় বেরিয়ে রাত আটটায় ফিরি। একদিন ঘটনাক্রমে একটু সকাল সকালই চলে এলাম। তখন বেলা দুপুর। ঘরে ঢুকতেই আবহাওয়াটা কেমন থমথমে মনে হল। কে যেন তানপুরায় তান তুলে নিজেই তাতে বিভোর হয়ে গুম মেরে বসেছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আমার দুই শ্যালিকা চুলে ফিতা দিচ্ছে। ঠোঁট নেড়ে ফিসফাস কি বলাবলি করছে বোঝা গেল না। অনেকটা সন্ত্রস্ত ভাব তাদের। অকারণে বার বার ওড়না ঠিক করছে।

আমি শোফাতে বসে গেলাম। দু'জন আর একজন ফিসফাস করে একসাথে এসে আমাকে সালাম করল, 'ভাইজান সালাম।'

'অ আলাইকুম সালাম, কি ব্যাপার ?'

আমি অনুমান করলাম, সবাই মিলে সিনেমায় যাবার উদ্যোগ করছে হয়ত। আমার প্রশ্ন শুনে দুজনই একসাথে খিলখিল করে হেসে উঠল।

এরপর আবার ভাবলাম, কোন বান্ধবীকে নিমন্ত্রণ করেছে হয়ত। সে এখন হয়ত আসছে। কিন্তু মাঝখানে অসময়ে আমি এসে সবটা লণ্ডভণ্ড করে দিলাম।

এরপর তিনবোনে মিলে অন্য কামরায় কি ফিসফাস করছিল। মাঝে মাঝে চাপা হাসির গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছিল। অতঃপর এক সময় বড় বোনটি অর্থাৎ আমার অর্ধাঙ্গিনী বোনদেরকে শাসানোর ভঙ্গিতে মূলত আমাকে শোনাবার জন্যেই বলতে লাগল, 'তা আমি বলতে যাব কেন ? তোমরা নিজেরা গিয়েই তো বলতে পার। সাদত সাহেব আজকে সকাল সকাল এসে পড়লেন যে ?'

আমি জানালাম যে স্টুডিওতে কাজ ছিলনা, তাই চলে এলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা (শালীরত্নদ্বয়) কি বলতে চাচ্ছে ?'

'ওরা বলতে চাচ্ছে আজ নাগিস আসছে আমাদের বাসায়।'

'তা আসুক না ক্ষতি কি? ওতো বরাবরই আমাদের বাসায় আসে।'

আমি মনে করেছিলাম, আমাদের প্রতিবেশী নার্গিসের কথা, যার মা এক মুসলমানকে বিয়ে করে ঘরণী হয়েছে। কিন্তু সাফিয়া বলল, 'কি যে বলো, নার্গিস কবে এলো আমাদের বাসায়।'

'কেন, ও বাসার নার্গিস…'

'না, সে নয়। ফিল্ম একট্রেস নার্গিস।'

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সে কি করতে আসছে এখানে?'

সাফিয়া আমাকে সব কাহিনী শোনাল। ঘরে টেলিফোন রয়েছে। অবসর সময়ে তিন বোনই তার সদ্ব্যবহার করে থাকে। যেদিন ফোন করার মত আর কোন বান্ধবী না থাকে, কোন ফিল্ম স্টারের নম্বর তালাশ করে ডায়াল করে। যোগাযোগ হয়ে গেলে এলোপাথাড়ি কথা বলতে থাকে তার সাথে। আমরা আপনার খুব গুণগ্রাহী। আজকেই দিল্লী থেকে এসেছি। অনেক কষ্টে আপনার নম্বরটা পেয়েছি। আপনাকে দেখার জন্যে মনটা বড় উচাটন করছে। কিন্তু বেপর্দা হতে পারি না বলে আপনার বাড়ীতে আসতে পারছি না। যেমন আপনার রূপ তেমনি আপনার অভিনয়। কোকিলের মত মধুময় আপনার গলার স্বর (অথচ সে স্বর হয়ত আমির বাইর বা শামশাদের)।

চিত্রতারকাদের ফোন নম্বর ডাইরেক্টরীতে সচরাচর খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা ইচ্ছা করেই তাতে নম্বর ছাপতে দেয় না। কারণ, ভক্তরা সারাক্ষণ বিরক্ত করতে থাকে। কিন্তু এরা (তিন বোন) আমার বন্ধু আগা খালস, কাশ্মীরির কাছ থেকে বহু চিত্রতারকার ফোন নম্বর জোগাড় করে নিয়েছে, যাদের নম্বর ডাইরেক্টরীতে ছিল না।

সে সব নম্বরের বদৌলতে এরা এ যাবত বহু চিত্রতারকার সাথে অদৃশ্য সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলেছে। ফোন করতে করতে যেদিন নার্গিসের সন্ধান পেয়ে গেল, বেশ জমে উঠল তার সাথে। নার্গিসের কথাবার্তা বেশ ভাল লাগল তাদের। রোজ টেলিফোনে তাদের আড্ডা চলত। আমার শালী রত্নের একজন বলত, আমার বাড়ী আফ্রিকাতে। সে আবার স্বর বদল করে বলত, আমার বাড়ী লক্ষ্ণৌতে। দ্বিতীয়জন বলত, আমরা রাওয়ালপিণ্ডিতে থাকি। বোম্বেতে এসেছি শুধু আপনাকে এক নজর দেখার জন্যে। তৃতীয়

জন (আমার স্ত্রী) কখনো গুজরাটী ভাষায় কথা বলত, কখনো নিজেকে পারসী মেয়ে বলে পরিচয় দিত।

পরিচয় গোপন করে এভাবে রোজ টেলিফোনে আড্ডা শোনা নার্গিসের বড় খারাপ লাগতো। সে বিরক্ত হয়ে তাদের আসল পরিচয়টা জানার জন্যে বকাঝকা করে বলত 'কেন তোমরা মিছামিছি নিজেদের পরিচয়টা লুকাচ্ছ? রোজ এসব আর ভাল লাগেনা, ভাল মানুষের মত পরিচয়টা দিয়ে ফেল বলছি।'

নিঃসন্দেহে নার্গিস তাদের দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। নার্গিসের কাছে রোজ অসংখ্য ভক্তদের টেলিফোন আসতো। কিন্তু বিশেষ করে এ তিনজনকে কেনই জানি তার ভাল লাগত। এ জন্যে সে তাদের পরিচয়টা জেনে ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে কিছুটা ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। তাদের হাজার কাজ থাকলেও রিসিভারটা লুফে নিত। এবং সময়জ্ঞান ভুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে যেত।

এভাবে অদৃশ্য আলাপ আর নার্গিসের ভাল লাগছিল না। একদিন নার্গিস নিজেই সেধে তাদেরকে দেখার জন্যে তাদের বাড়ী যাবার আগ্রহ জানাল এবং টেলিফোনে দিন তারিখ ঠিক করে ফেলল। সাফিয়া তাকে বাড়ীর ঠিকানা এবং লোকেশান পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিল। এরপরও যদি বাড়ী খুঁজে পেতে কষ্ট হয়, বাইখোলার পুলের কাছাকাছি এসে কোন হোটেল থেকে ফোন করলেই সবাই পেঁাছে যাবে সেখানে, একথাও সাফিয়া জানিয়ে দিল।

বাইখোলার পুলের কাছ থেকে যখন ফোন এলো আমি তখন সবেমাত্র ঘরে পা রেখেছি। নার্গিস জানাল, সে নাকি বাড়ী খুঁজে পাচ্ছে না। সুতরাং পুলের কাছের এক স্টোর থেকে সে ফোন করেছে।

নার্গিসকে এগিয়ে আনার জন্যে তিন বোনেই পায়তারা দিচ্ছিল। কিন্তু মাঝখানে আমি আসাতেই ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল। শালীরা ভেবেছিল আমি এতে সায় দেব না। আমি একটু কৃত্রিম রাগ দেখাবার ভাণও করেছিলাম। কিন্তু পারলম না। কারণ অন্যায় কিছুই হচ্ছে না। তদুপরি শালীদের ব্যাপারে বোনাইদের রাগ করাতো বাতুলতা। কথায় বলে, যে ঘরে শালী নেই সে ঘরের আধখানই অন্ধকার। আর আমারতো

মাশাল্লা দুই শালী। পুরো বাড়ীটাই তাদের আওতায়। তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী অবশেষে আমিই যখন গা নাড়া দিয়ে নার্গিসকে এগিয়ে আনতে রওনা দিলাম, ভেতর কামরা থেকে হাততালি শুনতে পেলাম।

পৌঁছে দেখি বাইখোলার পথের উপর জিদ্দন বাঈয়ের ইয়াবড়া গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে। আমি সালাম দিলাম। তিনি সশব্দে সালামের জবাব দিলেন। বরাবর যেমন দিয়ে থাকেন।

'কি খবর মাণ্টো, কেমন আছ?'

'খোদার ইচ্ছায় কোন রকম, আপনি এখানে?'

'না তেমন নয়।' পেছনের সিটে বসা নার্গিসকে এক নজর দেখে নিয়ে বললেন, 'বেবী তার বান্ধবীদের সাথে দেখা করবে। কিন্তু বাড়ীটাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'বলেন কি, চলেন আমার সাথে আমি খুঁজে দিচ্ছি।'

একথা শুনে নার্গিস বাইরে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'আপনি কি তাদের বাড়ী চেনেন?'

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'নিজের বাড়ীকে আবার চিনতে হয় নাকি?'

জিদ্দন বাঈ মুখের পান পাশবদল করে কপালে চোখ তুলে বললেন, 'তুমি কি গল্প করছ আমাদের সাথে?'

আমি দরজা খুলে জিদ্দন বাইর কাছে বসে পড়লাম।

'গল্প করব কেন? সত্যি বলছি অবশ্য আদৌ এর কিছুই জানতাম না আমি। আমার স্ত্রী আর তার দু'বোনরত্নের এসব কাণ্ডকারখানা।'

এরপর আমি সংক্ষেপে সকল ঘটনা বললাম। নার্গিস বড় মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। জিদ্দন বাঈ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'লা হাওলা অলাকুয়াতা...কি ধারার মেয়ে এরা বল দেখি। প্রথম দিনেই তো বলে দিতে পারত যে আমরা মাণ্টোর বাড়ী থেকে বলছি। হায় আল্লা, সহজেই বেবীকে পাঠিয়ে দিতাম, আর এত টানা-হিঁচড়া হত না। এত ঝকমারীও কি মানুষ পোয়াতে পারে? রোজ টেলিফোন আসতো আর বেবী দৌড়ে গিয়ে কথা জুড়ে দিত। আমি এত জিজ্ঞেস করতাম, দিনরাত এত কাদের সাথে কথা বলিস? বলত নাম বলেনা তবে খুব ভাল মেয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। আজ বলল যে তাদের বাড়ীতে যেতে হবে। ঠিকানা বলে

দিয়েছে। আমি বললাম, পাগল হয়েছিস, কেউ ঠিকানা বললেই কি সেখানে রওয়ানা দিতে হবে? আমি হাজার মানা করলাম। তবু মেয়েকে কি মানানো যায়। শেষে আমাকেই নিয়ে আসতে হলো।' আমি মাঝখানে বললাম, 'কি দরকার ছিল আপনার এত কষ্ট করার। ঠিকইতো ও একাইতো আসতে পারত। খামকা আমি বেচারী চলতে পারিনা, আমাকে নিয়ে টানাটানি। তুমিতো আর আমাদের পর নও।'

জিদ্দন বাঈ গল্প উপন্যাস পড়তে ভালবাসতেন। আমার লেখার বেশ কদর করতেন এবং মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। আমার সে সময়কার একটা গল্প 'সাকী'তে ছাপা হয়েছিল। সম্ভবত গল্পটির নাম 'তরকী ইয়াপ্তা কবরেস্থান।' তিনি গল্পটি পড়ে বেশ মুগ্ধ হন।

'তুমি এমন গল্প লিখতে পার তাত আগে জানতাম না। এমন টিপ্পনীও কাটতে জান তুমি। তোমার গল্প পড়ে সেদিন আমার যা অবস্থা হয়েছিল' বেবী দেখেছে।'

আমার বাড়ী খুব কাছেই ছিল, দু'মিনিটের মধ্যে এসে পেঁছিলাম— উপরের বেলকনিতে দাঁড়িয়ে ওরা আমাদেরকে দেখছিল। শালীদ্বয়ের তো খুশীতে ফেটে পড়ার জো আরকি। উপরে পেঁছিতেই বহুদিনের চেনা পরিচিতের মত নার্গিস শালী দুজনকে নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেল। আর আমি, সাফিয়া এবং জিদ্দন বাঈ বৈঠকখানায় বসে পড়লাম।

আমরা নানান কথাবার্তায় বেশ সময় কাটাতে লাগলাম। শেষের দিকে সোফিয়া হঠাৎ মেহমানদের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল এবং কিছু নাশতা পানির বন্দোবস্ত করতে চলে গেল।

সাফিয়া চলে গেলে, আমি এবং জিদ্দন বাই চিত্রশিল্পের উন্নতি অবনতি সম্পর্কে প্রাণখোলা আলাপ জুড়ে দিলাম। জিদ্দন বাঈর মত পানখেকো মহিলা আমি কম দেখেছি। পানের ঘটি-বাটি তার সাথেই থাকত, পানের সরঞ্জাম সামনে মেলে রেখেছিল। সুযোগ পেয়ে আমি কয়েক খিলি খেলাম।

বেশ অনেককাল পরে নার্গিসের দেখা পেলাম। কোন প্রেস শো বা বিশেষ প্রদর্শনী উপলক্ষে যখন সে তার মায়ের আঁচল ধরে হলে আসত তখন বড় জোর তার বয়েস ছিল দশ এগার বছর। টানা এক জোড়া চোখ,

লম্বা মতো মুখ এবং শুকনো হাত পা ইত্যাদি মিলিয়ে তাকে হঠাৎ দেখলে মনে হত, সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে বা ঘুমোচ্ছে। কিন্তু আজ সে যৌবনের ষোলকলায় পূর্ণ চিত্রতারকা নার্গিস। ছোটবেলার সেই লিকলিকে দেহ আর নেই এখন। তবে চোখগুলো তার আগের মতোই রোগা রোগা স্বপ্নমাখা। এদিক দিয়ে বিচার করলে 'নার্গিস' নামটা তার বেশ প্রযোজ্য।

নার্গিস বিনয়ী এবং লাজনম্র ছিল। তবে একটা মুদ্রাদোষ ছিল তার, সারাক্ষণ নাক মুছতো, মনে হত সর্দি তার লেগেই আছে (বরসাত ছবিতে এ মুদ্রাদোষটাকে অভিনয় হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে)। চেহারা দেখে হঠাৎ তাকে গোবেচারী মনে হলেও তার ভিতরে যে-সত্যিকার প্রতিভা রয়েছে এটা ধরা পড়ত। যখন সে চোখ টেনে ঠোঁটের কোণে মৃদু-হাসি মেখে কথা বলত, মনে হত অভিনয় করছে। এই স্বভাবটাই যেন তাকে সার্থক অভিনয় করতে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

নার্গিস সম্পর্কে যে কথাটা আমি বিশেষভাবে অনুভব করছিলাম তাহলো নার্গিসের দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ছিল যে, একদিন সে অনেক উঁচুদরের চিত্রাভিনেত্রী হবেই। নামকরা অভিনেত্রী হবার জন্যে তার মধ্যে কোন রকম তাড়হুড়া ছিলনা। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সময়ের স্বাভাবিক সুযোগ পরম্পরাকে সাদরে সদ্ব্যবহার করে চলেছিল সে।

ওরা তিনজন অপর কামরাতে বেশ জমিয়ে বসেছে এতক্ষণে। কিন্তু তাদের সে আলোচনায় চিত্রশিল্পের কোন কথাই ছিল না। সেলুলয়েডের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে, তারা স্কুলজীবন এবং জীবনের কিশোর স্বপ্নগুলো নিয়ে আলোচনায় ডুবে গিয়ে নার্গিস ভুলেই গিয়েছিল যে, সে একজন নামকরা চিত্রতারকা। আর তার বান্ধবীরাও ভুলে গেল যে তারা একজন বিখ্যাত চিত্রতারকার সাথে গালগল্পে মেতেছে।

আমার স্ত্রী নার্গিসের চেয়ে বয়েসে বড় ছিল। নার্গিস সম্পর্কে তার যে একটা জড়তা ছিল, নার্গিসকে দেখার পর তা আস্তে আস্তে কেটে যেতে লাগল। পর্দায় যখন সে নার্গিসকে দেখত এক ডাকসাঁইটে সবজান্তা মেয়ের মত মনে হত তার। দিব্যি গাট্টা গোট্টা জোয়ানদের সাথে মাখামাখি করছে, হাসছে, কাঁদছে। কিন্তু সামনা-সামনি দেখার

পর তাদের সম্পর্কটা বোনের সম্পর্কে এসে দাঁড়াল। সাফিয়া বড় বোনের মত তাকে শাসিয়ে বলতো, 'ঠাণ্ডা পানি এবং টক ঝাল খেয়োনা যেন। বেশী ছবিতে কাজ করার দরকার নেই। শরীর ঠিক থাকলে সব ঠিক।''

আমি, সাফিয়া এবং জিদ্দন বাই গালগল্পে বেশ মেতে উঠেছিলাম এমন সময় সাদত আপা কোত্থেকে এসে উপস্থিত হলেন। নামের দিকে আমার সাথে মিল রয়েছে। সাদত আপা এক চমকপ্রদ চরিত্র। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ এমন একটা ভঙ্গি রয়েছে যে তাঁর চলা-বলার দিকে মনোযোগ না দিয়ে কারো উপায় নেই। সবারই মনোযোগটা এমনভাবে আচ্ছন্ন করে কথা বলতে বলতে এসে ঢুকলেন যে, জিদ্দন বাঈর সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেবার অবসর হল না। প্রায় আড়াই মণ ওজনের বিরাট বপুটা সোফাতে এলিয়ে দিয়েই বললেন, 'সফ্‌জান, তোমার ভাইজানকে এত করে বললাম যে, পুরনো গাড়ী নিয়োনা, কিন্তু কার কথা কে শোনে। দুকদম না চলতেই হাঁপাতে শুরু করেছে। একপদও আর অগ্রসর হচ্ছে না। এখন শুধু বসে বসে হ্যাণ্ডেল মারছে। আমি বললাম, দরকার নেই, আমি সফ্‌জানের বাসায় গিয়ে বসি, তুমি যে ভাবে পারো কোনমতে বাসায় চলে যাও।

জিদ্দন বাঈ সম্ভবত কোন খাজা-গজাদের কথা বলছিলেন। খুব নাকি বিলাসপ্রিয় ছিলেন তিনি। সাদত আপা আসাতে মাঝখানে কথাটা কেটে গেল। আবার যখন কথা শুরু হল, সাদত আপাও তাতে অংশ গ্রহণ করলেন। কাঠিয়াদার এবং তার আশেপাশের প্রায় সব নবাবদের হাঁড়ির খবর জানা ছিল তাঁর। কারণ মাংরুলের নবাব পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়েছে।

জিদ্দন বাঈ তাঁর পেশার কল্যাণে দেশের উপরতলার প্রায় সব মহারথীকেই জানতেন। কথায় কথায় এক গণিকার কথা উঠল। অনেক নবাব বাদশার মাথামুণ্ড খেয়েছে নাকি সে। সাদত আপা বলে উঠলেন, ''খোদা এমন মাগীদের খপ্পরে যেন কাউকে না ফেলে। একবার যার সাথে এগুলোর সংযোগ ঘটে পুরুষদের দীন দুনিয়া সব নস্যাৎ হয়ে যায়। সফ্‌জান, তোমাকে কি বলব, পুরুষদের যদি এ রোগে ধরে বসে কেউ বাঁচাতে পারে না তাকে। এর মত বড় রোগ আর নেই। 'ধনদৌলত, টাকা, পয়সা, স্বাস্থ্য……' ''

এভাবে তিনি বলেই যাচ্ছিলেন। আমরা চেষ্টা করছিলাম কিভাবে তাঁকে নিরস্ত করা যায়। জিদ্দন বাঈ কিন্তু তার হাঁ-তে হাঁ মিলাচ্ছিলেন। আমরা শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমরা যতই তাঁকে নিরস্ত করার মতলব আঁটছিলাম ততই তিনি মুখর হয়ে উঠছেন। বলতে বলতে জোশ এসে গেল তাঁর। এবার রীতিমত গালি ছুঁড়তে শুরু করলেন। গালির ফাঁকে পলকের জন্যে, একবার জিদ্দন বাঈর দিকে তাকালেন। জিদ্দন বাঈর চোখ মুখ সাদা হয়ে গেল এবং থর থর করে তাঁর গা কাঁপছিল। সাদত আপা তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে নিজের রাণে এক থাপ্পড মেরে জিদ্দন বাঈর চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আপনি? আপনি জিদ্দন বাঈ তো, জিদ্দন বাঈ না আপনার নাম?'

জিদ্দন বাঈ বড় নরম হয়ে মাথা নেড়ে জানালেন, 'হাঁ'।

'তা'লে আপনি কম কিসে? আপনিও তো পয়লা নম্বরের গণিকা, না সফুজান?'

সফুজান একেবারে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলো। আমি জিদ্দন বাঈর দিকে তাকিয়ে একটু উপশমের হাসি হাসলাম। আমার হাসিটা যে খুব প্রাণখোলা ছিল তা বলতে পারব না। কিন্তু জিদ্দন বাঈ এমন করে হাসলেন যেন কিছুই হয়নি। তারপর অবলীলাক্রমে তিনি সেই আলোচ্য গণিকার বাদবাকী অংশটা সবিস্তারে বললেন।

জিদ্দন বাঈ যতই জমাতে চেষ্টা করছিলেন তেমন আর জমল না। সা'দত আপা নিজের ভুল সম্পর্কে একটু সচেতন হলেন আর আমরাও শ্রোতা হিসেবে যে কথায় সংক্রমিত হলাম তার প্রভাবটা মন থেকে দূর করার জন্যে আইঢাই করছিলাম। এমন সময় ওরা এসে পড়ল সেখানে। ওরা এসে পড়াতে আমার গুমটটা কেটে যেতে লাগল।

একথা সেকথার পর নার্গিসকে গান গাইবার ফরমাশ করা হল। জিদ্দন বাঈ বললেন, 'আমি ওকে গান শেখাইনি। কারণ এতে মোহন বাবুর মত ছিল না। অবশ্য এক আধটু—যে না গাইতে পারবে এমনও নয়।' তারপর মেয়েকে সম্বোধন করে বললেন. 'শোনাও না বেবী, যেমন পার তেমনই শোনাও।'

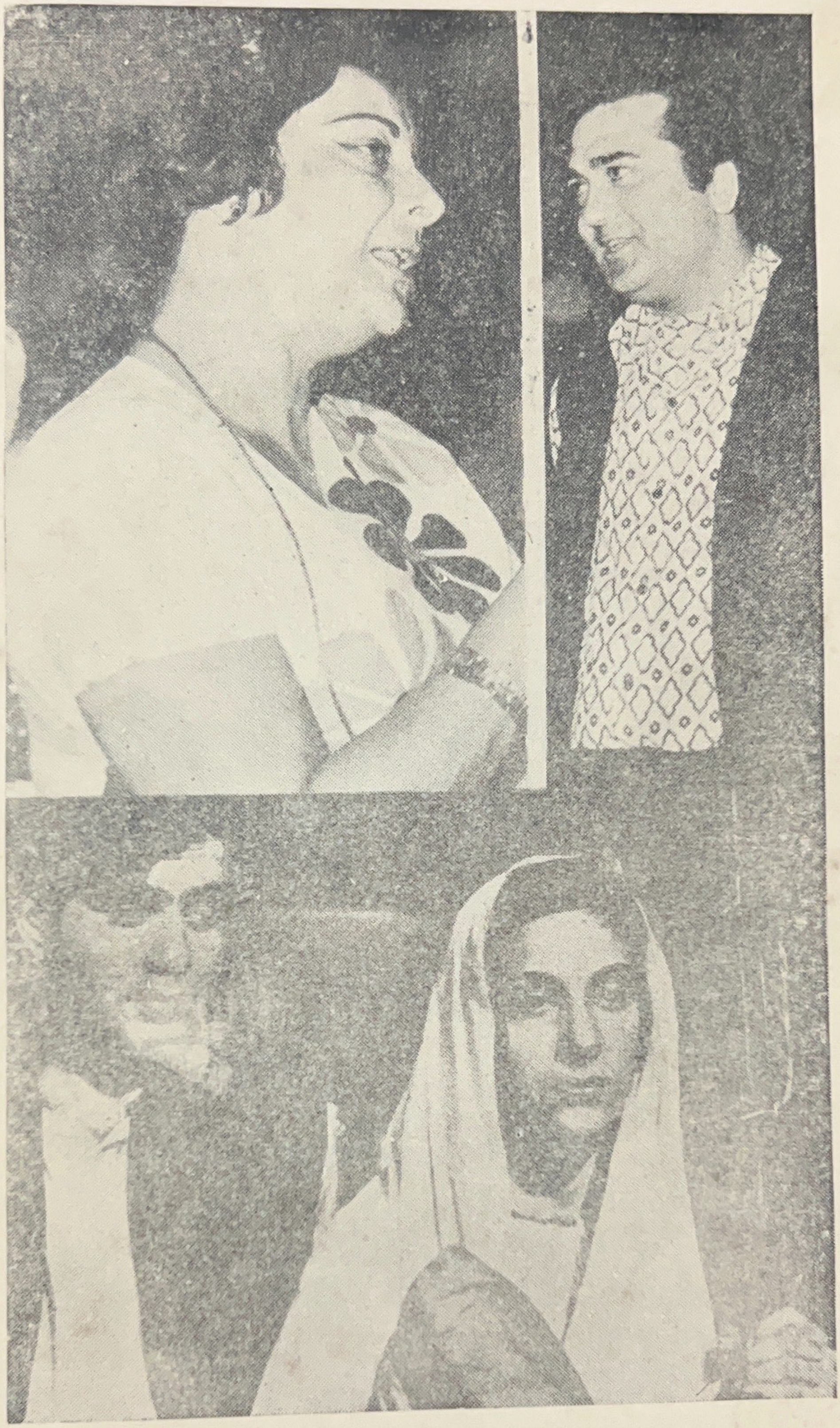

নার্গিস—সুনীল, দিলীপ—নার্গিস

নার্গিস গাইতে শুরু করল। স্বরে তেমন দরদ নেই। অত্যন্ত নিম্নমানের সুরে গাইতে লাগল সে। মাশাল্লা, আমার ছোট শালীও এর চেয়ে ভাল গাইতে পারে। করা কি, ফরমাশ যখন করা হয়েছে, শ্রবণশক্তির উপর কিছুক্ষণ অত্যাচার গ্রহণ করতে হল। গান শেষ হলে সবাই মিলে প্রশংসা করল। আমি আর সা'দত আপা কিছুই বললাম না। এরপর জিদ্দন বাঈ চলে যাবার জন্যে উঠলেন। ওরা (নার্গিস ও শালীরা) বিদায়ী গলাগলি করল। কিছুক্ষণ ফিসফাস হল। আবার যেন আসে, এসব বলে কয়ে মেহমানদেরকে বিদায় দিল।

অভিনেত্রী নার্গিসের সাথে এ-ই আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

এরপর আরো ক'বার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। ওরা ফোনে ডাকত আর নার্গিস একা গাড়ী নিয়ে এসে পড়ত। এ ভাবে মেলামেশা করাতে ওদের মধ্যে বেশ অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল। ওদের কাছে নার্গিসের অভিনেত্রী সত্তা লোপ পেয়ে গেল। নার্গিস চলে গেলে তিন বোনে মিলে বলাবলি করত, 'সত্যি নার্গিসের মত ভাল মেয়ে আর হয় না। মোটেই এ্যাকট্রেস বলে মনে হয় না তাকে।'

ইতিমধ্যে তিন বোনে মিলে একদিন নার্গিসের নতুন একটা ছবি দেখল। স্বভাবতঃই নার্গিস তাতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছে। নায়কের সাথে তার প্রেমালাপ এবং বিচ্ছেদের আবেগ ইত্যাদি দেখে সাফিয়া বলল, 'হায় আল্লা, ছবির মধ্যে নার্গিস এমন করল মনে হল সত্যি সত্যি সে লোকটার প্রেমে পড়েছে। অথচ কাল আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছিল 'টফি কেমন করে বানাতে হয়।'

নার্গিসের অভিনয় সম্পর্কে আমার ধারণা অন্যরকম। অভিনয়ের মধ্যে প্রেমদ্বন্দ্ব খুঁজতে যেয়ে হাঁপানো আর স্কুলের স্পোর্টস্-এ দৌড় দিয়ে হাঁপানো ঠিক এক বস্তু নয়। তার অভিনয়ে প্রেমদ্বন্দ্বটা কোন্ ধরনের হয় নার্গিস তা নিজেও উপলব্ধি করতে পারতো না। তার অভিনয়ে গভীর হৃদয়াবেগ প্রকাশ পেত না। অবশ্য আমি তার প্রথম দিককার ছবিগুলোর কথা বলছিলাম।

পরবর্তীকালে তার অভিনয়ে বয়েস এবং অভিজ্ঞতার রং লেগেছে। এবং পাকাপোক্ত অভিনয় করতে শিখেছে। এখন স্কুলে দৌড়ানোর ক্লান্তি

এবং প্রেমের ক্লান্তির মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে নার্গিস ভালভাবে সচেতন ছিল। মনস্তত্ত্বের গভীর জটাজালে তার আনাগোনা ছিল।

নার্গিস অত্যন্ত ধীর মন্থর গতিতে তার অভিনয়ের সোপানগুলো অতিক্রম করেছে। যদি সে রাতারাতি একটা কিছু হয়ে বসত, তাহলে শিল্পজীবী দর্শকদের কাছে নার্গিসের যেমন অপমৃত্যু হত, তেমনি ছোটবেলা থেকেই যদি সে ইঁচড়ে পাকা হয়ে খোলা বাজারে তার দেহের মাপজোখ প্রদর্শন করে বেড়াতো, সেটাও আমাদের দুঃখের কারণ ছিল।

নার্গিস এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে যে ঘরের মেয়েকে অভিনেত্রীর পেশা গ্রহণ না করে অন্য কোন গত্যন্তর ছিল না। জিদ্দন বাঈয়ের বয়েস পেরিয়ে গেছে। দুই ছেলে আছে তার, কিন্তু তার সব মনোযোগ নার্গিসের প্রতিই। নার্গিসের চেহারা-সুরত তেমন আকর্ষণীয় ছিল না। গলার স্বরও তেমন হৃদয়গ্রাহী নয়। কিন্তু জিদ্দন বাঈ জানতেন, অন্তরে যদি শিল্পরস থাকে তাহলে কৃত্রিম আভরণেও তাকে হৃদয়গ্রাহী করা যাবে। এই ভেবে তিনি নার্গিসকে অভিনেত্রী করে গড়ে তোলার জন্যে তাঁর সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন।

বাড়ীতে জিদ্দন বাঈ, তাঁর মা, মোহন বাবু আর নার্গিস ছিল। ছেলে দুটোর ভরণ পোষণের ভারও জিদ্দন বাঈয়ের উপর ছিল। মোহনবাবু এক নবাবজাদা ছিলেন। জিদ্দন বাঈয়ের রূপ এবং গলার সুর শুনে মজে গিয়েছিলেন। অর্থ, বৈভব, স্বাস্থ্যসম্পদ সবি ছিল তার—সবি তিনি জিদ্দন বাঈয়ের প্রেমানলে ঢেলে দিলেন। শেষকালে যথাসর্বস্ব হারিয়ে জিদ্দন বাঈয়ের করুণার পাত্র হয়ে দিন গুজরান করছিলেন। সেকালে জিদ্দন বাঈয়ের বড় নামডাক ছিল। বড় বড় নবাব বাদশা তাঁর গান শুনে 'এনামের' বৃষ্টি বইয়ে দিতেন। তারপর মহফিল শেষে যখন তিনি ঘরে ফিরে আসতেন মোহনবাবুকেই তিনি সত্যিকারভাবে প্রেমাবেগে সিঞ্চিত করতেন। কারণ, একমাত্র মোহনকেই তিনি ভালবাসতেন। মোহনই ছিল তাঁর সব।

আজীবন মোহনবাবু জিদ্দন বাঈয়ের কাছেই ছিলেন। মোহনবাবুকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিলেন জিদ্দন বাঈ। কারণ তাঁর জানা ছিল, সব রকম সম্পদকে তিনি পদদলিত করে তাঁর কাছে এসে

আত্মাহুতি দিয়েছেন। তারপরও তিনি আরো ভালবাসতেন তাঁকে এজন্যে যে, তিনি তাঁর সন্তানের জনক।

যাক, যা বলছিলাম। নার্গিসকে অভিনেত্রী হতেই হতো এবং অবশেষে হলোও তাই। তার সুউচ্চ খ্যাতিসৌধ নির্মাণের পেছনে যে রহস্য রয়েছে, আমি মনে করি, তা হচ্ছে তার আন্তরিক শিল্প সাধনা এবং গভীর আত্মবিশ্বাস।

আমার শালীদের সাথে নার্গিসের মেলামেশার মধ্যে নার্গিসের একটা সংকোচবোধ লক্ষ্য করতাম আমি। নার্গিস মনে করতো, ওরা না জানি কেমন আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে। নার্গিস সে পরিবেশ হয়ত পায়নি। রোজ দেখতাম গলায় গলায় খাতির, কিন্তু নার্গিস কোনদিন ওদেরকে নিজের বাড়ীতে নেবার কথা উচ্চারণ করত না। মনে করত ওরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে না। শুধু শুধু লজ্জা পেতে হবে। সেদিন আমি বাড়ী ছিলাম। নার্গিস কথায় কথায় বলেই ফেলল, 'আমাদের বাড়ী যাবে? চলো না একবার।'

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা কথা শুনে তিন বোনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ভাবখানা হল, বললেই হল আরকি, আমরা কি আর নার্গিসের বাড়ী যেতে পারি? সাফিয়া যেহেতু আমার ভাবধারা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিল, এজন্যে নার্গিসের নিমন্ত্রণকে অমর্যাদা করল না এবং একদিন আমাকে না বলেকয়েই নার্গিসের বাড়ী চলে গেল।

নার্গিস গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিল। বোম্বের বনেদী পাড়ায় নার্গিসদের 'মেরিন ড্রাইভ' ফ্লাটের সাজগোজ দেখে অনেকটা ওরা হকচকিয়ে গেল। তাদের জন্যে বিশেষভাবে নানা কিছুর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মোহনবাবু আর যুবক ছেলে দু'জনকে সাময়িকভাবে ঘরে আনতে বারণ করে দেয়া হল। কারণ, নার্গিসের সইরা এসেছে। পুরুষ চাকরদেরকেও অন্দরে আসতে বারণ করে দেয়া হলো। স্বয়ং জিদ্দন বাঈও ক্ষণিকের জন্যে মেহমানদের পাশে বসে তারপর এক সময় কেটে পড়লেন। নার্গিস যেন নিরঙ্কুশভাবে সইদের সান্নিধ্য পায় আবার সেদিকে খেয়াল।

নার্গিস তাদেরকে পেয়ে খুবই খুশী হয়েছে। তাদের যত্ন আত্তির ব্যাপারে পান থেকে চুন খসার উপায়টুকু পর্যন্ত ছিল না। কাছেই

পিয়ারসনের বিখ্যাত 'মিল্কসেক'-এর দোকান ছিল। নার্গিস নিজেই গাড়ী করে যেয়ে জগ ভরে 'মিল্কসেক' নিয়ে এল। চাকরদেরকে দিয়ে আনাতে পারত। কিন্তু তা না করে নার্গিস নিজেই গেল।

নার্গিস তাদের যত্ন-আত্তি করতে যেয়ে এতবেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে সুদৃশ্য এক সেট গ্লাস হাত থেকে ফেলে চুরমার করে দিল। ওরা আফসোস করলে নার্গিস বলল, 'তাতে কিছু হবে না। বিবি (তার মা) রাগ করলে ডেডি তাকে বুঝিয়ে নেবেন।'

মোহনবাবু নার্গিসকে খুব ভালবাসতেন। নার্গিসও ডেডির জন্যে একরকম বলতে গেলে পাগল ছিল।

'মিল্কসেক' পান করানোর পর নার্গিস তার এলবাম খুলে বসল। বিভিন্ন স্টাইলের ছবিতে ভরা এলবামটি। ওরা কখনো ছবির দিকে, কখনো নার্গিসের দিকে তাকাত। এমনি করে ছবি দেখা শেষ করল। সাফিয়া বলল, "হায় নার্গিস, ছবির নার্গিসগুলো এমন দেখাচ্ছে কেন?" শুনে নার্গিস শুধু মুচকি হাসল। সাফিয়া আমাকে জানাল, "বাড়ীতে নার্গিস নেহাতই এক গোবেচারী মেয়ে। ছবির ঠাটঠমক, কথাবার্তা এবং হৈ-হুল্লোড় জাতীয় কোন কিছুই তার ঘরোয়া পরিবেশে নেই। সাদা কথায় বলতে গেলে নার্গিস নেহাতই এক ঘরোয়া মেয়ে।"

এটা নিশ্চিতভাবে সত্য যে, নার্গিস খ্যাতির শীর্ষে গেছে। ভাগ্য-বিধাতা তার ভাগ্যের সব কিছু লেখাজোখা শেষ করে কাগজগুলো যেন তার হাওলা করে দিয়েছেন কিন্তু তারপরও নার্গিসকে হৃষ্ট মনে হতো না। যেন একটা বিষাদ জাল অহোরাত্র বুনে চলেছে সে। হয়ত বা তার অবচেতন মনে একটা ধারণা এসে জেঁকে বসত যে, এভাবে কৃত্রিম প্রেমের খেলা খেলতে খেলতে একদিন সে এমন নিঃসীম শূন্যতায় এসে থমকে যাবে, যেখানে আসল বলতে আর কিছু নেই। শুধু মরীচিকা আর মরীচিকা। তেষ্টায় প্রাণটা আনচান করবে কিন্তু এক ফোঁটা পানি পাওয়া যাবে না। উপরের মেঘমালা এক বিন্দু জল তখন বর্ষণ করবে না। কারণ, মেঘ জানে নার্গিসের তেষ্টাটা কৃত্রিম। ভাবতে গিয়ে নার্গিস হয়ত এক সময় ভেবে বসেছে, তার সত্যিকার তেষ্টাটাও কৃত্রিম নয়তো আবার?

বেশ অনেককাল পর নার্গিসকে আবার পর্দাতে দেখলাম। কেমন যেন নিষ্প্রাণ অভিনয়। আগের সেই প্রাণবন্ত অভিনয় তার কোথায় গেল? আমার মতে এর জবাব একমাত্র নার্গিসই ভাল দিতে পারবে।

তিনজন আমাকে না জানিয়ে গিয়েছিল বলে বেশী সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি চলে এল। ফিরে এসে নার্গিস সম্পর্কে ওদের যে আলোচনাটা সবচেয়ে মুখ্য হয়ে দাঁড়াল, তা হলো, নার্গিসের বিয়ে। শালী রত্নদ্বয়ের বার বার জানতে ইচ্ছা করছিল কবে কখন কার সাথে নার্গিসের বিয়ে হচ্ছে। ওদের বোন, যার বিয়ে বছর পাঁচেক আগেই হয়ে গেছে, নার্গিস সম্পর্কে তার সমস্যা হল, নার্গিসের বিয়ে হলে আবার মা কেমন করে হবে সে?

চুপি চুপি নার্গিসের বাড়ী যাওয়ার ব্যাপারটা প্রথম ক'দিন চাপা দিয়ে রাখল। তারপর একদিন বলে দিল। আমি কৃত্রিম রাগ দেখালাম। ওরা ভেবেছে, সত্যি সত্যি আমি রাগ করেছি। ক্ষমা চেয়ে বলল, 'সত্যি আমরা অন্যায় করেছি। খবরটা কাউকে বলবেন না কিন্তু।'

একজন একট্রেসের বাড়ীতে দলবেঁধে যাওয়াটা বিরাট একটা অপরাধ হয়ে গেল যেন। আমার জানামতে আমাকে ছাড়া আর কাউকে কোনদিন খবরটা জানায়নি ওরা। এমনকি ওদের মাকেও না। যদিও ওদের মা (আমার শাশুড়ী) তেমন সংকীর্ণমনা ছিলেন না।

আজ এত বছর পরও আমি এ কথার হদিস খুঁজে পেলাম না যে একজন একট্রেসের বাড়ী যাওয়াতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছিল? অভিনয়-বৃত্তি এতই কি ঘৃণ্য কাজ? কেন, আমাদের পূতপবিত্র খান্দানী মানুষদের মধ্যে কি এমন কোন মহাজনরা নেই, যাদের সারাটা জীবন ধোঁকা এবং অপকর্মে অতিবাহিত হয়েছে? নার্গিস অভিনয় জীবন বেছে নিয়েছে পেশা হিসেবে, এবং এটা সে ঢাক ঢোল বাজিয়েই করছে। যারা লুকিয়ে অপকর্ম করছে তাদের তুলনায় মন্দ করছে কি?

এ লেখার প্রথম দিকে যে চিঠির কথা বলেছিলাম এবার ফিরে আসা যাক সে কথায়।

আমার নিজেরও যেহেতু নার্গিসকে একবার দেখার ইচ্ছা হচ্ছিল, এজন্যে মিঃ সেলিমদের সাথে 'মেরিন ড্রাইভ' রওনা হয়ে গেলাম। উচিত

ছিল, আগে ভাগেই জিদ্দন বাঈকে ফোন করে জানিয়ে দেয়া যে, ক'জন মেহমান আসছে, নাগিস যেন এ ব্যাপারে সচেতন থাকে। কিন্তু এসব লৌকিকতা আমার ধাতে সয়না। সুতরাং না বলে কয়েই যেয়ে উপস্থিত হলাম।

জিদ্দন বাঈ বারান্দায় বসে কুটুর কুটুর করে সুপারী কাটছিলেন, আমাকে দেখেই বললেন,

'আরে মাণ্টো যে, এসো বাবা এসো। আরে ও বেবী, তোমার সইরা এসেছে।'

আমি বললাম, 'সইরা নয় অন্য ক'জন লোক এসেছে। তাদের আচ্ছা একটা পরিচয় দিতে গিয়ে যখন বললাম 'নবাব ছাতারীর জামাইবাবুও এসেছেন। জিদ্দন বাঈয়ের চেহারা কেমন যেন একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললেন, 'ঠিক আছে তাদেরকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

ইতিমধ্যে নার্গিস এসে দাঁড়াল সেখানে। তিনি নার্গিসকে বললেন, 'তুমি ভেতরে যাও বেবী, মাণ্টোর ক'জন বন্ধু এসেছে।'

জিদ্দন বাঈ সবাইকে এমনভাবে গ্রহণ করলেন, যেন আমরা বাড়ী দেখতে এসেছি। আমার সাথে যে সহজ ভাবটুকুও ছিল সেটুকুও উবে গেল। আমরা সবাই যেন নতুন মানুষ। 'তুমি' রেখে 'আপনি' করে কথা বলতে শুরু করলেন। 'আসুন বসুন, বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি 'ধরনের কথা শুনে আমার বড্ড খারাপ লাগছিল।

আমি যখন নানা কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বন্ধুদের আসল উদ্দেশ্যের কথা পাড়লাম, বললেন, 'বেবীর সাথে দেখা করতে চাচ্ছে? কিন্তু আজ ক'দিন থেকে ওর শরীরটা যেন কেমন হয়ে গেছে॥ উপর্যুপরি স্যুটিং করতে বেচারীর নাকে দম এসে গেছে। এত করে বলছি যে শরীরটার দিকে একটু দেখো। মেহবুবও বলছিল শরীর খারাপ করে লাভ নেই। দরকার হয় ক'দিন স্যুটিং বন্ধ করে রাখি। তবু তুমি আরাম করে নাও। কিন্তু কার কথা কে শোনে? স্যুটিং-এর পাগলা নেশায় পেয়ে বসেছে ওকে। আজ আমি জোর করে শুইয়ে রেখেছি—সর্দিতে মাথা ভারী হয়ে আছে।'

একথা শুনে বন্ধুদের সব আশায় জল পড়ল। জিদ্দন বাঈ এদিকে সেদিকের নানা কথা বলে তাদেরকে বিদায় করে দিতে চাচ্ছিল। আমি বিলক্ষণ জানি নার্গিসের কোন অসুখ-বিসুখ নেই। আমি জিদ্দন বাঈকে প্রায় নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে বললাম, 'দেখুন, বেবীর স্বাস্থ্য খারাপ এটা ঠিক, কিন্তু এরা অনেক দূর থেকে এসেছে। অল্প সময়ের জন্যেও যদি—'

জিদ্দন বাঈ ভেতরের দিকে মুখ করে তিনচারবার ডাকাডাকি করার পর অবশেষে নার্গিস বেরিয়ে এল। সবাই দাঁড়িয়ে নার্গিসকে সালাম করল। আমি শুধু বসেছিলাম। নার্গিসের আসা, বসা, সালামের জবাব দেওয়া—সবকিছু যেন অভিনয় মনে হল। সে যেন ক্যামেরার সামনে সংলাপ আওড়াচ্ছে।

'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশী হলাম।'

'জি হাঁ, আজকেই এসেছি।'

'কাল পরশু নাগাদ চলে যাব।'

'খোদার ইচ্ছায় এখন আর আপনার নাগাল আর পায় কে? আপনি এখন খ্যাতির চূড়ায়।'

'আমি আপনার সব ছবির প্রথম শো দেখেছি।'

'আপনার এ ছবিটা আমার এলবামে রাখব।'

এসব কথার জবাব নার্গিস এমন ভঙ্গিতে দিল, যেন এক নবাবজাদী এসে বসেছেন। ইতিমধ্যে মোহনবাবু কোত্থেকে এসে চুপচাপ বসে গেলেন আমাদের পাশে। তিনি কিছুই বললেন না, শুধু ঘুরে ঘুরে আমাদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিলেন।

সবচেয়ে বেশী কথা বলেছেন জিদ্দন বাঈ। তাঁর সব কথার প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হল ভারত ভূখণ্ডের যত নবাববাদশা আছেন তাদের নাড়ী নক্ষত্রের খবর জানা আছে তাঁর।

নার্গিস আগাগোড়া অভিনয়সুলভ আলাপই করল। এজন্যে আমার কাছে এবং আমার সাথীদের কাছে নার্গিসের সাক্ষাতকারটা একেবারে রসকষহীন হয়ে রইল। আমি আশ্চর্য হলাম আমার শালীদের সাথে যে কিশোরী নার্গিস কথা বলত, বোকা আলাপ করত, সে নার্গিস কোথায় গেল?

এরপর সেলিমরা আমাকে না জানিয়েই আর একবার ন্যাগিসের বাড়ী গিয়েছিল। কিন্তু সে সাক্ষাৎকারও মাঠে মারা গেছে কিনা জানি না।

নাখসাবের সাথে আমার কি যুদ্ধ হয়েছে, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা। তবে যথাসম্ভব আমাদের সাথে তখন নাখসাবও সেখানে উপস্থিত ছিল। কারণ, জিদ্দন বাঈ কবিতা (প্রেমের) শুনতে ভালবাসতেন। বোম্বের প্রায় কবিরাই তাঁর বাড়ীতে আসা-যাওয়া করত। হতে পারে সে মজলিসে নাখসাবের সাথে কবিতা নিয়ে আমার কথা কাটাকাটি হয়েছিল।

আমি যখন অশোকের সাথে থাকতাম, তখন একবার নার্গিসকে এক চমকপ্রদরূপে দেখেছিলাম। জিদ্দন বাঈ নিজে একটা ছবি করতে যাচ্ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা সে ছবিতে নায়ক হিসেবে অশোক কাজ করুক। অশোক জিদ্দন বাঈয়ের বাড়ী যাবে। কিন্তু ওর যা বরাবরের অভ্যাস কোথাও একা যেতে চাইত না। বাধ্য হয়ে আমাকে সাথে যেতে হল।

দেদার কথাবার্তা চলছে। পয়সা কড়ির ব্যাপার থেকে শুরু করে তোষামোদ পর্ব পর্যন্ত নানা ধরনের কথা চলছে। জিদ্দন বাঈ কথা বলতে বলতে কখনো চপলাবতী, কখনো রাশভারী মহিলা, কখনো প্রযোজক-পরিচালক আবার কখনো নার্গিসের মা বনে বসেন, তখন শুধু মেয়ের গুণকীর্তন করাই তাঁর আসল কথা হয়ে দাঁড়ায়। মোহনবাবু চুপচাপ বসে থাকতেন। হুঁ হাঁ ছাড়া আর কোন কথা বলতেন না তিনি।

ছবি তৈরী করতে যে টাকা খরচ হবে বা হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে হিসাব কিতাব শুরু হল। নার্গিস হঠাৎই কথা থেকে ফাঁক বের করে প্রসঙ্গহীনভাবে অশোককে আক্রমণ করে বসল, 'দেখ অশোক, জানি নায়ক হিসেবে তোমার বেশ নামডাক। সবাই তোমাকে চেনে। কিন্তু তাই বলে আমরাও একেবারে ফেলনা নই। আমি তোমার চেয়ে অভিনয় কোন অংশে কম জানি না।'

বুদ্ধিমান অশোক কোনমতে সে কথা এড়িয়ে কাজের কথায় যোগ দিল। কিছুক্ষণ পর নার্গিস আবারও কথার ফাঁক বের করে শুরু করল,

'তুমি মনে কর অনেক মেয়ে তোমার জন্যে পাগল। এমন আমার জন্যেও বহু লোক প্রাণ দিতে প্রস্তুত। বিশ্বাস না হয়, লোকদের জিজ্ঞেস কর।'

জিদ্দন বাঈ এমতাবস্থায় অনেকটা আপোস মীমাংসার মত করে বলেন, 'দেখ অশোক, তোমার জন্যে আর আমার বেবীর জন্যে সবাই পাগল। এজন্যে আমি চাই তোমরা দুজন একসাথে এ ছবিতে কাজ কর। তাহলে দু'হাতে আমরা ইচ্ছে মত পয়সা কামাতে পারব।'

জিদ্দন বাঈ যখন দেখল, কথাগুলো তেমন গায়ে মাখানো গেল না। অশোক যেমন গম্ভীর ছিল তেমনই রয়েছে। আমাকে উদ্দেশ্য করে শুরু করলেন, 'সত্যি মান্টো, অশোক এত বড় এ্যাক্টর হয়েছে অথচ কত কম কথা বলে দেখো। চোখে লাজ লজ্জা বলে একটা জিনিস আছে। খোদা বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখুক ওকে। অশোকের যাতে অসুবিধা না হয় এজন্যে আমি ওর উপযোগী করে বিশেষভাবে সংলাপ লিখিয়েছি। শুনবে নাকি সংলাপগুলো?'

আমি মনে মনে বললাম, সে সংলাপ নাইবা শুনলাম। আপনাদের সংলাপই তার চে' ঢের মজাদার। ছবির চেয়েও।

কথায় কথায় সুরাইয়ার কথা এসে গেল। জিদ্দন বাঈয়ের যেন হঠাৎ নাকে গন্ধ লেগে গেল। সুরাইয়ার চৌদ্দ পুরুষকে উদ্ধার করতে শুরু করলেন তিনি। ওর না গলা ভালো, না কোথাও ওস্তাদের কাছে গান শিখেছে। মুখের না আছে শ্রী। দাঁতগুলো আঁকা বাঁকা—আরো কত কি। এরপর সুরাইয়াদের বাসায় গেলে আবার জিদ্দন বাঈ এবং নার্গিস সম্পর্কেও বেশ কিছু শুনে আসা যায়। সুরাইয়ার নানীও (আসলে তার মা) জিদ্দন বাঈয়ের চেয়ে কোন অংশে কম যান না। বলেন, 'নার্গিস? ওর আবার একটা চেহারা? মেয়েদের মুখের শ্রী আল্লা দুশমনেরও যেন এমন না করুক।'

"ভি এইচ দেশাই"

'লাইট্স্ অন—ফ্যান অন—ক্যামেরা রেডী—স্টার্ট মিঃ জগতাপ।'

'স্টার্টেড।'

'সিন থারটি ফোর—টেক্টেন।'

দেশাই তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে শুরু করল, 'নীলাদেবী আপ কুচ ফিকির মত কিজিয়ে মায় নে ভি পেশাওয়ার কা পেশাব পিয়া হায়।'

'কাট কাট'

লাইটস্ অন হলো? দেশাই হাতের রাইফেলটা একদিকে সরিয়ে রেখে বললো, 'ওকে মিঃ গাঙ্গুলী' এবার ঠিক হয়েছে, তাই না?'

অশোকের বলতে ইচ্ছে করছিল ঠিক হয়েছে না ছাই হয়েছে। কিন্তু তানা বলে চরম বিরক্তিটাকে ঢাকা দিয়ে দূর চক্রবালের দিকে তাকিয়ে জোর করে একটু হেসে বলল, ওয়াণ্ডারফুল!, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন তাই না মাণ্টো? আমি দেশাইকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'সত্যি ওয়াণ্ডারফুল!!'

অন্যান্যদের মধ্যে চাপা হাসির গুঞ্জন চলছিল। কিন্তু দেশাইকে অত্যন্ত খুশী মনে হল। কারণ, আমার মুখ থেকে কোন সময় প্রশংসা শুনবার ভাগ্য তার হয়নি। আসলে অশোক আমাকে বলে দিয়েছিল স্যুটিং- এ দেশাইকে যেন নিরুৎসাহ না করি। দেশাই যদি টের পায় যে আমরা টিটকারী করছি, তা'লে সব কাজ তছনছ করে দেবে সে।

আমাদের কানাকানি ফিস ফাস শেষ হলে দেশাই স্মারককে বললো, 'ঠিক আছে ভাই, এর পরের ডায়ালগটা বলো।'

শুনে অশোক বললো 'মাণ্টো ডায়ালগটা আর একবার নিয়ে নিলে হয় না?'

আমি দেশাইর দিকে তাকিয়ে বললাম, মিঃ দেশাই, ডায়ালগটা আর একবার নিলে বোধহয় ভাল হয়। এবার আরো ওয়াণ্ডারফুল হবে।'

দেশাই গুজরাটি কায়দায় মাথা দুলিয়ে বলল, 'তো নিয়ে নাওনা—কে মানা করছে। গরম গরম হয়ে যাক।'

দত্তরাম চীৎকার করে বলল, 'লাইট্‌স্‌ অন।'

লাইট্‌স্‌ অন হলো। দেশাই আবার রাইফেলটা সামনে নিল। স্মারক ডায়ালগের খাতা নিয়ে দিশাইর দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'আজ্ঞে, 'ওই ডায়ালগটা আর একবার বলবেন!'

'কোন্‌ ডায়ালগ?' দেশাই বললো।

ওই যে যেটা খুব ওয়াণ্ডারফুল হয়েছে।'

দেশাই রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, ওটা আমার বেশ মনে আছে।'

স্মারক আমাকে ইঙ্গিত করে বলল, 'মাণ্টো সাব, ডায়ালগটা আপনি একটু শুনে নিন আগে!'

আমি দেশাইর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'হাঁ কি যেন ডায়ালগটা··· নীলাবেবী···'

দেশাই তার পেশোয়ারী লুঙ্গিটা দুরস্ত করে নিয়ে নীলাদেবীর (ভিরা) দিকে তাকিয়ে বলল, 'নীলাদেবী, আপ কুই পেশোয়ার না কিজিয়ে মায় নে ভি আপ কা পানি পিয়া হায়।'

শুনে ভিরা অট্টহাসি করে উঠল। দেশাই ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কি হয়েছে মিস ভিরা, আপনি অমন করছেন কেন?'

ভিরা আঁচলে মুখ চেপে সেটের বাইরে চলে গেল। দেশাই আরো বেশী আশ্চর্যান্বিত হয়ে স্মারককে বলল, 'কি হলো?'

স্মারক হাত দিয়ে মুখ চেপে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আমি তাকে নিরস্ত করে বললাম, 'নাথিং সিরিয়াস—খাঁসি আগেই (কাশি এসেছে)।' দেশাই হেসে উঠে বলল, 'ও···তাই বলো।'

তারপর ডায়ালগটাকে আবার শান দিতে গিয়ে বলল, নীলাদেবী আপ কুই খাঁছি না কিজিয়ে মায় নে ভি দেবীকা···

অশোক মাথায় হাত চাপড়াতে শুরু করল। দেশাই কাছে এসে বলল, 'কি হয়েছে মিঃ গাঙ্গুলী?'

'না কিছু না মাথা ধরেছে একটু। শটটা নিয়ে নিক।'

'হোক না আমি তো রেডি'

গাঙ্গুলী নিরুত্তাপ স্বরে বলল, 'ক্যামেরা রেডি—রেডি মিঃ জগতাপ।'

জগতাপ ভেপু বাজিয়ে বলল, 'রেডি'। গাঙ্গুলী আরো বেশী মরা গলায় বলল, 'স্টার্ট' সিন থারটিফোর, টেক এলোন।'

দেশাই রাইফেল সামলে নিয়ে বলল, 'নালী পানি, আপ কুই দেবী না কিজিয়ে। মায় নে ভি পেশোয়ার কা……'

অশোক প্রায় গাগলের মত হয়ে চীৎকার করে উঠল, 'কাট কাট,'

দেশাই রাইফেল মাটিতে রেখে দৌড়ে অশোকের কাছে এসে বলল, 'এ্যান মিসটেক মিঃ গাঙ্গুলী?'

অশোক পারেতো খুন করে ফেলে এমন একটা দৃষ্টি দিয়ে নিষ্পেষিত করে ফেলছিল দেশাইকে। হঠাৎই ভাবটা সামলে নিয়ে কৃত্রিম প্রসন্ন হয়ে বলল 'না' কিছুই না। খুব ভাল হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল 'মাণ্টো, একটু বাইরে চলো। মাথাটা বড্ড ধরেছে।'

সেটের বাইরে এসে অশোক প্রায় কেঁদে ফেলল।

'বল মাণ্টো, এখন কি করি? পেশোয়ারের পানি ওর মুখে উঠতেই চায় না। চল, এক কাজ করি, লাঞ্চের জন্যে ব্রেক করে দি। দুপুর পর্যন্ত সারাটা দিন আজ বেকার গেল।'

অশোক প্রস্তাবটা সময় মতই করেছে। এ সময় লাঞ্চের ব্রেক করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না। এখন হাজার চেষ্টা করলেও দেশাই-র মুখ থেকে সঠিক সংলাপ বের হবে না। এটা বরাবরের অভিজ্ঞতা, যে-কোন সংলাপই যদি একবার দেশাইর মুখে আটকে পড়ে সেটাকে সঠিকভাবে বের করে আনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সত্যি বলতে কি, তার স্মরণশক্তিটাই একেবারে ভোতা। একেবারে ছোট্ট সংলাপটুকুও সে কোনদিন মুখস্থ করে রাখতে পারে না। দেশাইর মুখ থেকে প্রথমবারেই যদি কোন সংলাপ সঠিকভাবে শুনে থাকে কেউ, সেটাকে নেহাত ব্যতিক্রম বলতে

হবে। পর্যায়ক্রমে ভুল সংলাপ আওড়ানোর পরও দেশাই বুঝতে পারে না তার সংলাপ নিয়ে পরিচালকদের কি পরিমাণ তিতিক্ষা যাচ্ছে।

সংলাপের হাত পা ভেঙে একেবারে বিকলাঙ্গ করেও সে টের পায় না সে কি করছে। তার পরও সে দর্শকদের মুখের দিকে এমন করে তাকায় যেন তার সংলাপটা আসলে 'আহা' মরি' গোছের হয়েছে। এ সময় তার অভিব্যক্তি অনেকের হাসির খোরাক জোগায়। আবার কোন কোন সময় পরিচালক কেন, আজে বাজে দর্শকদেরও ইচ্ছে হয়, ইট মেরে তার মস্তকটা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।

আমি ফিলমিস্তানে বছর তিনেক ছিলাম। এ সময় দেশাই মোট চারখানা ছবিতে কাজ করেছিল। কোন সময়ই একেবারে বিসমিল্লাতেই সে সঠিক সংলাপ বলতে পেরেছে বলে আমার স্মরণ নেই। জীবনে সে কত লাখ ফুট ফিল্ম নষ্ট করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

অশোকের মুখে শুনেছি, দেশাইর রিটেক-এর সর্বোচ্চ রেকর্ড হল চুয়াত্তর। অর্থাৎ বোম্বে টকিজের সে-ই একমাত্র কুশলী, যে একটা সংলাপকে চুয়াত্তর বার ভুল বলেছে। এই চুয়াত্তর বারের সময় সে যে পরিচালককে কাঁদিয়েছে তিনি হলেন জার্মান পরিচালক ফ্রান্স ওয়াস্টন। তার মতো ধৈর্যশীল পরিচালক বোম্বে চিত্রজগতে অন্য কেউ ছিল বলে আমার বিশ্বাস হয় না। তিনি দেশাইকে বলেছিলেন, 'তোমাকে লোকেরা পছন্দ করে বলেই আমাদের এত বিপদ। নইলে কবেই তোমার টিকি ধরে বের করে দিতাম।'

ওয়াস্টনের এ স্পষ্ট ভাষণের কারণেই রিটেক-এর রেকর্ড চুয়াত্তর পর্যন্ত উঠেছিল। একথা শুনে দেশাই বিগড়ে গিয়েছিল। অতঃপর দেশাইকে শান্ত করে পিঠে হাত বুলিয়ে সঠিক সংলাপ আদায় করে নিতে স্টুডিওর সকল কলাকুশলীকে তেল মালিশ করতে হয়েছে। আগেই বলেছি, দেশাই একবার বিগড়ে গেলে তাকে শান্ত করার মত কোন ঔষধ ছিল না। তখন ভরসা থাকত একমাত্র আল্লাহর উপর।

একটু আগে ভাগেই কি কারণে লাঞ্চের ব্রেক করে দেয়া হয়েছে, দেশাই না জানলেও কলাকুশলী সবাই জানত। এ নিয়ে কেউ আর কানাঘুষা করল না। কারণ, দেশাই যতটুকু নর্মাল আছে সেটুক পরিস্থিতিও আর থাকবে না

অশোক গালগল্পে মন দিল। দেশাইও তার স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় নানা হাসি ঠাট্টার কথা বলছিল। তাতে হাসির কিছু না থাকলেও সবাই তা শুনে হাসছিল। এভাবে লাঞ্চের বিরতি শেষ হল। সবাই গা ঝাড়া দিল। আবার স্যুটিং শুরু হল। অশোক বলল, 'দেশাই বাবু, আপনি ঠিক আছেন তো? আপনার ডায়ালগটা মনে আছে তো?'

দেশাই নিশ্চিত কণ্ঠে বল্লল, 'আলবত।'

লাইটস্‌, অন হল। থারটি ফোর সিনে শুরু হল। দেশাই রাইফেলটা সামলে নিয়ে আবার দাঁড়িয়ে গেল।

'নীলা দেবী- -আপ- - -আপ- - -একেবারে জবান আঁটকে গেল, 'আই এম স্যরি।'

অশোকের মুখে আবার বিরক্তির রেখা দেখা দিল। কিন্তু সামলে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, বলুন, বলতে থাকুন।'

'সিন থারটি ফোর, টেক থারটিন।' আবার শুরু হল। কিন্তু দেশাই পেশোয়ার থেকে পেশাবকে আলাদা করতে পারলো না। এরপর আরো কবার চেষ্টা করার পরও যখন সঠিক সংলাপ বের হল না, আমি অশোককে আড়ালে ডেকে নিয়ে পরামর্শ দিয়ে বললাম, "দাদামণি, এক কাজ কর। দেশাই যখন সংলাপ করবে এবং 'পেশোয়ার কা পেশাব' এর জায়গায় আসবে ঠিক এসময়টাতে যেন ক্যামেরার দিকে মুখ না রেখে বলে।'

অশোক আমার কথা বুঝে নিল। কারণ পেশাব থেকে নিস্কৃতি পাবার একমাত্র এ-ই পথ রয়েছে। পরে এ অংশ স্বচ্ছন্দে 'ডাব' করে নেয়া যাবে। বলার সময় ক্যামেরার দিকে মুখ রাখলে ডাব করার সময় উচ্চারণ এবং ঠোঁট সঞ্চালনে বৈসাদৃশ দেখা দিতে পারি।

দেশাইকে ব্যাপারটা যখন বুঝিয়ে বলা হল, দেশাই শক্ত হয়ে আমাদেরকে জানাল যে, এবারে সে মোটেই ভুল করবে না। কিন্তু পেশোয়ারের পানি যে, ততক্ষণে মাথার উপর উঠে গেছে। দেশাইকে বলা হল 'শুদ্ধ বলার চেষ্টা করার দরকার নেই। মুখে যা আসে সে যেন তা-ই বলে দেয়।'

এবার দেশাই একটু ক্ষুব্ধ হল। আমাকে ডেকে বলল, 'ঠিক আছে মাণ্টো, বলার সময় আমি মুখ ঘুরিয়ে নোব। কিন্তু তুমি দেখে নিও আমি ডায়ালগ যদি ঠিকমত না বলছি, আর কীই বললাম।'

'সিন থারটি ফোর, টেক ফোরটিন—'

হুকুম এল। দেশাই আবার রাইফেলটা তুলে নিলো, ভিরাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'নীলা দেবী আপ কোই ফিকিয় না কিজিয়ে' বলেই মুখ ঘুরিয়ে নিরে বলল, 'ম্যায় নে ভি পেশোয়ার কা পেশাব পিয়া হায়।'

সিন কাট হল। দেশাই বিজয়ীর ভঙ্গিতে রাইফেলটা সাপটে ধরে অশোককে বলল, 'কেমন হয়েছে গাঙ্গুলী?'

অশোক এবারে বজ্র কঠিন। ভ্রূকুচকে বলল 'হাঁ, হাঁ, ঢের হয়েছে?'

তারপর ক্যামেরাম্যান হরদ্বীপকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'চলো, নেকষ্ট শট।'

হানিফ আজাদ ও জিন্নাহ্ সাহেব

এটা সাঁইত্রিশ সালের ঘটনা। মুসলিম লীগ দলের বেশ তোড়জোড় চলছে তখন। আমি নিজেও তখন যৌবনের প্রান্তসীমায়। এ বয়সে সবসময়ই যা কিছু একটা করতে চাইতো মন। গায়ে জোর ছিল, স্বাস্থ্য ভাল ছিল। মনের মধ্যে সবসময়ই একটা অদম্য ইচ্ছে তোলপাড় করতো। আগামীতে যে-কোন একটা কাজে লেগে যাব। যদি কোন কাজ না পাই তাহলে কাজ তৈরী করে নোব এবং সে কাজকে উপলক্ষ্য করেই চলতে থাকব সামনের দিকে। যৌবনের এ বয়সটা এমনই একটা সময় যখন একটা কিছু করতে মন চায়। কিছু একটা করা মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম, কোন একটা মহৎ কাজ করা। কেন মহৎ কাজ সম্পন্ন না হোক, তাতে ক্ষতি নেই, সে নামে একটা অনাসৃষ্টিই হোকনা ক্ষতি কি, তবু একটা কিছু হোক।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার অবতারণা করে আমি সেই পুরনো দিনগুলোতে ফিরে যেতে চাই যখন মির্জা গালিব যুবক ছিলেন। জানিনা তিনি যৌবনে কোন রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সাথে জড়িত ছিলেন কিনা। কিন্তু এই অধম মুসলিম লীগের একজন নগণ্য খাদেম ছিল। গাজী আবাদে আমার মত এ ধরনের বেশ ক'জন যুবকের একটা দল ছিল। এই দলের আমি অন্যতম সদস্য ছিলাম। নিজের আত্মপ্রচারণা এজন্য এভাবে শুরু করছি যে, সে সময় এটা ছাড়া আমাদের করণীয় কিছু ছিল না, এটাই ছিল ধ্যান জ্ঞান।

এটা তখনকার কথা যখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দিল্লী আসেন এবং মুসলমানরা তাকে নিয়ে বিরাট মিছিল বের করে। স্বভাবতই এই মিছিলকে সাফল্যমণ্ডিত করার পেছনে গাজী-আবাদের যুবকদেরও

অবদান কম ছিল না। আমাদের দলের নেতা ছিলেন আনোয়ার কোরাইশী। বেশ সুদর্শন যুবক, বর্তমানে যিনি 'শায়েরে পাকিস্তান নামে বেশী খ্যাত। আমাদের যুবকদের কণ্ঠে যে গান শোনা যেত তা ছিল তাঁরই রচিত জাতীয় সঙ্গীতের পংক্তিমালা। সুর তাল রক্ষা করে আমরা গাইতাম কিনা তা খেয়াল নেই, তবে এতটুকু মনে আছে, সুর তালের নিয়ন্ত্রণে কারো কণ্ঠই ছিল না, কোনরকমে গানটি গেয়ে ফেলতে পারলেই আমরা উদ্ধার ভাবতাম।

সেই ঐতিহাসিক মিছিল দিল্লীর ঐতিহাসিক জামে মসজিদ থেকে শুরু হয়েছিল। মুখরোচক শ্লোগান তুলে চাঁদনীচক, লালকুয়া, হাওজ কাজী এবং চাদরী বাজার ইত্যাদি হয়ে মুসলিম লীগের অফিসে এসে শেষ হয়। এই মিছিলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মোহম্মদ আলী জিন্নাহকে 'কায়দে আজম খেতাবে ভূষিত করা হয়। ছ' ঘোড়া বিশিষ্ট একটি শকটে তাকে বসান হয়েছিল, এই মিছিলে মুসলিম লীগের গণ্যমান্য সকল ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মোটর, মোটর সাইকেল, বাই সাইকেল এবং উট সুশোভিত এই মিছিল সত্যি দেখার মত সুশৃঙ্খল হয়েছিল। শৃঙ্খলাপ্রিয় কায়দে আজমের ঠিক মনেরই যেন প্রতিফলন ছিল এই মিছিলটি।

আমি মিছিল চলাকালে একাধিকবার তাকে দেখেছিলাম। তাকে দেখে আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তা মনে নেই। তবে এখন ভাবি এবং একটা নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আন্তরিকতার কোন অতিরঞ্জন নেই, ভাবাবেগটাই প্রধান সেখানে। সে সময় কেউ যদি আমাকে যে-কোন একজনকে দেখিয়ে বলত যে, ইনি হচ্ছেন 'কায়েদে আজম' তখন তাঁর প্রতিই আমার ভক্তি এবং শ্রদ্ধা উথলে উঠতো। কিন্তু মিছিলের মাঝে আমি যখন তাঁকে বার কয়েক দেখলাম, অলখ্যে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, ছি, কায়েদে আজম তাহলে এত দুর্বল এবং শীর্ণকায়?

গালিব বলেছিলেনঃ

ওহ্ আয়েঁ ঘরমে হামারে
খোদা কি কুদরত হ্যাঁয়,

কভি হাম উনকো.

কভি আপনে ঘরকো দেখতে হ্যাঁয়।

তিনি আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। এটা তাঁর মেহেরবানী এবং আল্লার অনুগ্রহ ছিল। খোদার কসম, আমি যখনই তাঁকে দেখতাম, তাঁর কৃশ এবং দুর্বল দেহের প্রতি আমায় দৃষ্টি আকৃষ্ট হতো। একবার তাঁর দিকে তাকাতাম আর একবার নিজের নাদুস-নুদুস দেহটার দিকে। ভাবতাম, আমার দেহটা যদি তাঁর হয়ে যেতো। কিন্তু এ সবই মনে মনে ভাবতাম, অবশ্য তাঁর এই কৃশ দেহটা যেন নিরাপদে এবং বেঁচে-বর্তে থাকে সেজন্য দোয়াও করতাম। তখন শত্রুদের প্রতি তাঁর আঘাত নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলতো দেদার।

পরিস্থিতি নিরন্তর বদলাতে থাকে। জানিনা পরিবর্তনের অপর নামই পরিস্থিতি কিনা। যা হোক, পরিস্থিতি এমন হলো, মগজের মধ্যে যে শিল্প-সাহিত্যের পোকা ঢুকেছিল, তা কিলবিল করে উঠতে লাগল। মেজাজটা উড়ু উড়ু হয়ে উঠলো, কোনমতে বোম্বেতে যেয়ে ভাগ্য পরীক্ষায় নেমে পড়ব, এই ছিল একান্ত মনোবাসনা। ছোটবেলা থেকে নাটকের দিকে বেজায় ঝোঁক ছিল। ভাবলাম, সেখানে গিয়ে এ লাইনেও নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করা যাবে। দেখুন, কোথায় দেশসেবা আর কোথায় সাহিত্য, অভিনয় ও নাটকের চর্চা—সত্যি, মানুষও এক আজব ধরনের পরস্পরবিরোধী সত্তা।

বোম্বে পৌঁছলাম। সেকালে ইম্পেরিয়াল ফিল্ম কোম্পানীর সর্বশীর্ষে। এখানে কোনরকম সুযোগ পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তবু কোনমতে এখানে একটু সুযোগ করে নিলাম। দৈনিক আট আনা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে একস্ট্রা হিসাবে কাজ করতে লাগলাম। স্বপ্ন দেখতাম, এমন একদিন হয়ত সামনে রয়েছে, যেদিন একজন প্রখ্যাত চিত্র-তারকার গৌরব আমি অর্জন করব।

খোদার অনুগ্রহে কথা বলার শক্তি ছিল খুব। কথা শুনতে সুমধুর না হলেও তেমন অশ্রাব্য ছিল না, মাতৃভাষা ছিল উর্দু। ইম্পেরিয়াল কোম্পানীর প্রায় সকল তারকারাই উর্দুর ব্যাপারে ছিল আনাড়ী। ফলে, দিল্লীর বদলে বোম্বেতেই তারা আমার সহযোগিতা গ্রহণ করল। প্রায়

সকল তারকারাই আমাকে দিয়ে উর্দুতে তাদের রাশিফল লিখিয়ে নিল এবং আমাকেই আবার তা পড়ে শোনাতে হলো। উর্দুতে কোন চিঠিপত্র এলেও আমার ডাক পড়তো। পড়ে শোনাতে হতো, অর্থ বলতে হতো এবং পত্রের উত্তরও লিখে দিতে হতো। কিন্তু এসব চিঠি পড়ে আর মুন্সীগিরি করে তেমন কোন সুবিধা হলো না, একস্ট্রা ছিলাম একস্ট্রাই রয়ে গেলাম।

এ সময় ইম্পেরিয়াল ফিল্ম কোম্পানীর মালিক শেঠ আর্দেশীর ইরানীর বিশেষ ড্রাইভার বুধনের সাথে আমার বন্ধুত্ব হলো। বন্ধুত্বের বিনিময়ে সে আমাকে অবসর সময়ে গাড়ী ড্রাইভিং-এর কাজ শিখিয়ে দিলো। ড্রাইভিং শিখার সময়টা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। বুধনের সবসময় ভয়ে বুক দুরু দুরু করতো, পাছে না আবার শেঠ এই ব্যাপারটা টের পেয়ে যায়। এজন্যে অত্যন্ত মনোযোগ থাকা সত্ত্বেও আমি পুরোপুরি এই বিদ্যাটা আয়ত্ত করতে পারলাম না। আয়ত্ব করা তো দূরের কথা, শুধু সোজা সড়কে লোকজন যখন থাকে না তখন শেঠের বুইকটা চালাতে বেশ পারি। তাছাড়া অন্য কোন কারিগরি জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারিনি।

অভিনয় করার নেশাটা একেবারে জেঁকে বসেছিল। এটা ছিল মগজে, আর মনের গভীরে ছিল মুসলিম লীগ এবং তার কর্ণধার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। ইম্পেরিয়াল ফিল্ম কোম্পানীতে, ব্রিজ কেনেডীতে, ডাণ্ডি বাজারে, মোহাম্মদ আলী রোডে এবং প্লে হাউসে প্রায়শই মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠদের সাথে কংগ্রেসপন্থীদের ব্যবহার সম্পর্কে আলাপ-সালাপ হতো। ইম্পেরিয়ালে সবাই জানতো যে, আমি মুসলিম লীগ করি এবং কায়েদে আজমের অন্ধ ভক্ত। কিন্তু সে সময়টা ছিল অন্যরকম। তখন কোন হিন্দু কারো মুখে কায়েদে আজমের নাম শুনে তেড়ে উঠে তাকে মারতে আসতো না। পাকিস্তানের দাবি তখনো পুরোপুরি সাধারন্যে প্রকাশ পায়নি। আমার মুখে যখন তারা কায়েদে আজমের প্রশংসা শুনতো, মনে করতো লোকটি বেশ নামকরা চিত্রতারকা এবং আমি তার গোঁড়া ভক্ত।

একদিন আমরা বসে বসে গল্প করছিলাম, এমন সময় সেকালের সেরা নায়ক ডি, বালিমুরিয়া এক কপি 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,—'এই নাও তোমার জিন্নাহ সাহেব।

আমি ভেবেছিলাম জিন্নাহ সাহেবের কোন ছবি ছাপা হয়েছে। উল্টে-পাল্টে কোন ছবি না দেখে বললাম, 'কই, জিন্নাহ সাহেবের ছবি কোথায়?'

বালিমুরিয়া তার পাতলা গোঁফ নেড়ে মুচকি হেসে বলল, 'ছবি নয়, তার বিজ্ঞাপন।'

—'বিজ্ঞাপন? কিসের বিজ্ঞাপন?'

বালিমুরিয়া হাতদিয়ে একটা কলম দেখিয়ে বলল, 'এই দেখো, জিন্নাহ্ সাহেবের একজন মোটর টেকনিক চাই। তাঁর গ্যারেজের সব কাজ যেন সামলাতে পারে।'

চট করে আমি খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে চোখ ছানাবড়া করে কায়দে আজমের বিজ্ঞাপনটা দেখলাম। 'আচ্ছা এই ব্যাপার তাতো জানিনা।'

এমন একটা ভাব দেখলাম যে, এক নিমেষে সবটা পড়ে ফেলেছি। আসলে বালিমুরিয়া যেমন উর্দু জানতো আমার ইংরেজী জানার দৌড়ও ঠিক তদ্রূপ ছিল।

আমার গাড়ী ড্রাইভ করার অভিজ্ঞতা কতটুকু ছিল তাতো আগেই বলেছি। তার উপর মেকানিজম তো আদৌ জানতাম না। সেলফ্ চাপ দিলে কেবল স্টার্ট হয়, কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে তাহলে আমি বলব, এটাতো মোটর গাড়ীর স্বভাব। যদি বলে অনেক সময় সেল্ফ্ চাপলেও তো স্টার্ট হয় না তখন বলব, এটাও গাড়ীর স্বভাব।

এতদসত্বেও কি ঝোঁকে আমি জিন্নাহ্ সাহেবের ঠিকানাটা টুকে নিলাম। আসলে আমার চাকরি-বাকরির কোন মতলব ছিল না। শুধু কায়দে আজমকে স্বচক্ষে নিকট থেকে দেখার জন্যেই মাউণ্ট প্লেজেণ্ট রোড রওনা হয়ে গেলাম। মালাবার হিলে তাঁর সুদৃশ্য ভবন! বাইরে পাঠান দারোয়ান পাহারায় ছিল।

কয়েক থানের তৈরী সালোয়ার এবং মাথায় রেশমী কাপড়ের পাগড়ীতে তাঁকে বেশ দেখাচ্ছিল।

আগে ভাগে আরো কজন প্রার্থী এসে জমা হয়েছে ততক্ষণে। তাদের কাছে গাদা গাদা ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং নানা প্রশংসাপত্র রয়েছে। কিন্তু আমার কাছে কিছুই ছিল না। বুক দুরু দুরু করছিল। এমন সময় হঠাৎ কায়েদে আজমের আবির্ভাব হলে সবাই দাঁড়িয়ে গেল। আমিও এক

পাশে গুটিশুটি মেরে রইলাম। সাথে তাঁর বোনও এসেছেন। তিনিও ভাইয়ের মতনই হালকা পাতলা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমি তাঁর অনেক ছবি দেখেছি।

জিন্নাহ্ সাহেব তাঁর এক চোখে মনোকল লাগিয়ে এক এক করে সবাইকে দেখে চললেন। দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার কাছে এসে কড়া স্বরে বললেন,

—'ইউ !'

আমি থতমত খেয়ে চারদিকে তাকালাম। ভাবলাম, আমার পাশের জনকে নির্দেশ করছেন। আমি কনুই দিয়ে তাকে গুঁতো দিলাম। সে সরাসরি কায়েদের আজমকে জিজ্ঞেস করল, "স্যার আমি ?'

কায়েদের আজম আমার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বললেন,

"নো, টুমি।"

"আমি ?"

"ইয়েস।'

আমি একটা তেতো ঢোক গিললাম। মনে হলো গোটা চারেক কুইনিন টেবলেন আমার গলা দিয়ে একসাথে পার হয়ে গেল। তারপর চোখ থেকে মনোকল নামিয়ে বললেন 'অল রাইট'। চকিতে সুদর্শন সেক্রেটারীকে ডেকে কানে কানে কি যেন বললেন, তারপর বোনের সাথে অন্দরে চলে গেলেন।

আমি চলে যাচ্ছিলাম এমন সময় সেক্রেটারী মতলুব সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, "সাহেব কালকে সকাল দশটায় তোমাকে হাজির হতে বলেছেন।"

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না আমাকে অযথা কেন ডাকা হচ্ছে এ চাকরির জন্যে, আমি তো মোটেই উপযুক্ত নই।

পরদিন সকাল দশটায় হাজির হলাম। সেক্রেটারী জানালেন, সাহেব আমাকে পছন্দ করেছেন। আমি যেন ঝট পট গ্যারেজের দায়িত্বটা নিয়ে নেই।

আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, আমি ঠাট্টা করেই ইণ্টারভিউতে এসেছিলাম। কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না।

আমাকে গ্যারেজের প্রধান বানিয়ে সব চাবি বুঝিয়ে দেয়া হল। গ্যারেজের বিভিন্ন মডেলের চারটি গাড়ী ছিল। আমি শুধু শেঠ ইরানীর বুইকটা যা একটু চালাতে পারতাম। তাও বরাবর সোজা রাস্তায়। মালাবার হিল অবধি রাস্তায় বেশ কটি বাঁকই পড়ে। এই বিপদসংকুল রাস্তা দিয়ে এমন একজনকে ড্রাইভ করে নিয়ে যেতে হবে যার সাথে অসংখ্য মুসলমানের ভাগ্য জড়িত।

আমি একবার ভাবলাম, সব কিছু রেখে সোজা টিকেট কেটে দিল্লী চলে যাই! আবার ভাবলাম, বরং জিন্নাহ্ সাহেবকে আসল ব্যাপারটা বলে ক্ষমাটা চেয়ে কেটে পড়ি। কিন্তু মান্টো ভাই, বিশ্বেস করুন সারা মাসেও আমি সে সুযোগ পেলাম না।

“কেন পেলে না?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হানিফ আজাদ বলল, আগে সব কিছু শুনেই নিন না।

পরদিন আমার উপর গাড়ী বের করার হুকুম হলো। ভাবলাম, সাহেব যখনই আমার সামনে আসবেন চাবির গোছাটা তাঁর হাতে দিয়ে পা ধরে বসে পড়ব। কিন্তু তা পারলাম না। তাঁর সাথে আবার ফাতেমা জিন্নাহ্ সব সময় ছায়ার মতন থাকেন। মেয়েদের সামনে কারো পা ধরা মান্টো ভাই বলুনতো খুব লজ্জার কথা না?

আমি বললাম, “তারপর কি হলো?”

আজাদ বলল, তারপর গাড়ী স্টার্ট করতেই হলো। নতুন পেকাড গাড়ী। খোদা ভরসা করে রওনা দিলাম। মালাবার হিলের নিচে যেখানে লালবাতি চেনেন তো?

“হ্যাঁ।”

সেখানে এসে বেসামাল হয়ে পড়লাম। ওস্তাদ বোধন বলেছিল, বেলাইনে পড়লেই ব্রেক কষবে। খুব জোরসে ব্রেক কষলাম। কায়েদে আজমের হাতের সিগারেট পড়ে গেল। মিস জিন্নাহ্ সিট থেকে দুহাত লাফিয়ে উঠলেন। আমাকে গালি গালাজ করলেন। কায়েদে আজম সিগারেট তুলে ইংরেজীতে কি যেন বললেন। ভাবে বুঝলাম, ফিরে যাবার কথা বলছেন। বাড়ী ফিরে নতুন গাড়ী এবং নতুন ড্রাইভার তলব করলেন। তারপর যেখানে যাবার সেখানে চলে গেলেন।

'হানিফ আজাদ'

এঘটনার পর ছ মাস পর্যন্ত আমার ডাক পড়েনি।

মতলুব সাহেব প্রায় বিকেলে জানিয়ে দিতেন কবে কোন গাড়ীর জন্যে কাকে মোতায়েন থাকতে হবে। কিন্তু আমি যখন মাঝে মাঝে নিজের কথা পাড়তাম, তিনি এড়িয়ে যেতেন। পরে জানলাম, আমার জন্যে সাহেবের পক্ষ থেকে কোন আদেশ থাকত না। আর গায়ে পড়ে সাহেবকে কোন কথা জিজ্ঞেস করাও যেত না। সেটা মস্তবড় অপরাধ হতো। আমি বুঝতে পারলাম না গ্যারেজের প্রধান বানানো সত্ত্বেও কি কারণে আমাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

"হয়ত কায়েদে আজম তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন।" আমি বললাম।

'কায়দে আজমের ভুল? অসম্ভব। তিনি ভুলেও কোন সময় ভুল করতেন না। তাঁর বিলক্ষণ জানা ছিল, আমি ছ'মাস ধরে তাঁর গ্যারেজে বসে বসে অন্নধ্বংস করছি।'

চকিতে আমি ৩৭-৩৮ বছরের শক্ত সুঠাম স্বাস্থ্যবান পুরুষ আজাদের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, সত্যিতো এমন লোক যদি ছ'মাস বসে বসে খায় তা হলে তো রাজার গোলাও যে মানবে না। হ্যাঁ, আপনাদের পরিচিত চরিত্রাভিনেতা আজাদের কথা বলছি। বিভাগোত্তর কালে সে বোম্বে চিত্রজগতের সাথে জড়িত ছিল। বর্তমানে লাহোর চিত্রজগতে এসে জমিয়ে বসেছে।

প্রথমদিকে এক বন্ধু আজাদকে দেখিয়ে বলেছিল এ গাট্টা গোট্টা কালোমত জোয়ান লোকটাকে দেখছ তো, এককালে কায়দে আজমের গাড়ী চালাত।

কায়দে আজমের গাড়ী চালাত? আমি একটু বিস্মিত হই এবং তার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হয়ে পড়ি। তারপর কিভাবে আমাদের খাতির জমে সেকথা আর মনে নেই। এর পর যখনই তার সাথে আমার দেখা হতো আমি কায়দে আজমের কথাই বেশী বেশী জিজ্ঞেস করতাম তাকে।

কথায় কথায় আমি একদিন কায়েদে আজমের চরিত্রের এক বিশেষ দিক সম্পর্কে জানতে পাই। সব ব্যাপারেই তিনি নাকি হালকা পাতলা

জিনিস পসন্দ করতেন না। মোটা পরিপুষ্ট এবং শক্তসামর্থ্য বস্তু তাঁর বড় প্রিয় ছিল। কবি ইকবাল যেমন লম্বা চওড়া জিনিস পছন্দ করতেন এটাও অনেকটা তদ্রূপ। এ কারণেই চাকর নোকর, ড্রাইভার 'আর্দালী' যাকেই তিনি নিয়োগ করতেন, সুদর্শন এবং স্বাস্থ্যবান নিয়োগ করতেন।

কায়েদে আজমের সেক্রেটারী মতলুব সাহেব অপরূপ সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান লোক ছিলেন। পাঠান দারোয়ানের প্রতি হুকুম ছিল সে যেন সব সময় তার জাতীয় পোশাক পরিধান করে থাকে। আজাদ যদিও পাঞ্জাবী ছিল না তবু তার প্রতি পাগড়ী পরবার হুকুম ছিল। আজাদ পাগড়ী পরে কায়েদে আজমের সামনে এলে কোন কোন সময় তাকে এনাম দেয়া হতো।

কায়েদে আজমের খাবার পরিমাণ এত কম ছিলো যে, তা দেখে লোক বিস্মিত না হয়ে পারত না। আমরা আশ্চর্য হতাম যে, এত কম খেয়ে লোকটি বেঁচে আছে কি করে? রোজ ৪-৫টা মুরগী জবাই হতো। কিন্তু কায়েদে আজমের জন্যে নেহাত ছোট এক টুকরা মাংস পরিবেশন করা হত। রোজ বাজার থেকে অনেক ফলমূল আসত। কিন্তু তার সবি ড্রাইভাররা খেয়ে ফেলত।

কায়দে আজমের রোজকার অভ্যাস ছিল তিনি রোজ রাতের খাবার শেষে আমাকে তলব করতেন এবং খাবার তালিকা দেখে দুএকটায় দাগ দিয়ে দিতেন। তারপর একশ টাকার একখানা নোট আমার দিকে এগিয়ে দিতেন। আমি বুঝে নিতাম এ টাকা পরদিনের বাজার খরচ।

'একশ টাকাই?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'হ্যাঁ, পুরো একশ টাকাই। রোজ একশ টাকা বাজার খরচ দিতেন অথচ কায়েদে আজম কোনদিন হিসাব চাইতেন না। বাজার করে যে টাকা বাঁচত আমরা সবাই ভাগাভাগি করে নিতাম। প্রায় দিন ত্রিশ চল্লিশ এমনকি ৭০ টাকা পর্যন্ত বেঁচে যেত। কিন্তু এ ব্যাপারে, তিনি কোন দিনই মাথা ঘামাতেন না। অবশ্য মিস জিন্নাহ, সময় সময় আমাদের উপর বেশ চটে যেতেন, বলতেন আমরা সবাই চোর। এক আনার জিনিসকে একটাকা বলি। প্রায়শই কায়েদে আজম এমন মুহুর্তগুলোতে এসে বলতেন 'ইট অলরাইট, ইট ইজ অলরাইট।"

একবার কিন্তু কায়েদে আজমের 'অলরাইটে' কাজ হলোনা। মিস জিন্নাহ্ দুজন বাবুর্চিকে বের করে দিলেন। কায়েদে আজমের জন্যে সব সময় দুজন বাবুর্চি থাকত। একজন ইংলিশ খানা পাকাত, অপর জন দেশী। দেশী খানা পাকাবার জন্যে যাকে রাখা হয়েছিল সে প্রায় পুরো মাস বসেই থাকত।

বাবুর্চিদেরকে বিদায় করে দেবার পর কায়েদে আজম দিন কয়েক তাজ হোটেলে গিয়ে খেলেন। এসময় আমরা বেশ মজা করতাম। রোজ নতুন বাবুর্চির তালাশে গাড়ী নিয়ে বের হয়ে পড়তাম। ফিরে এসে বলতাম বাবুর্চি পাওয়া যায় না। অবশেষে নিরুপায় হয়ে পুরনো বাবুর্চিদেরকেই আবার ডেকে পাঠানো হলো।

কায়েদে আজম নিজে কম খেলেও অপরকে বেশী খাইয়ে খুশী হতেন। এজন্যে তিনি রোজ শ'টাকার নোট দিয়ে হিসাব চাইতেন না।

কায়েদে আজম একদিন সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে বের হলেন। আমি তার পেকার্ড গাড়ী আস্তে আস্তে চালাচ্ছিলাম। আবহাওয়া বেশ চমৎকার ছিল। ভাবে বুঝলাম কায়েদে আজমের মেজাজ খুব ভাল। আমি সুযোগ বুঝে ঈদের বখশিশের কথা পাড়লাম। কায়েদে আজম হেসে উঠে বললেন, 'তুমি দেখছি, একেবারে পাকাপোক্ত মুসলমান হয়ে গেছ। মাঝে মধ্যে একটু হিন্দুও হও।'

এর চারদিন আগে কায়েদে আজম আমাকে মুসলমান বানিয়ে দিলেন অর্থাৎ এনাম হিসাবে ২০০ টাকা দিয়েছিলেন। তাই মাঝে মধ্যে একটু হিন্দু হবারও উপদেশ দিলেন।

আজাদের এসব কথা শুনে আমি ভাবলাম, আজাদের উপর এসব কথার কোন প্রভাব পড়েনি।

কায়েদে আজম সম্পর্কে একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, তাঁর ঘরোয়া জীবন অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন কিন্তু আমি যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সাথে পারিবারিক জীবন অবিচ্ছেদ্য ছিল। পারিবারিক জীবনের আলাদা কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না তাঁর। স্ত্রী ছিল, অনেক আগেই তাঁর সাথে বিচ্ছেদ হয়েছে। এক মেয়ে ছিল সে কায়েদে আজমের মতের বিরুদ্ধে এক পারসিক যুবককে বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। এ বিয়েতে

কায়েদে আজম যারপর নাই মর্মাহত হয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন যেমনিই হোক এক মুসলমান যুবকের সাথে তার বিয়ে হোক। ওদিকে মেয়ে বলে বেড়াতে লাগল যে, পিতাজী যখন এক বিধর্মী মেয়েকে জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছেন আমি কেন পারব না ?

বলা বাহুল্য, ওটা হয়ত অনেকেই জানেন না যে, কায়েদে আজম বোম্বের এক পার্সী সম্প্রদায়ে বিয়ে করেছিলেন। এই বিয়েতে পার্সীরা তাঁর উপর বড় ক্ষ্যাপা ছিল এবং নানাভাবে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় ছিল। অনেকের মতে, পার্সীরাই চক্রান্ত করে তাঁর মেয়েকে তাদের সম্প্রদায়ে গ্রহণ করে কায়েদে আজমের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। আমি এ ব্যাপারে আজাদকে জিজ্ঞেস করায় সে বলল, "অতশত জানিনে ভাই— তবে এতটুকু বলতে পারি ও বিয়েতে কায়েদে আজম যারপর নাই ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। পনের দিন ধরে কারো সাথে মেলা মেশা করেননি। নিজের কামরায় অসংখ্য সিগারেট ফুঁকেছেন এবং এত পায়চারী করেছেন যার পরিমাণ কয়েক মাইল হবে।"

কায়েদে আজমের এটা চিরাচরিত অভ্যাস ছিল, চিন্তা এবং দ্বন্দময় মুহূর্তে তিনি রুমের মধ্যে পায়চারী করে বেড়াতেন। অনেক গভীর রাতেও তাঁর ঘর থেকে পায়চারী করার আওয়াজ শোনা যেত। এক বিশেষ ছন্দোবদ্ধ তালে তাঁর জুতা ঠক ঠক করত। তাঁর জুতার আওয়াজ শুনেই বুঝা যেত তাঁর মানসিক অবস্থা কেমন।

অনবরত পনের দিন এই অন্তর্দ্বন্দ্বের পর কায়েদে আজম অনেকটা সুস্থ স্বাভাবিক হলেন। পনের দিন পর আমরা যখন তাঁকে দেখলাম, মনে হলো, ব্যথাটা সামলে নিয়েছেন। কিন্তু একেবারে ভুলে গেছেন বলে মনে হল না।

আমি আজাদের কথায় বাধা দিয়ে বললাম,

'একেবারে যে ভুলে যাননি তা তুমি কি করে বুঝলে ?'

আজাদ একটু হেসে বলল, "কি যে বলো মাণ্টো ভাই, ড্রাইভারদের কাছে কারো কথা লুকিয়ে থাকতে পারে ? তিনি এ ঘটনার পর মাঝে মধ্যে আমাদেরকে বড় সিন্দুকটা খুলবার হুকুম করতেন। সিন্দুকটাতে তাঁর স্ত্রীর আর সেই অবাধ্য মেয়ের বহু কাপড়-চোপড় রাখা ছিল।

একেবারে ছোট বয়েসের কাপড় পর্যন্ত ছিল ওতে। সেগুলো যখন বের করা হত, তিনি চোখ বড় বড় করে সেগুলো দেখতেন এবং গভীর বিষণ্ণ হয়ে যেতেন। অতঃপর এক সময় মনোকল নামিয়ে 'ইট ইজ অলরাইট' বলে চোখ মুছতে মুছতে অন্য দিকে চলে যেতেন।

কায়েদে আজমের তিন বোন ছিল। ফাতেমা জিন্নাহ্, রহমত জিন্নাহ্ এবং অন্য আর একজনের নাম আমার জানা ছিল না। তিনি ডুংরি এলাকায় থাকতেন। রহমত জিন্নাহ্ থাকতেন চৌপাটির চিনাই মটর ওয়ার্কস-এর কাছাকাছি। তাঁর স্বামী স্বল্প বেতনে কোন অফিসে কাজ করতেন। সাহেব প্রতি মাসে আমাকে একটা বন্ধ খাম দিয়ে তাদের বাসায় পাঠাতেন। তাতে কারেন্সী নোট থাকত। এ ছাড়া কখনো এক আধবার পার্শেলে কাপড়-চোপড়ও পাঠাতেন। তাছাড়া ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে নিয়ে তিনি রহমত জিন্নাহ্‌র বাসায় মাঝে মধ্যে যেতেনও। এ ছাড়া যে বোনটি ডুংরিতে থাকতেন তিনিও বিবাহিতা ছিলেন। তাঁদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। কারো সাহায্য করতে হতো না।

ভাই বলতে কায়েদে আজমের একটি মাত্র ভাই ছিল। কায়েদে আজম নিয়মিত তার সাহায্য করতেন। কিন্তু কায়েদে আজমের বাড়ীতে আসার অনুমতি ছিল না তার।

আমি কায়েদে আজমের সেই ভাইকে একবার বোম্বেতে এক বারে রম পান করতে দেখেছি। চেহারা সুরত কায়েদে আজমেরই মত। আমি একজনে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন যে, ইনি কায়েদে আজমের ভাই। তাঁর নাম ছিল আহমদ আলী। আমি তাঁকে খুঁটে খুঁটে দেখছিলাম। যখন তাঁর টেবিলে বিল দেয়া হল, তিনি পকেট থেকে এমন গড়িমসি করে পয়সা বের করলেন, মনে হলো পয়সাটা একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই তিনি দিতে যাচ্ছেন। পয়সা দেবার সময় বার বার পয়সার দিকে তাকালেন। তা ছাড়া তাঁর পোশাক-আশাক এবং গতিবিধি দেখে মনে হলো তিনি তৃতীয় শ্রেণীর বারে যেতে অভ্যস্ত। কিন্তু আজকে ভুলবশত এ অভিজাত হোটেলে ঢুকে পড়েছেন।

এরপর বোম্বের এক ভর মজলিশে তাঁকে দেখেছিলাম। কায়েদে আজম ওজস্বী ভাষায় সে মজলিশে বক্তৃতা দিচ্ছেন আর তাঁর ভাই

আহমদ আলী দূরে দাঁড়িয়ে চোখে মনোকল লাগিয়ে ভাইয়ের বক্তৃতা শুনছিলেন।

ইনডোর গেমের মধ্যে কায়েদে আজম শুধু বিলিয়ার্ড পছন্দ করতেন। যখন তাঁর খেলবার ইচ্ছা হতো বিলিয়ার্ডের কামরা খুলবার হুকুম করতেন। বিলিয়ার্ড রুমে শুধু আমারই যাবার অনুমতি ছিল। কারণ এ খেলায় আমারও এক আধটু শখ ছিল। খেলার শুরুতে তাঁর সামনে এক ডজন বল দেয়া হত। তা থেকে তিনি পছন্দ করে একটা তুলে নিতেন। মিস জিন্নাহ্ এক পাশে বসা থাকতেন। বল করার আগে তিনি চারদিক থেকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বল মারার পজিশন দেখে নিতেন। তারপর সিগারেট টানতে টানতে একসময় বল মারতেন। বলটা যদি তাঁর ইচ্ছা মতো গন্তব্যে পৌঁছত, তিনি বিজয়ীর ভঙ্গিতে মিস জিন্নাহ্‌র দিকে তাকাতেন।

বিলিয়ার্ডের বলকে কায়েদে আজম যেমন চারদিক থেকে দেখতেন, রাজনৈতিক চালের বেলায়ও তিনি অনুরূপ ইতস্তত করতেন। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত একটা সমস্যার পুরোপুরি স্বরূপ তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত না হতো, তিনি সে সম্পর্কে কোন মতামত দিতেন না।

কায়েদে আজম যার তার সাথে দেখা করতে চাইতেন না, বাজে কথা শুনতে তাঁর অস্বস্তি লাগত। তাঁর খাস কামরায় মাত্র একটা সোফা থাকত। পাশে ছোট 'টিপয়'-এ ছাই ফেলার এ্যাসট্রে ছিল। সোফার সামনে দুটা শোকেস ছিল। তাতে কোরান শরীফ রাখা থাকত। এ কামরাতে তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্র থাকত। সেক্রেটারী বা যে কেউ এ কামরায় আসত তাকে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হতো। কোন চিঠির জবাব দেবার প্রয়োজন হলে মতলুব হোসেন বা স্টেনোকে ডাকতেন এবং জবাবে কি লিখতে হবে মুখে মুখে বলে দিতেন। বলার সময় প্রত্যেক শব্দ স্পষ্ট এবং জোরে জোরে বলতেন।

কায়েদে আজমের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন মরহুম বাহাদুর ইয়ার জং। একমাত্র বাহাদুরের সাথেই তিনি একান্ত ভাবে প্রাণ খুলে কথা বলতেন। দুজনের মধ্যেকার ভাব দেখলে মনে হতো তাঁরা ঘনিষ্ঠ বাল্য-বন্ধু। বাহাদুর ইয়ার জং ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যেমন

রাজা মাহমুদ আহমাদ, আই আই চুন্দ্রিগড়, মওলানা জাহেদ হোসেন, লিয়াকত আলী খান, নবাব ইসমাইল এবং আলী ইমাম প্রমুখও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁরাও প্রায় দিন কায়েদে আজমের বাড়ীতে আসতেন। কিন্তু বাহাদুর ইয়ারের সাথে তাঁর যে রকম অন্তরঙ্গতা ছিল এমন আর কারও সাথে ছিল না।

লিয়াকত আলী খানের সাথে তাঁর কি রকম সম্পর্ক ছিল একথা জানতে চাইলে আজাদ বলল, লিয়াকত আলী খান কায়েদে আজমের সামনে একজন ভক্ত শিষ্যের মত বিনীত হয়ে কথা বলতেন। প্রথমে এসেই আমার কাছে জিজ্ঞেস করে নিতেন, কায়েদে আজমের মুড সম্পর্কে। মুড খারাপ হলে ফিরে যেতেন। কায়েদে আজম চাকর-বাকরদের প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। কারো দেহের নোংরাপনা যেমন পছন্দ করতেন না, তেমনি মনের নোংরামীকেও দু'চোখে দেখতে পারতেন না। মতলুব হোসেনকে সব দিক দিয়ে তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, সে একজন স্বেচ্ছাসেবী মেয়ের প্রণয়াসক্ত হয়েছে তখনি তাকে বিদায় করে দিলেন।

আমি মাঝে মধ্যে রাত করে বাড়ী ফিরতাম। কায়েদে আজম কিভাবে টের পেয়ে গেলেন। আমাকে ডেকে বললেন, 'তোমার ক্যারেক-টার খারাপ করছ—তোমার এখন বিয়ে হয়ে যাওয়া দরকার।'

এর চার মাস পর কায়েদে আজমই চেষ্টা করে আমায় বিয়ে করিয়ে দিলেন। একমাত্র কায়েদে আজমের সুবাদেই আমি ভাল পরিবারে বিয়ে করতে পেরেছি। আর না হয় আমি জাতে শেখ বংশ ছিলাম।

আমি আজাদকে বললাম, 'তুমি কখনো কায়েদে আজমের মুখে 'আই এ্যাম সরি' শুনতে পেয়েছ?'

আজাদ বলল, 'না, কায়েদে আজমের মুখে এ ধরনের কোন কথা কোন দিন শুনিনি।'

তখন কায়েদে আজম আর ইহজগতে নেই। কিন্তু তাঁর সুযোগ্য ড্রাইভার কায়েদে আজমেরই তৈরী পাকিস্তানে বুক ভরা কায়েদে আজমের স্মৃতি নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতো। পাঞ্জাব আর্ট পিকচার্স-এর দ্বারে পানের দোকানের টুলে বসে বসে সে কায়েদে আজমের কথা ভাবত।

আমি তাকে কায়েদে আজমের জীবনের নানা [illegible] জিজ্ঞেস করতাম। সেসব কথা বলতে বলতে সে ভাবালু হয়ে উঠত। চোখে জল ভরে আসত। বলত, ‘আমার সাহেবের সাথে আমিও যদি মরে যেতে পারতাম। আমি তাঁর ওপেন পেকার্ড গাড়ী মন্থর গতিতে চালিয়ে দিয়ে তাঁকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতাম। তাঁর হালকা নরম দেহ আমি ছাড়া কে বহন করে নিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু আমি শুনতে পেলাম, তাঁর প্লেন ল্যাণ্ড করার পর সেখানে যে এম্বুলেন্সটি এসেছিল তার ইঞ্জিন খারাপ ছিল। কতটুকু চলার পর সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন কায়েদে আজমের মেজাজ কেমন খারাপ হয়েছিল, একমাত্র আমি ছাড়া আর কে বুঝতে পারত সে কথা, মাণ্টো ভাই।

আগা হাশর

সন তারিখ মনে নেই। মনে থাকে না বলেই লেখার সময় যত বিতিকিচ্ছা লাগে। আমার বয়েসটা কত তাও মনে নেই। তবে একটুকু মনে আছে বহু চেষ্টা চরিত্রের পর এনট্রেন্সটা পাস করে দু' দু'বার এফ. এ. ফেল করার পর পড়াশুনার ওপর থেকে মনটা একেবারে উঠে গিয়েছিল এবং জুয়ার প্রতি আসক্তি বেড়ে যাচ্ছিল! আজমল সিং কাটরার ফজলু কুমারের দোকানের উপরে একটা বৈঠক জমে উঠেছিল, সেখানে দিনরাত জুয়া চলত। ফ্লাস চলত। প্রথম দিকে এ আজব খেলাটা আমার মোটেই বোধগম্য হচ্ছিল না। কিন্তু যখন শিখে নিলাম তখন একেবারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। রাতের বেলা শোবার টাইম পেতামনা বললেই চলে। যেটুকু পেতাম স্বপ্নের মধ্যেও হরতন রুহিতনের ধান্ধা করতাম।

প্রায় বছর খানেক পর জুয়া থেকেও আস্তে আস্তে মনটা উঠে যাচ্ছিল। কিন্তু অন্য একটা কিছুতো করতে হবে?

জুয়ার আড্ডায় ইব্রাহিম (সে আবার অমৃতসর ম্যুনিসিপ্যালিটি টাঙ্গা সমিতির দারোগা ছিল) কথায় কথায় একদিন আগা হাশর-এর কথা তুলল। সে জানাল আগা হাশর নাকি অমৃতসরে আসছেন। এ কথা শুনেই আমার স্কুলজীবনের কথা মনে পড়ে গেল। স্কুলে কতিপয় ছেলে-ছোকরাকে নিয়ে একবার একটা ড্রামাটিক ক্লাব খুলে আগা হাশর-এর একটা নাটক মঞ্চস্থ করার আয়োজন করেছিলাম। একদিন বাবা কেমন করে টের পেয়ে গেলেন এবং অতর্কিতে এসে আমাদের হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদি ভেঙ্গে চুরে লণ্ড ভণ্ড করে দিলেন। বলতে গেলে মাত্র বিশ দিন পরই এ ক্লাব ভেঙে যায়।

ইব্রাহিম দারোগা যখন আগা হাশর-এর কথা পাড়ল আগা হাশরের সেই নাটকের একটা বিরাট সংলাপ আমার তখনো মুখস্থ ছিল। এতএব আগা হাশরের কথা পাড়তেই আমার মনে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। জেনে খুশী হলাম যে, আগা হাশর অমৃতসরে আসছেন।

আগা হাশর-এর কোন নাটকই দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কারণ, সেকালে রাতের বেলা ঘর থেকে বের হবার অনুমতি ছিল না। তাঁর নাটক আমি পড়েও দেখিনি। কেননা, মিস্ট্রেস অব কোর্ট অব লণ্ডন এবং তীর্থরাম ফিরোজ পুরীর অনূদিত ইংরেজী গোয়েন্দা সিরিজ পড়ার বেজায় শখ ছিল আমার। তারপরও কেনই জানি আমি আগা হাশরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম।

জানতে পারলাম আগা হাশর মস্তবড় মানুষ। কাশ্মীরি মুসলমান। আমিও কাশ্মীরি। তারপর শুনলাম আমাদের গলিতেই নাকি তাঁর আদি নিবাস। আমাদের গলিতেই নাকি তাঁর ছোটবেলা কেটেছে ইত্যাদি। কার্যকারণে আগা হাশরের প্রতি আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম।

ইব্রাহিমের কাছ থেকে যা কিছু শুনলাম, ইতিপূর্বেও আমি তা বহুবার শুনেছি। আগা হাশরের মতো কড়া লোক নাকি আর হয় না। দিন,-রাত মদ নিয়ে পড়ে থাকেন এবং যতসব অকাজ কুকাজের সাথে জড়িত রয়েছেন। তাঁর মুখ থেকে যখন গালির তুব্‌ড়ি ছুটতে থাকে তখন মনে হয় এর মত গালবাজ আর কেউ নেই। বড় বড় লোক পর্যন্ত তাঁর গাল থেকে রেহাই পায়নি। কোম্পানীর অমুক অমুক শেঠরা যখন তাঁর কাছ থেকে নাটকের ফরমাস করল তাদেরকে এমন গালই দিলেন তিনি—একেবারে বাপ-দাদার নাম ভুলিয়ে দিলেন। বাপের জন্মে তারা আর আগা হাশরের মুখোখি হয়নি।

একবার রিহার্সাল হচ্ছিল। গরমের দরুন নায়িকা বার বার কপালের ঘাম মুছে নিচ্ছিল। আগা সাহেব চোখ পাকিয়ে বলে উঠলেন ঃ

আবরু না সেনওয়ারা করো
কাট জায়েগী অংলী
নাদান হো তলওয়ার সে
খেলা নেহি করতে।

একবার এক নায়িকার মুখ দিয়ে 'ফাস্ত' শব্দ উচ্চারণ হচ্ছিল না। আগা হাশরের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। তিনি এমন এক ধমক দিলেন যে, পর মুহূর্তেই নায়িকা সঠিকভাবে শব্দটি উচ্চারণ করে নিল।

একবার আগা হাশরের কান অবধি একটা খবর এসে পৌঁছুল যে, কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির লোক প্রপাগাণ্ডা করে বেড়াচ্ছে যে, হিন্দিতে যে ড্রামা আগা হাশরের নামে চলছে আসলে তা নাকি আগা হাশরের রচনা নয়। আগা হাশর হিন্দি জানেন না। আগা হাশর রেগে মেগে নাটক শুরু হবার অনেক পূর্বেই এসে হাজির হলেন এবং মঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন, শুনলাম কারা নাকি রটনা করেছে এ নাটক ভাড়া করে হিন্দি পণ্ডিতদের দিয়ে লিখিয়ে এনেছি। আমি সত্যিকার হিন্দি জানি কিনা আপনারা পরীক্ষা নিতে চান? আসুন আমি শুদ্ধ হিন্দিতে আপনাদের সাথে কথা বলছি—বলেই তিনি খাসা হিন্দিতে ঘণ্টা দুয়েক বক্তৃতা দিলেন। আগাগোড়া একবর্ণও উর্দু বা ফার্সী শব্দ মেশানো হয়নি।

আরো শুনেছি, আগা-সাহেব যে নায়িকার দিকে দৃকপাত করতেন তখনি তাকে আগা হাশরের আহ্বানে গোপন কামরায় চলে যেতে হতো।

আগা সাহেব মুন্সীদেরকে (সেক্রেটারী) হুকুম দিতেন, 'হ্যাঁ—তৈয়ার হয়ে যাও।'

বলেই তিনি একই সাথে যুগপৎ কমেডি এবং ট্র্যাজেডী রচনায় লেগে যেতেন। বলা বাহুল্য তখন তিনি মদমত্ত।

আগা সাহেব কোনদিন কোন মেয়েকে ভালবাসেননি। কিন্তু ইব্রাহিম দারোগা আমাকে জানালো যে, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আগা হাসর নাকি অমৃতসরের বিখ্যাত গণিকা মোখতার-এর প্রেমে নিমজ্জিত। 'আওরত কা পেয়ার' ছবিতে যে মোখতার নায়িকা হিসেবে অভিনয় করেছিল।

মোখতারকে আমি জানতাম। হল বাজারের আনোয়ার পেইণ্টার-এর দোকানে বসে থেকে প্রায় প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে নিত্য নতুন সাজে অন্যান্য গণিকাদের সাথে তাকে 'খালি পায়ে' দরগার দিকে যেতে দেখতাম।

আগা হাশর দেখতে কেমন ছিলেন আমি তা জানতাম না তবে খবরের কাগজে দু'একবার তাঁর ছবি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু তা দেখে তাঁর আসল ছবি কল্পনা করা অসম্ভব। বয়েস সম্পর্কে শুধু এতটুকু জানতাম, তিনি

বেশ বুড়িয়ে গেছেন। এই শেষ বয়েসে মোখতারের সাথে তাঁর কেমন করে প্রেম হলো আমরা তা নিয়ে ফজলুর দোতলায় জুয়ার আড্ডায় আলোচনা করতে গিয়ে বেশ একদিন রীতিমত বিস্মিত হলাম। আমার বেশ মনে আছে ফজলু কুমার গাঁট থেকে পয়সা বের করতে করতে একটা নিতান্ত দার্শনিক ভঙ্গিতে বলে ছিল, 'বৃদ্ধ বয়েসের প্রেমের জ্বালা বড় কড়া হয় রে ভাই।'

কবে কোন সময় হঠাৎ কি প্রসঙ্গে আগা হাশরের আলোচনা উঠেছিল তা মনে নেই। তবে হররোজ আগা হাশরকে নিয়ে আলোচনা করা আমাদের একটা বাতিক হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মধ্যে ইব্রাহিম দারোগাই আগা সাহেব সম্পর্কে বিশেষভাবে জানতো। একদিন কথায় কথায় সে বলে ফেললো, 'গত রাতে আমরা মোখতারের ওখানে ছিলাম। আগা সাহেব হাত পা ছড়িয়ে বসেছিলেন। আমরা বহু অনুনয়-বিনয় করে বললাম যে, আপনার 'রুস্তম সোহরাব' নাটকের কাহিনীটা যদি দয়া করে আমাদের শোনান। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। আমরা নিরাশ হলাম। আমাদের একজন এ ব্যাপারে মোখতারের সাহায্য প্রার্থনা করল। মুহূর্তে মোখতার আগা সাহেবের কাছে ঘেষে বসলো এবং বলল, 'আগা সাহেব' আমার হুকুম···রুস্তম সোহরাবের কাহিনী শোনাতে হবে আপনাকে।'

বাধ্য হয়ে আগা সাহেব একটু মুচকি হাসলেন এবং গুরুগম্ভীর কণ্ঠে রুস্তম সোহরাবের ডায়ালগ বলতে লাগলেন পর্যায়ক্রমে। মনে হচ্ছিল একটি দ্রুতগামী নদী খরতর বেগে বয়ে চলেছে। ওরে বাবা তার কণ্ঠের সে কি গর্জন।

একদিন ইব্রাহিম জানাল, আগা সাহেব নাকি মদ ছেড়ে দিয়েছেন। যারা আগা হাশরকে জানতেন তাঁদের পক্ষে এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। ইব্রাহিম জানালে, এই অল্প ক'দিন হল তিনি মদ ছেড়েছেন। মোখতারের প্রেমে পড়েই তাঁকে মদ ছাড়তে হয়েছে। ছিঃ এ আবার কেমন প্রেম—আবার তাও মদ ছেড়ে দিতে হচ্ছে। আমাদের মন্তব্য শেষ হতে না হতেই ফজলু কুমার একগাদা নোটে তার ট্যাকটা ভরে নিতে নিতে বললো, 'হায় ভাই—বুড়াকালের প্রেমের মতো প্রেম আর হয় না।'

জুয়া আর ভালো লাগছিল না। আস্তে আস্তে আমি জুয়ার আড্ডায় যাওয়া ছেড়ে দিলাম। এ সময় বারী সাহেব এবং হাজি লকলক এর সাথে আমার পরিচয় হয়। 'দৈনিক মাসাওয়াত' সম্পাদনার ব্যাপারে সম্প্রতি তাঁরা অমৃতসরে এসেছেন। সিরাজ হোটেলে দুজনে চা পান করতে আসতেন। সাহিত্য এবং রাজনীতি নিয়ে দেদার আলোচনা হতো। বারী সাহেবকে আমার বেশ পছন্দ হলো। হোটেলের মালিক জিজু ইতিমধ্যে আবার আখতার সিরানীকেও আমন্ত্রণ জানালেন। দিনরাত পানীয়ের ছড়াছড়ি চলতে লাগল। শিল্প সাহিত্যের প্রতি আমিও একটু ঝুঁকে পড়লাম। যে সময়গুলো আমার জুয়ার আড্ডায় কাটতো এখন তা 'মাসাওয়াত'-এর সম্পাদকীয় অফিসে কাটে। বারী সাহেব কখনো কখনো দু'একটা খবর অনুবাদ করার জন্যে এগিয়ে দিতেন। কাঁচা হাতে কোনমতে তা অনুবাদ করে দিতাম। কিছুদিন পর পত্রিকাতে একটা সিনেমা বিভাগ খুলে আমি তা পরিচালনা করতে লাগলাম। বন্ধুরা বলতো, কিছুই হয় না। বারী সাহেব বলতেন ওসব শুনতে যেওনা—চুপচাপ লিখে যাও। মৌলিক রচনা লিখতে চেষ্টা করো।

কিন্তু মৌলিক লেখায় আমার হাত আসছিল না। একজন ফরাসী লেখকের 'লাষ্ট ডেজ অব কনডেমড' আমার আলমারীতে পড়ে ছিল। একদিন বারী সাহেব সেটা তুলে নিয়ে গেলেন। পরদিন যখন দুপুর নাগাদ অফিসে গেলাম কাতিবরা জানাল যে, বারী সাহেব সেই সাত সকাল থেকে উচ্চৈঃস্বরে কি একটা বই পড়ছেন। কিছুক্ষণ পর পরই বাইরে আসেন এবং এক ঘটি ঠাণ্ডা পানি মাথায় ঢেলে আবার ভেতরে গিয়ে পড়তে বসে যান। আমি গিয়ে দেখলাম দরজা বন্ধ। কড়া নাড়ালাম। তখনো তিনি উচ্চৈঃস্বরে ইংরাজী পড়ছেন। দরজা খুলে গেল। বারী সাহেব জামা পায়জামা ছাড়াই বেরিয়ে এলেন, হাতে ভিক্টর হিউগের বই। সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে খাসা ইংরেজীতে বললেন, ইট ইজ এ ভেরী হট বুক। তারপর আমাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি বইটার অনুবাদ করে ফেল।

আমি বইটি পড়লাম। রচনাধারা অত্যন্ত সাবলীল। কিন্তু ভাষা বড় শক্ত। অনুবাদ করার আগে এক গ্লাস মদ পান করে নিলাম। কিন্তু

চোখের সামনে অক্ষরগুলো কিলবিল করে উঠলো। আঙিনায় খাটিয়া বিছিয়ে নিয়ে হুকোর নল টানতে টানতে বোনকে অনুবাদ শেখাবার ছলে তাকে দিয়ে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাতেও কোন কিছু হলো না, অবশেষে আমি কঠোর পণ নিয়ে একটা অভিধান ঘেটে ঘেটে এক পক্ষকালের মধ্যে বইটা অনুবাদ করে ফেললাম। বারী সাহেব খুব বাহবা দিলেন। নিজে নিজে একটু আধটু সংশোধন করে দিয়ে উর্দু বুকস্টলের ইউসুফ হাসানের কাছে পাণ্ডুলিপিটা ত্রিশ টাকায় বিক্রি করে দিলেন। ইউসুফ হাসান অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেটা ছেপে বাজারে ছাড়লেন। ব্যস, আমি একজন লেখক হয়ে গেলাম।

'মাসাওয়াত' বন্ধ হয়ে গেল। বারী সাহেব অন্য এক পত্রিকায় কাজ নিয়ে লাহোরে চলে গেলেন। জিজুর হোটেলের সেই জমজমাট ভেঙে গেল। এতদিনে আমার লেখায় হাত এসে গেছে। কিন্তু বন্ধুদের কাছে এর কোন দাম ছিল না বলে লেখা জোখা অবশেষে ছেড়ে দিলাম। আবার ফজলু কুমারের আড্ডায় গিয়ে হাজির হলাম। আবার জুয়া চলল। কিন্তু আগের মতো সেই মন আর নেশা ছিল না।

একদিন দারোগা ইব্রাহিম ফ্লাস খেলতে বলল, 'এবার কিন্তু আগা হাশর এসে মোখতারের কুঠিতে উঠেছেন।'

আমি তাকে বললাম, 'আমাকে একদিন নিয়ে চলো সেখানে।'

ইব্রাহিম নিয়ে যাবে বলে কথা দিল। কিন্তু আজ যাব কাল যাব করে আর গেল না। অবশেষে আমি একদিন জেকে ধরলাম। পরে সে জানাল যে, আগা হাশর তো লাহোর চলে গেছেন।

হরি সিং বলে আমার এক বন্ধু ছিল। আল্লা তাকে বাঁচিয়ে রাখুন। পাঁচ পাঁচটা বাড়ী বিক্রি করে পুরো ইউরোপ ঘুরে এসেছে একবার। ষষ্ঠ বাড়ীটিও বিক্রি করে বসে বসে খাবার জোগাড়ে ছিল। ফ্রান্সে মাত্র ছ'মাস ছিল সে। কিন্তু ফরাসীতে কথা বলতে তার একটুও অসুবিধা হয় না। দেখতে খুবই হালকা পাতলা। লিকলিকে। কিন্তু জবান ছিল বড় ক্ষুরধার। চোখ দু'টা ছিল কোটরাগত!

একদিন আমি তার কাছে আগা হাশরের কথা পাড়লাম। সে বলল, 'তো, তুমি কি তার সাথে দেখা করতে চাও?'

আমি বললাম, 'আলবত। আমি দু'চোখে একবার তাকে দেখতে চাই।'

সে বলল, 'ওমা, তা আর এমন কঠিন কাজ কি? অমৃতসরে এসে তিনি পণ্ডিত মোহসিন-এর ওখানে উঠেছেন—আমার সাথে প্রায় প্রত্যেক দিনই কথাবার্তা হয়।'

আমি একেবারে অধীর হয়ে উঠলাম এবং তাকে ধরে বললাম, 'তাহলে কালকেই আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।'

হরি সিং গ্লাসের মদটুকু নিঃশেষ করতে করতে ফরাসী ভাষায় বিড় বিড় করে কি যেন আওড়ালো। তার অর্থ হয়তো অনেকটা দাঁড়ায়, 'তা কি আর বলতে।'

পরদিন হরি সিং আমাকে আগা হাশর কাশ্মীরীর কাছে নিয়ে উপস্থিত হলো। পণ্ডিত মোহসিনের নাম শুনেই মনে হলো কাশ্মীরের লোক। তার আসল নামটা হয়ত অন্য কিছু। এটা ছিল তার উপনাম। বিভিন্ন মোশায়েরায় সেকেলে কাব্য-কর্মের কিছু কিছু নমুনা পেশ করতেন। ঘনিয়া কাটরার অমৃত সিনেমার সাথে তাঁর কারকারবার ছিল।

আগা সাহেবের সাথে পণ্ডিতজীর বন্ধুত্ব সম্ভবত কাব্যচর্চার মাধ্যমেই হয়েছিল। এমনও হতে পারে অমৃত সিনেমার সামনে মোখতারের কুটির—সে সুবাদেও হতে পারে। কারণ যা-ই থাকুক বর্তমানে আগা সাহেব পণ্ডিতজীর ওখানেই উঠেছিল। দুজনের কথাবার্তা শুনে মনে হলো দু'জনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

পণ্ডিত মোহসিনের দফতর ঘনিয়া কাটরার কাছাকাছি পশমের বাজারের একটু আগে তরিতরকারির দোকানের পাশের একটা বিরাট দেওড়ীর ওপরে ছিল। হরি সিং আগে আগে চলছিল। দেওড়ীর সিঁড়ি ভাঙতে যেয়ে আমার বুক দুরু দুরু করছিল।

বাইরে আঙিনায় চেয়ার পেতে লোকরা বসে ছিল। এককোণে পণ্ডিতজী গড়গড়া টানছিলেন। প্রথমেই একজন বিরাট দশাসই বিচিত্র পোশাকে-আশাকে সজ্জিত মানুষের সাথে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। গাঢ় লাল চমকদার সার্টিনের গলাবন্ধ, মোটা কলারের সাদা কামিজ, কোমরে গাঢ় নীল রং-এর বন্ধনী আর বড় বড় দুটো জবাফুলের মতো চোখ। আমি ভেবেছিলাম এখানকার কোন পীর সাহেব হবেন হয়তো। কিন্তু একটু পরেই

দেখলাম সবাই তাকে 'আগা সাহেব' বলে সম্বোধন করেছে। আমি যেন একটা হোঁচট খেলাম।

হরি সিং এগিয়ে গিয়ে এই আজব লোকটির সাথে করমর্দন করল এবং আমাকে দেখিয়ে বলল, 'আমার বন্ধু সা'দত হাসান মাণ্টো, আপনার সাথে পরিচয় করতে চায়।'

আগা সাহেব তাঁর চোখ দুটো বিস্ফারিত করে একটু মুচকি হেসে বললেন 'লর্ড মিণ্টোর সাথে তোমার কি সম্পর্ক?'

আমার মুখ দিয়ে কোন উত্তর জোগালো না। কিন্তু হরি সিং বলল, 'ওর নাম মিণ্টো নয়, মাণ্টো। জাতে কাশ্মীরী।'

আগা সাহেব একথা শুনে একটা 'হুহ' শব্দ করে পণ্ডিতজীর সাথে কাশ্মীরীদের বংশগৌরব নিয়ে আলোচনায় মত্ত হলেন। আমি কাছের একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। আগা সাহেবের আলোচনায় মোটেই মন ছিল না পণ্ডিতজীর। কারণ, দেখলাম কথার মাঝখানে ফাঁক পেলেই তিনি বার বার বলতে শুরু করেন, 'আগা সাহেব ওসব রেখেদিন, মাত্র দুটো রিল কৌতুক নাটক লিখতে কবে নাগাদ আপনি হাত লাগাচ্ছেন সেইটেই বলুন।'

আগা সাহেবেরও কৌতুক নাটকের আলোচনায় তেমন মন ছিল না। কারণ তিনি তো কাশ্মীরীদের বংশগৌরবের আলোচনায় মত্ত। আসলে ও আলোচনায়ও তাঁর মন ছিল না কথার মাঝে মাঝে কি যেন ভাবছিলেন তিনি। এবং চাকর ছোকরাকে উদ্দেশ্য করে বার কয়েক গালি দিলেন। চাকর ছোকরাটা এখনো কেন আসছে না।

আগা যখন থামলেন পণ্ডিতজী বললেন, 'আগা সাহেব, এসময় আপনার মুড ঠিক আছে। আমি কাগজ কলম আনিয়ে নিচ্ছি। আপনি সেই কমেডিটা লিখে ফেলুন।'

আগা হাশর মুহূর্তে চোখ পাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আরে চুপ কর। আগা হাশরের মুড সব সময়ই ঠিক থাকে।'

পণ্ডিতজী চুপসে গেলেন। এবং নিজের গড়গড়ার নল টেনে নিলেন। চোখে সরষে ফুল দেখছিলাম যেন। কোনদিক থেকে যেন একটা সুবাস

আসছিল। চেয়ে দেখলাম আগা সাহেবের কানে আতর মাখা উভয় তুলা রয়েছে। মনে হলো মাথার চুলেও আতর রয়েছে।

হঠাৎ বাইরের দিকে শোরগোল শোনা গেল। কে একজন এসে আগা সাহেবকে বলল, 'আগা সাহেব, বাইরে মহরমের মিছিল আসছে। আসুন, দেখুন।'

আগা সাহেব বললেন, 'রাখো ওসব বকবাজী।' বলেই তিনি কারবালা-কাহিনী সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় অবতীর্ণ হলেন। আলোচনা করতে গিয়ে এমন সব তথ্য আবিষ্কার করে ফেললেন যে, শুনে সবাই হতবাক। তিনি নাটকীয় কায়দায় বললেন, 'ফোরাতের মুখ ছিল বন্ধ। ফোরাতে আদৌ পানিই ছিল না। আগা হাশর কোন কথা…।'

এখানে আসতেই একজন লোক মহফিল ছেড়ে উঠে গেল। সম্ভবত লোকটি শিয়া। আগা সাহেবের আলোচনার মোড় ঘুরে গেল।

পণ্ডিতজী ফাঁক পেয়ে গেলেন। আবার বলে ফেললেন—'দু রিল কমেডী আপনাকে যে ভাবেই হোক লিখতেই হবে।'

আগা সাহেব এবারে একটা মোটা গালি ছেড়ে দিয়ে বললেন—'এখানে হচ্ছে ট্র্যাজেডীর কথা আর তুমি কি না নিয়ে এসেছে কমেডি।'

একথা বলেই আবারও তিনি কারবালার বিষাদ গাঁথার সূক্ষ্ম আলোচনায় নিমগ্ন হলেন। বেশ অনেক্ষণ বকবক করার পর হঠাৎই তিনি প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়ে চাকর ছোকরাকে ঝাড়া গালি দিতে শুরু করলেন এবং বললেন—'হতভাগা এখনো কোথায় বসে মরছে।'

কিছুক্ষণ পর এদিক-সেদিকের কথাবার্তার পর কে একজন মওলানা আবুল কালাম আজাদের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে কথা পাড়ল, আগা সাহেব বলে উঠলেন, 'ও…মহি উদ্দিনের কথা বলছ? আমরা দু'জনেই তো খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচারণার মুণ্ডপাত করেছি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বক্তৃতা দিয়ে যেতাম—কি ছিল সে দিনগুলো।'

একথা বলেই তিনি অতীতের সেই মধুময় দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থনে হারিয়ে গেলেন। অতীত দিনের কথা ভাবতে গিয়ে তার চোখ দুটো বুঁজে এল। অনেক্ষণ পর যখন চোখ খুললেন, মনে হলো বহু বছরের নেশা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন তিনি।

আগা সাহেব আবার বললেন, তখনকার দিনগুলোই ছিল অন্য রকমের। আজাদের কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির অভ্যেস ছিল আর আমার ছিল অত্যন্ত সন্তর্পণে প্যাঁচ কষার। যেখানে হাত দিয়েছি সেখানেই শত্রুরা কুপোকাৎ। একবার আজাদ (মওলানা আজাদ) বিশ্রীভাবে চিৎপটাং হয়ে পড়ল। চারজন খৃষ্টান মিশনারীর সাথে প্রতিযোগিতা চলছিল। যথাসময়ে আমি যেয়ে উপস্থিত হলাম। আমাকে দেখে আজাদের দেহে প্রাণ ফিরে এল। সে ত্বরিত পরিস্থিতিটা আমার হাতে ন্যস্ত করল। আমি দু'তিনটা প্যাঁচ কষে তাদেরকে ধরাশায়ী করে ফেললাম। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তাধীন। কিন্তু ওদিকে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মসজিদে বেজায় গরম। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি আজাদকে বললাম, 'বোতলটা কোথায় আজাদ?' আজাদ বলল, 'এইতো আমার পকেটে।' আমি বললাম, 'দোহাই—একটুও দেরী না করে চলো। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।' বেশী দূর গেলাম না। মসজিদের গোছলখানাতে ঢুকেই গলাধঃকরণ শুরু করলাম।

এমন সময় আগা সাহেবের চাকর এসে উপস্থিত হলো। আগা সাহেব তার স্বভাবসিদ্ধ কায়দার তাকে কতক্ষণ গালি দিলেন এবং দেরী হবার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বুঝা গেল, গালি শুনা তার নিত্যকার অভ্যাস। এত গালি তার গায়েই যেন লাগলো না। স্বচ্ছন্দে সে কাগজে মোড়ানো একটা পুটলী তাঁর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'দেখুন, আপনার জন্যে কি নিয়ে এসেছি। আপনি খুশী না হয়ে পারবেন না।'

আগা সাহেব পুট'লী খুললেন। তাতে রং বেরং-এর চারিটি শেলোয়ার রয়েছে। আগা সাহেব খুশী হবার বদলে রক্তচক্ষু পাকিয়ে গর্জন করে বললেন, 'বেশ করেছ বাঞ্চোত—এমন আজগুবি কাপড় তো এই শহরের আজেবাজে মানুষেও পরে না।'

একথা বলেই তিনি সেগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে দিলেন। এরপর আরো কিছুক্ষণ গালাগাল দিয়ে পকেট থেকে দু'তিন হাজার টাকার একটা বাণ্ডিল নোট বের করে বললেন,

'যা পান নিয়ে আয়।'

পণ্ডিতজী গড়গড়া একদিকে সরিয়ে রেখে বললেন, 'রাখুন আগা সাহেব, আমিই আনাচ্ছি পান।'

আগা সাহেব নোটের বাণ্ডেলটা পকেটে পুরতে পুরতে বললেন, 'যা, তোর কাছে ভাংতি আছে। তা থেকে নিয়ে আয়।'

চাকর যেতে উদ্যত হলেই তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'শোন—ও এখনো কেন এলোনা সে খবরও নিয়ে আসবি।'

চাকর চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সিঁড়ির কাছে কাকনের টুংটাং শোনা গেল। ঘরময় ভুর ভুর করে সুগন্ধি ছড়িয়ে গেল। আগা সাহেবের চক্ষু চড়কগাছ। মোখতার পায় পায় কামরায় ঢুকে পড়ল। তার বিন্দুমাত্র সৌন্দর্য বলতে কিছু ছিল না। পরনে দামী পরিচ্ছদ। আগা সাহেব এবং উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে সালাম আদাব জানিয়ে ভেতরের খাস কামরায় চলে গেল। আগা সাহেবের দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করে সে কামরা অবধি গেল।

ইতিমধ্যে পান এসে গেল। খবরের কাগজে মোড়ানো এক বাণ্ডেল পান। চাকর ভেতরে চলে যাচ্ছিল। আগা সাহেব তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কাগজ ফেলে দিসনে। যত্ন করে রেখে দে।'

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি এ টুকরা কাগজটুকু দিয়ে কি করবেন আগা সাহেব?'

আগা সাহেব বললেন, 'তা জান না? এটা পড়ব। ছাপানো কোন কাগজই আমি না পড়ে ছাড়ি না। জীবনে আমি যত টুকরা কাগজ পেয়েছি সবই পড়েছি। একথা বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'ক্ষমা করবেন, ভেতরে এক প্রেমিকা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

পণ্ডিতজী আবার গড়গড়া তুলে টানতে লাগলেন আর আমি এবং হরি সিং কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে এলাম।

আমি ক'দিন ধরে এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করতে লাগলাম। আগা সাহেব আজব চরিত্রের লোক। হাজার বাহু বিস্তারিত তাঁর ব্যক্তিত্ব। আমিও ইতিমধ্যে তাঁর ক'টি নাটক পড়ে ফেললাম। ভাষায় অজস্র ভুল। বাজে কাগজে ছাপানো। নাটকীয় দৃশ্যগুলোতে অত্যন্ত জমকালো সংলাপ। মিলনান্তক দৃশ্য গোঁজামিলে পরিপূর্ণ। সবচেয়ে

মজার ব্যাপার হলো, তাঁর সব নাটকই বেশ্যাদেরকে নিয়ে। জীবনের শেষ মুহূর্তে মদ ছেড়ে তিনি এক গণিকার প্রেমে নিমজ্জিত হয়েছেন। পণ্ডিত মহসীনের সাথে একবার দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন, 'ও সব প্রেমটেম সম্পর্কে আমার জানা নাই। তবে মদ ছেড়ে তিনি ভুল করেছেন। খুব অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা পড়বেন।'

আগা সাহেব বেশ কিছুকালই জীবিত ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতজী এর মাসখানেক পরেই ইন্তেকাল করেছেন।

আমি এখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতে শুরু করেছি। মাস কয়েক পর লোকমুখে শুনতে পেলাম, আগা হাশর লাহোরে 'রুস্তম সোহরাব' নাম দিয়ে ছবি করছেন। এ ব্যাপারে পানির মতো টাকা-পয়সা ছিটানো হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এ ছবির নায়িকা মোখতার।

অমৃতসর থেকে লাহোর মাত্র এক ঘণ্টার পথ। আগা সাহেবের সাথে আবার দেখা করার জন্যে মন আঁকুপাঁকু করছিল। কিন্তু আজ-কাল করে আর লাহোর যাওয়া হয়ে উঠলো না।

অনেকদিন পর বারী সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি লাহোর গেলাম। তারপর নানা কার্য-কারণে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লাম যে, আগা সাহেবের কথা ভুলেই বসেছিলাম। একদিন সন্ধ্যার দিকে ভাবলাম, উর্দু বুক স্টলের দিকে যাওয়া যাক। আমি ও বারী সাহেব আরব হোটেল থেকে চা পান করে সেদিকে রওয়ানা দিলাম। উর্দু বুক স্টলে পৌঁছে দেখি আগা হাশর—একটা টেবিলের সামনে চেয়ার নিয়ে বসে গেলাম। আমি বারী সাহেবকে ইশারা করে বললাম, 'ইনিই হলেন আগা হাশর।' বারী সাহেব চোখ ছানাবড়া করে তাঁর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললেন, 'ওমা, এই নাকি আগা হাশর?'

আগা সাহেবের পোশাক-আশাক আগের মতোই। বসে-বসে একটা বইয়ের প্যাতা ওলটাচ্ছিলেন। কাছে পৌঁছতেই আমার বুক দুরু-দুরু করে উঠল। আগা সাহেবের হাতে আমারই অনূদিত 'ছারগুজাস্তে আশির' বইটি।

দোকানী ইউসুব আমার সাথে আগা সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইনিই হলেন মাণ্টো। ইনি এটা অনুবাদ করছেন।'

আগা সাহেব ভারী চোখ দুটো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমাকে দেখলেন। আমি মনে করেছিলাম, তিনি হয়ত আমাকে চিনে নেবেন। কিন্তু তিনি আমাকে দেখে নিয়ে বইখানা আবার ওল্‌টাতে পাল্‌টাতে শুরু করলেন। এবং বললেন, 'ভিক্টর হুগো কেমন লিখতেন?'

বারী সাহেব বললেন, 'ফরাসী সাহিত্যে ভিক্টর হুগোর স্থান খুব উঁচুতে।'

আগা সাহেব পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে বললেন, 'নাট্যকার ছিলেন নাকি?'

'জী, নাট্যকার।'

আগা সাহেব বললেন, 'তার মানে?'

বারী সাহেব বললেন, 'আসলে তিনি ফরাসী সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। নাটক উপন্যাসও লিখেছেন। 'বিপদগ্রস্ত' নামের একখানি উপন্যাস তাঁর এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, লোকেরা তাঁর কবি-প্রতিভার কথা ভুলে যায়। পরে একজন ঔপন্যাসিক হিসেবেই তিনি পরিগণিত হন।

আগা সাহেব এসব খুব মনযোগ দিয়ে শুনলেন। শেষে তিনি দোকান থেকে আমার বইটিও কিনবেন বলে জানালেন। তা দেখে আমি খুব খুশী হলাম।

বারী সাহেব কথা বলতে বলতে ভেতরে শো রুমের দিকে অগ্রসর হলেন। বারী সাহেবের কথায় আগা সাহেব রাজী হলেন এবং তাঁর অনুরোধক্রমে বেশ ক'খানা বই কিনলেন। কথায় কথায় বারী সাহেব বললেন, 'আগা সাহেব, আপনি কেন পাক-ভারতের নাটকের ইতিহাস লিখছেন না, লিখলে একখানা মূল্যবান বই হয়।'

আগা সাহেব বললেন, 'এমন একখানি বই আগা হাশরই লিখতে পারে। লেখার ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু হতভাগা আজকাল কবরে পা দিয়ে বসেছে। তার দ্বারে এসে মৃত্যু করাঘাত হানছে।' আমি কথার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা আগা সাহেব, যেসব নাটক আজকাল বাজারে চলছে...'

আমি কথা শেষ না করতেই তিনি বললেন, 'তওবা তওবা...লাহাওলা অলা—হারামজাদারা এখান থেকে ওখান থেকে নিয়ে আগা হাশরের

নামে ছাপিয়ে দিয়ে পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। আগা হাশর এসব আজে বাজে…'

বলেই তিনি এসব বইয়ের প্রকাশকদেরকে বেশ কষে গালি দিলেন একচোট! আমি বললাম, 'আপনি ওদের বিরুদ্ধে মামলা করছেন না কেন?'

—তিনি বললেন, 'কি করবো এসব চুনোপুটি মেরে।'

কথাটা সত্যি বলেছেন। আমি চুপসে গেলাম।

আগা হাশর শো-রুমের বাইরে এসে ইয়াসুবের কাছে বিল চাইলেন এবং বাজীকরের ভঙ্গিতে পকেট থেকে দশ ও পাঁচ টাকার তিন হাজার টাকা বের করলেন। তখন এক ধরনের নূতন নোট বেরিয়েছে। আগেকার নোটের চেয়ে এগুলো অনেক ছোট এবং দেখতে সুন্দর ছিল।

আগা হাশর বললেন, 'চেক ক্যাশ করাবার জন্যে যখন ব্যাঙ্কে গেলাম, ক্লার্ক বলল, 'সময় শেষ হয়ে গেছে।' আমি বললাম, 'আগা হাশরের জন্যে এখনো ঢের সময় আছে।' আমার নাম শুনতেই ক্লার্ক দৌড়ে ম্যানেজারের কামরায় গেল। আর ম্যানেজার আমাকে সসম্মানে ডেকে পাঠালো। ম্যানেজার নতুন নোটগুলো আমাকে দিয়ে বলল, 'আপনার তো আর কোন খেদমত করতে পারবো না। এই নতুন ধরনের নোটগুলো আজকেই এসেছে। আপনাকেই প্রথম এ নোট দিলাম।'

বারী সাহেব সেখান থেকে একটা নোট নিয়ে নেড়েচেড়ে বললেন, 'আকারে বেশ ছোট—একেবারে আমাদের সরকারের মতো।'

কথাটা শুনে আগা সাহেব বারী সাহেবের পিঠ চাপড়ে ধন্যবাদ দিলেন এবং বললেন, 'তোমার একথা আমি যে কোন নাটকে ঢুকিয়ে দোব।'

বারী সাহেব বেশ খুশী হলেন। ইতিমধ্যে সেদিনের সে চাকরটি এসে উপস্থিত হলো। এবারে তার হাতে গোটা চারেক কান্দাহারের আনার। আগা সাহেব সেগুলো নাকের কাছে নিয়ে ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন, 'এমন আজেবাজে আনারস কোন ভদ্রলোক খায়?'

চাকর বলল, 'তাহলে ফিরিয়ে দিয়ে আসব?'

আগা সাহেব বললেন, 'কুত্তা, দরকার নেই—বরং তুই খেয়ে নিস।' বলেই তিনি একটা ভারী গালি ছুঁড়লেন তার দিকে।

আগা সাহেব যেতে উদ্যত হতেই আমি অটোগ্রাফ বুক এগিয়ে দিয়ে তাঁর স্বাক্ষর নিলাম। আগা সাহেব কাঁপা কাঁপা হাতে স্বাক্ষর দিতে দিতে বললেন, 'বহুকাল পরে মাত্র এই কটা অক্ষর লিখলাম।'

আমি অমৃতসর ফিরে এলাম, কিছুদিন পর লাহোর থেকে খবর এলো সামান্য অসুখে ভুগে আগা হাশর ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর জানাজায় সামান্য ক'জন লোক উপস্থিত হয়েছিল।

ফজলু কুমারের জুয়ার আড্ডায় যখন আগা হাশরের মৃত্যুর খবর নিয়ে আলোচনা উঠল ফজলু কুমার তার স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় পয়সা কুড়িয়ে টেক ভরতে ভরতে একজন পাকাপোক্ত দার্শনিকের মতো আমতা আমতা করে বলল, 'বুড়োকালের প্রেমের মতো প্রেম আর হয় না।'

বারী সাহেব

সেকালে অমৃতসরের অলিগলির দেয়ালে লম্বমান একটা রক্তলাল পোস্টার প্রায়শ দেখা যেত। এ পোস্টারে লেখা থাকত ঃ

মুস্তাবফ আওর জাবের
হুকমুরানো কা
ইবরত নাক আনজাম,
রুশ কে গলি কুচু মে
সদায়ে ইন্তেকাম,
জারেইয়ত কে তাবুত মে
আখেরী কিল—

লোকেরা এ সব পোস্টারের বিষয়বস্তুর চেয়ে পোস্টারের রক্তলাল রংয়েই বেশী প্রভাবিত হতো। পথচারীরা পোস্টার সম্পর্কে কানাঘুষা করতো এবং এক সময় কেটে পড়তো।

সন তারিখ আমার মনে নেই। তবে সময়টা ছিল ধর-পাকড়ের। তখনকার দিনে ধর-পাকড়ের হিড়িকটা অমৃতসরে বরাবর লেগেই থাকতো। লোকদের ওপর লাঠিচার্জ করা হতো। এবং লোকদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্যে এক ধরনের যন্ত্র দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়া হতো। মোটামুটি, একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল সর্বত্র। এজন্যে পথচারীরা এ সব রক্তলাল পোস্টার সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য না করাই সমীচীন মনে করতো এবং মানে মানে কেটে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করতো। কেননা, কোন্ দিক থেকে কোন্ বিপদ এসে হাজির হয় বলা যায় না।

পোস্টারের চরণগুলো অস্কার ওয়াইলড-এর 'ভিরা' নাটকের একটি ডায়ালগ-এর উর্দু রূপান্তর। তর্জমাটা আমি এবং আমার দক্ষিণহস্ত

হাসান আব্বাস মিলে করেছিলাম। আখতার শিরানী সংশোধন করে দিয়েছিলেন। বারী সাহেব যেহেতু আমার এবং হাসান আব্বাসের গুরু ছিলেন, তিনি এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। পোস্টারগুলো আমরা বাকী প্রেসে ছাপিয়ে দিলাম। বারী সাহেব নিজেই ফর্মাগুলো কাঁধে করে নিজের বাড়ী নিয়ে তুলেছিলেন। কারণ, তিনি আশংকা করছিলেন, পাছে পুলিশ হানা দিয়ে প্রেস থেকে এগুলো যদি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়। তখনকার দিনগুলো আমার এবং হাসান আব্বাসের জন্যে বড় উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। থানায় এবং জেলখানায় কি ঝকমারি করা হয় তা নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। সব সময়ই মনে এমন একটা ভাব ছিল, যদি কোন মতে গ্রেফতার হয়ে যাই—দেশের জন্যে আলবত বড় ত্যাগ হবে। আর যদি মুক্ত হয়ে আসি লোকেরা গলায় মালা দিয়ে আমাদের বরণ করে নেবে এবং মিছিল বের করবে।

নাটকটি ছিল রুশ সমাজবিপ্লবের সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে। এসব লোকদের কাছে সব রকমের মারণাস্ত্র ছিল। অমৃতসরে তখনকার দিনে যদি কেউ হাওয়াই বন্দুকও রাখতো তাদের আর রক্ষা ছিল না। কোথায় মস্কো আর কোথায় অমৃতসর। আমি এবং হাসান আব্বাস নেহাত হবু বিপ্লবী ছিলাম না। দশম শ্রেণীর মানচিত্র বের করে আমরা কয়েকবারই রাস্তা পথে ‘রুশ পৌঁছবার স্কিম বানিয়েছিলাম। ফিরুজদ্দিন মনসুর তখনো কমরেড মনসুর হননি। ওদিকে কমরেড সাজ্জাদ জহিরও তখনো বিকাশ লাভ করেন নি। অতএব আমরা অমৃতসরকেই মস্কো মনে করে বসেছি। এবং এরই অলি-গলিতে বিদেশী বেনিয়া শাসকদের একটা মর্মান্তিক পরিণতি দেখতে চাচ্ছিলাম। জামিল শিং কাটরা, করফুর দেউড়ী বা চকফরিদ এলাকাকে জার-সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি মনে করে একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষের জন্যে হাত পাকাচ্ছিলাম। একটা প্রাণান্ত হাতুড়ি ঠুকবার জন্যে হাত নিসপিস করতো। কিন্তু হাতুড়ি ঠুকতে যেয়ে হাতুড়ি বাঁকা হয়ে পড়ে তা আমাদের হাতেই আঘাত হয়ে ফিরে আসে, হাত জখম হয়ে যায়। এসব নিয়ে আমাদের মতো চুনোপুটিদের ভাববারই বা কি ছিল? বারী সাহেব ছিলেন আমাদের গুরু—ভাবতে হয় তিনি ভাববেন। কিন্তু আমার বার বার মনে হতো এই গুরু মহোদয় নেহাত

দুর্বল-চিত্ত। গাছের পাতা নড়াচড়া করলেও তিনি হকচকিয়ে ওঠেন। কিন্তু আমাদের দুর্জয় মনোবল সব সময় তাঁর মনে শক্তি-সাহস যোগাতো।

আজ এসব ভাবতে গিয়ে মনে হয় সেকালের এসব চেষ্টা-চরিত্র এবং আয়োজন সবই যেন একটা ছেলেখেলা। কিন্তু সেকালে এ ছেলেখেলারই গুরুত্ব ছিল আমাদের কাছে অপরিসীম। আমাদের গুরু যদি দুর্বলচিত্তই না হতেন তাহলে আমরা চার মহাপুরুষ (কিছুদিন পর আবু সাইদ কোরেশীও আমাদের দলে এসে যোগ দিয়েছিল) সেদিন এই দেশমাতৃকার মানবাধিকার উদ্ধারের জন্যে ফাঁসি পর্যন্ত পেতে পারতাম এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অমৃতসরের শহীদানের মধ্যে আরো এক গণ্ডা মুজাহিদের নাম সংযোজিত হতো।

বারী সাহেবকে অত্যন্ত ভীরু বলেছি। তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর কোনরূপ আক্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আসলে তাঁর ব্যক্তিত্বে ভীরু প্রকৃতিটা সত্যি প্রকট ছিল। তাঁর এই ভীরু প্রকৃতিটা যদি কোন মতে কেটে যেতো তাহলে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ আলাদা রূপ ধারণ করতো। তিনি একজন নামজাদা হকি খেলোয়াড় হতে পারতেন। দেশ-বিদেশে তাঁর নামের বেশ চর্চা থাকতো এবং অন্যান্য খেলোয়াড়দের মতো তাঁর জীবনও কোন রাজ্যের সরকারী চাকরি করে কাটতো। অথবা এও হতে পারতো যে তিনি প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার থেকে পদোন্নতি করতে করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার হতে পারতেন। ভগত সিং-এর মতোও হতে পারতেন তিনি। কিন্তু একমাত্র ভীরু প্রকৃতির জন্যেই তিনি যেমন ছিলেন তেমনই রয়ে গেলেন। কারো সাতেও ছিলেন না পাঁচেও ছিলেন না। আমার মতে তাঁর মনে যেসব উর্ব্বর চিন্তা জন্মলাভ করেছে তা শুধু ভীরু প্রকৃতির কারণেই বিকাশ লাভ করতে পারেনি।

বারী সাহেব নীরবে একান্ত চিত্তে এমন সব পরিকল্পনা এবং তথ্য উদ্ঘাটন করতেন যা সচরাচর অন্যান্যদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু পরমুহূর্তে তাঁর মন থেকে তা বেমালুম মুছে যেতো। কোন কোন সময় এমন হতো—তিনি তাঁর গবেষণা সমুদ্রে একটা চমৎকার রত্নের সন্ধান পেয়েছেন। এটাকে উদ্ধার করার জন্যে কি কি পন্থা অবলম্বন করতে হবে তাও সবিস্তারে বললেন। সব কিছু শুনে লোকেরা তা উদ্ধার করার

জন্যে প্রস্তুতি নিল। তল্পিতল্পা বেঁধে কিছু লোক রওনাও হয়ে গেছে। এমন সময় হয়ত পেছনে ফিরে দেখা গেল বারী সাহেব গায়েব। ফিরে এসে লোকেরা যখন ত'ার কাছে কৈফিয়ত তলব করলো, দেখা গেল ততক্ষণে তার চেয়েও চমকপ্রদ জিনিস আবিষ্কার করে বসে আছেন তিনি।

রাতভর পোস্টার লাগানোর পর গ্রেফতার হবার আনন্দমাখা আশংকায় আমি এবং আব্বাস রাতভর এপাশ ওপাশ করলাম! বলতে গেলে সারারাত বিনিদ্রই কাটালাম। পরদিন সকালে আমরা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বারী সাহেবকে খুঁজতে লাগলাম। কেননা এরপর আগামীতে কি হবে বারী সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে হবে। দু'তিন জায়গায় যেখানে বারী সাহেবের থাকার সম্ভাবনা ছিল, তালাশ করলাম কিন্তু পেলাম না। একদিন গেল দু'দিন গেল—বারী সাহেব একেবারে লাপাত্তা। দীর্ঘ পনের দিন পর হঠাৎ বারী সাহেবের আভির্ভাব। প্রথম কথাতেই তিনি জানালেন যে, একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার স্কীম নিয়ে ফেলেছেন তিনি।

আমরা কোনরূপ আক্রমণ করব তার আগেই তিনি বলে ফেললেন, 'আমি আর তোমাদের মতো বেকার বসেছিলাম কিনা। বলতে গেলে সব বন্দোবস্ত সেরে ফেলেছি। মাত্র ডিক্লারেশন, দাখিলের কাজটা বাকি রয়ে গেছে। পত্রিকার জন্য আমি এখন থেকে লিখতে শুরু করে দিয়েছি।'

অমৃতসরের দেয়ালে দেয়ালে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত হাতুড়ি ঠুকবার জন্যে যে পোস্টার টানানো হয়েছিল, কিছু কিছু তার ছিঁড়ে গেছে। কিছু কিছু বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমাদের উদ্যমটা এবার পোস্টার থেকে ফিরে এসে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের প্রাথমিক প্রস্তুতি কর্মে নিপতিত হলো।

'ভিরা' এত বাজে ছাপা হয়েছিল যার কারণে তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়েছিল আমার বাড়ীতে, কিন্তু 'খালক' এর বাহ্যিক চাকচিক্য মন্দ ছিলনা। 'সানাই' বাকী প্রেস থেকে যখন তার প্রথম সংখ্যা ছাপা হলো আমি এবং বারী সাহেব তা কাঁধে করে বাড়ীতে এনে তুলেছিলাম। পত্রিকাটার ছাপা সত্যি ভাল হয়েছিল।

বারী সাহেবের আর একজন ভক্ত ছিলেন। তাঁর নামটা আমি ভুলে গেছি। তবে একটুকু মনে আছে লোকটির মুখভর্তি কালো দাড়ি ছিল এবং চামড়ার ব্যবসা করতেন। খালেক-এর প্রাকাশনার ব্যাপারে তিনিই আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। এব্যাপারে তিনি আরো অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মাঝখান থেকে বারী সাহেব হঠাৎ পিঠটান দিলেন।

প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় 'হ্যাগেল থেকে কার্ল মার্কস অবধি শীর্ষক বারী সাহেবের উচ্চাঙ্গের একটি নিবন্ধ ছাপা হলো। প্রবন্ধটিতে এত বেশী দর্শনতত্ত্ব সন্নিবেশিত করা হয়েছে যে, তার এক কানাকড়িও আমার এবং আব্বাসের বোধগম্য ছিল না। আসলে আমরা হ্যাগেল বা কার্ল মার্কস কাউকেই জানতাম না। তবে মার্কস এর নাম বারী সাহেবের মুখেই বহুবার শুনেছি। তাঁর সম্পর্কে আমরা এতটুকু জানতাম যে, তিনি শ্রমিকদের জন্যে সংগ্রাম করেছেন। তাঁর দর্শন বা হেগেলের সাথে তাঁর কিসের মিল ছিল কসম করে বলছি এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না।

আমার গল্পের পাঠকদের জন্য এখানে একটা কথা বলে নিতে চাই যে, আমার রচিত প্রথম গল্প 'তামাশা' খালক-এর প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। গল্পের সাথে আমার নাম ছাপা হয়নি। বন্ধু-বান্ধবরা অমাকে নিয়ে হাসি-মস্করা করবে এই ভয়ে নাম ছাপিনি। কেননা আমার আজগুবি ও অসংবদ্ধ ভাষা আর প্রকাশভঙ্গি নিয়ে এমন লোক ছিল না যে না হাসতো। কিন্তু এ ব্যাপারে বারী সাহেব ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রম। আমাকে সব সময় উৎসাহ জোগাতেন তিনি। কোন সময় তিনি আমার ভুল ধরিয়ে দিতেন না। বলতেন, ওসব ঠিক হয়ে যাবে।

কথায় কথা এসে যায়। বারী সাহেবের কাছ থেকে কেটে পড়া সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। 'খালক,'-এর প্রথম সংখ্যা বের হবার পর কদিন বেশ আনন্দেই কাটল। একটা বিরাট কীর্তি সম্পাদন করে কেলেছি যেন। অন্তত আমি এবং আব্বাস তাই মনে করতাম। জামিল সিং কাঠরা এবং হল বাজারে আমরা বড় ঠাট নিয়ে চলাফেরা করতাম। কিন্তু কিছুদিন পর মনে হলো অমৃতসরের চোখে আমরা যে ভবঘুরে ছিলাম সে ভবঘুরেই আছি। পানের দোকানদার বরাবরের মত পাওনার জন্য তাগাদা দেয়

এবং বাড়ীর মুরুব্বীদের অভিসম্পাত শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা। এদিকে শুনলাম গোয়েন্দা পুলিশও আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছে। আমার ভগ্নিপতি খাজা আবদুল হামিদ তখন সবেমাত্র রিটায়ার হয়েছেন। তিনি বহুকাল ফুলওয়ারের পুলিশ স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। এজন্যে পাঞ্জাব ইউনিটের প্রায় সকল পুলিশের সঙ্গে জানা ছিল। গোয়েন্দা পুলিশ বারী সাহেবকেও খুঁজতে লাগল। বারী সাহেবের ঠিকানা জানতে গিয়ে ভগ্নিপতি খাজা সাহেবের সাথে দেখা হয়ে গেল তাদের। তিনি বারী সাহেবের 'হ্যাগেল থেকে কার্ল মার্কস' নামক চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধটি পড়েছিলেন। তাছাড়া বারী সাহেবকে তিনিও জানতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। তিনি পুলিশের লোকদেরকে বলে দিলেন অন্য কাজ করো গিয়ে। হ্যাগেল কার্ল মার্কস তোমাদের বুঝে আসবে না। খামকা বেচারী বারী সাহেবকে হয়রানি করে লাভ নেই। বারী সাহেব নিজেই হয়ত নিজের লেখা বুঝেননি।

খাজা সাহেব যখন তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, প্রবন্ধটিতে এমন বিপ্লববাত্মক কিছু নেই যার দরুন ইংরেজের রাজত্ব কাত হয়ে যেতে পারে, তারা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল। কিন্তু এসব যখন বারী সাহেবের কর্ণগোচর হলো তিনি 'খাল্‌ক'-এর দ্বিতীয় সংখ্যা বের করে সব কিছু আমায় কাঁধে ফেলে রেখে হঠাৎ ডুব মরলেন। এবং বহুদিন পর্যন্ত আত্মগোপন করে রইলেন। আমার বেশ মনে আছে, হঠাৎ মুলতান থেকে তাঁর এক কার্ড এলো, তাতে লেখা ছিল, মুলতানে ভাগ্য পরীক্ষায় লিপ্ত আছি।

পোস্টকার্ড বস্তুটা মরহুম বারী সাহেবের প্রিয় জিযিস ছিল। কেননা খামের তুলনায় এতে খরচ কম ছিল। পত্রাদির জবাব দেওয়ার ব্যাপারে নেহাতই ঢিলা ছিলেন তিনি। আমার বেশ মনে আছে। আমি একবার তাঁকে পর পর বেশ ক'খানা চিঠি দিলাম কিন্তু কোন জবাব পেলাম না। অবশেষে আমি খামের মধ্যে পাঁচ পয়সার দু'খানা টিকেট দিলাম। এবং লিখলাম এবার অবশ্যই উত্তর চাই। উত্তর এলো পোস্টকার্ডে। তাতে লেখা ছিল আমি তোমার টিকিটগুলো বিক্রি করে দিয়েছি এবং সে পয়সা দিয়ে পোস্টকার্ড কিনে তোমাকে লিখছি। তোমার সব চিঠিগুলোই আমি পেয়েছি কিন্তু।

আমার বেশ রাগ হলো। একটুও দেরী না করে লাহোর রওনা দিলাম। ইচ্ছা ছিল বারী সাহেবকে একচোট নেব কিন্তু আমি যখন আরব হোটেলে বসে তাঁর এসব অনাসৃষ্টির কথা পাড়তে যাচ্ছিলাম এমন সময় তিনি লাহোরে আমার ভাগ্য পরীক্ষার প্রশ্ন তুলে বসলেন। অবশেষে তিনি বললেন, বাড়ী গিয়ে সব ঠিক ঠাক করে লাহোর চলে এসো এবং একটা কাগজে চাকরি নিয়ে নাও।

বহুবার আমি বারী সাহেবের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছি এবং কখনো কখনো তাঁর সাথে আমার সম্পর্কচ্ছেদের ক্যমনাও করতাম। কিন্তু বারী সাহেব ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির লোক। তিনি আমাকে একেবারে নিরস্ত্র করে দিতেন তখন। তাঁর গোলগাল চেহারা, শ্যামলা রং, মস্তবড় মাথা, কালো কালো ঠোট সর্ব্বোপরি তাঁর হাসিতে এমন এক অনাবিল আকর্ষণ ছিল যা দেখে কোন লোকই তার মনে হিংসাদ্বেষ রাখতে পারতো না। অন্তত হাসির সময় তিনি ভাগ্যপরীক্ষা করতেন না তাঁর সেই বিশেষ হাসির সময় তাঁর ভাগ্যটাও বোধহয় একবার হেসে নিতো।

বারী সাহেব ভীরু ছিলেন। কসম করে বলছি তাঁর মতো ভীরু সচরাচর হয় না। কখনো বেশী খেয়ে ফেললে ভাবতেন পাছে ভুড়িটা না আবার বেরিয়ে পড়ে অথচ নিরন্ন থাকাকালীনও তাঁর দেহের এ অংশটা বরাবর বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশী জোরে চলতেন না, পাছে আবার তাতে কোন ক্ষতি হয়। দেহের যে অংশটি নিয়ে তিনি ভাবতেন, শেষাবধি সে অংশই তাঁকে বিপদগ্রস্ত করেছে। মহাবিপ্লবের বিরাট বিরাট স্কীম তৈরী করতেন তিনি, কিন্তু হাতের তুড়ি শুনলেই তাঁর চেহারা নীল হয়ে যেতো।

বারী সাহেব একটি মেয়েকে ভালবাসতেন। বাপ-মা টের পেয়ে বিলম্ব না করে বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করে নিল। দিন-তারিখ ঠিক করিলে কি হবে, ওদিকে বারী সাহেব লাপাত্তা। এসময় বারী সাহেব আমার সাথে থাকতেন। কিন্তু বহু ঢু মেরেও তাঁকে খুঁজে বের করা গেল না। অবশেষে তাঁর ভাবী বধূ কেমন করে তাঁর ঠিকানা পেয়ে তাঁকে এক চিঠি লিখল। চিঠিতে লেখা ছিল, আমাকে বিয়ে না করলে আমি তোমাকে খুন করব। বারী সাহেব ঘাবড়ে গেলেন এবং তাঁবে বিয়ে করে নিলেন।

বার্মাতে যে বারে তিনি ভাগ্যান্বেষণের জন্যে গেলেন, তাঁর ভাগ্য-তারকা একটি বার্মিজ মেয়ের ভাগ্য-তারকার সাথে হোঁচট খেল। অনুপায় হয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বার্মাতে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তারপরও বার্মিজ মেয়েটির তারকা তাঁকে নিষ্কৃতি দিল না। অবশেষে যখন যুদ্ধের ঘনঘটা বেজে উঠল তিনি দেশে পালিয়ে এলেন।

বারী সাহেব একেবারে ঘাগু ধরনের লোক ছিলেন। ইকবালের 'খুদী' দর্শনকে তিনি এমনভাবে গায়ে মাথায় মেখে নিলেন যে, সেইটেই তাঁর পরিচ্ছদ, সেইটেই তাঁর বিছানার চাদর। কিন্তু শীতের সময় বুঝতে পারলেন এ চাদরে শীত নিবারণ হয় না। ইকবালের দর্শনের নিরিখে তিনি তাঁর ভাগ্যটাকে একটু ওপরে তুলবার জন্যে যথেষ্ট টানা-হেঁচড়া করেছেন। কিন্তু আল্লা কোনদিন তাঁকে একথা জিজ্ঞেস করেননি যে, হে বান্দা, বল তোমার ইচ্ছা কি? অবশেষে তিনি নিজেই একদিম ইকবালকে এসব জিজ্ঞেস করতে গেলেন যে, এসব আবল-তাবলগুলো কি?

তখন বারী সাহেব রাত করে অফিস থেকে বাড়ী ফিরতেন। প্রেসে শেষ কপিটা দিয়ে মরহুম ইকবালের মাজারে চলে যেতেন। এবং বহুক্ষণ ইকবালের আত্মার সাথে তাঁর খুদী দর্শন নিয়ে বাদ বিসম্বাদ করতেন। তখনকার দিনগুলো ছিল তাঁর বড়ই সংকটপূর্ণ। কখনো বেতন পেতেন, কখনো পেতেন না। পত্রিকার মালিক মনে করতো এরা হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তু। এদেরকে খেতে দিলে শান্ত। না খেতে দিলেও ক্ষতি নেই। বারী সাহেব ছিলেন অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ। ধার কর্জ করে চলতেন। আবার ধার পরিশোধ করার ইচ্ছাও প্রবল ছিল। ইকবালের নির্দেশিত পথে তিনি আত্মসত্তাকে যতটুকু ঊর্ধ্বে তুলতে সক্ষম হয়েছেন একটুও ত্রুটি করেননি। কিন্তু শেষাবধি নিজেকে ওপরে তুলবার আর কোন শক্তিমত্তা ছিল না তাঁর মধ্যে। এজন্যে তিনি ইকবালের মাজারে গিয়ে তাঁর আত্মার কাছে অভিযোগ করে বলতেন, নিজেকে নিঃশেষ করে দিলাম, কই তোমার খুদীর দর্শন তো আমাকে কিছু দিল না! আল্লামা ইকবাল যদি তখন জীবিত থাকতেন তাঁর এসব প্রশ্নাবলী জবাব দিতে ইকবালের বেশ কষ্ট হতো

নিজেকে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই ব্যর্থতার আগুন এতদিনে স্তিমিত হয়ে এসেছে! যদি তিনি ভীরু না হতেন, ইকবালের এই দর্শন নিয়ে সাধারণ জনজীবনেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। কিন্তু এই গভীর অনুসন্ধিৎসা ও পাণ্ডিত্যের মুকুলগুলো তাঁর ভীরু প্রকৃতির কাছে হার মেনে গেছে। জানি না, তাঁর অন্যান্য বন্ধুরা আমার এ মন্তব্যে একমত হবেন কিনা। কিন্তু আমি মনে করি, তিনি যদি সত্যি শক্ত মানুষ হিসেবে নিজেকে টিকিয়ে রাখতেন তাহলে তাঁর ক্ষুরধার কলম থেকে ফরাসী বিপ্লবের অনুরূপ ভারত বিপ্লব জন্ম নিতো।

ইকবালের মতো তিনিও প্রায়শ বলতেন, 'কারে জাহাঁ দরাজ হায়, আব মেরা এন্তেজার কর।' কিন্তু খোদার পক্ষ থেকে এর কোন জবাব আসতো না। আল্লার পক্ষ থেকে যখন তাঁর ডাক এলো তিনি সে দর্শনসম্বদ্ধ চরণটি আর বলতে পারেন নি। ইকবালের মতোই নিবিকার বিদায় নিলেন।

বারী সাহেব খেয়ালী পোলাও পাকাবার বেলায় পয়লা নম্বরের ওস্তাদ ছিলেন। তিনি এমন সব সুস্বাদু পোলাও পাকাবার পরিকল্পনা পেশ করতেন, যা পরিবেশন না করার আগে উপকরণের ফিরিস্তি দেখেই সবাই আপ্লুত হতো। আমার বেশ কনে আছে, 'খালক' দুই সংখ্যা বের করার পর তৃতীয় সংখ্যা বের না করেই তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কিছুকাল কাজ করলেন। কিন্তু তাতেও কোন সুফল না দেখে তিনি 'মোচনা' নামক একটি নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করার পরিকল্পনা নিলেন। পত্রিকার হেডিং কি রকম লাল কালিতে হবে, পাঠকদের মধ্যে তা নিয়ে কেমন আলোড়ন সৃষ্টি করবে, সর্বোপরি পত্রিকার প্রবন্ধগুলো কেমন উন্নত মানের হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি একচোট অলংকারযুক্ত শব্দ দিয়ে আমাদের মোহিত করলেন। তাঁর বর্ণনাগুনে পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

বারী সাহেব আর একবার সাংবাদিকতার ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন এবং সব কিছু বাদ দিয়ে ঘাস কাটার একটা মেশিন বসাবার পরিকল্পনা নিলেন। খেয়ে পরে জীবনটা বেশ চলবে। এই নতুন পেশার

আলোকে জীবনটা কেমন বারী সাহেব তা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন এবং আমাকেও সে বিষয়ে প্রভাবিত করলেন।

আমি তখন অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে চাকরি নিয়েছি। এখানে এসে আমি জার্ণলিস্ট নামে একখানি বেতার নাটিকা লিখে তা অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে প্রচার করলাম। এই নাটিকার কেন্দ্রীয় চরিত্রটির নাম ছিল বারী সাহেব। নাটিকাটি প্রচার করার পরই দেশময় একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। ভারতের প্রায় প্রত্যেক উর্দু পত্রিকাই এই নাটকের বিরূপ সমালোচনা দু'চার কথা লিখলেন। এতে নাকি সংবাদপত্র মালিকদেরকে বিশ্রীভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যেসব সাংবাদিকদের করুণ জীবনালেখ্য এতে চিহ্নিত করা হয়েছিল তাঁদেরকে দিয়েই পত্রিকা মালিকরা এ সব সমালোচনা লিখিয়েছে।

এখানে সে নাটকটির কিয়ংদশ তুলে দেয়া হলো। সাংবাদিক বারী সাহেব সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়ে ঘাস কাটার মেশিন বসিয়েছেন। আজকাল তাঁর জীবনটা বেশ আরামেই কাটছে। এবার তাঁর নিজের সংলাপ শুনুন ঃ

বারী ঃ রোজ দেড় দু'টাকা আমদানী হচ্ছে! পুরো দিনটা দোকানেই কাটিয়ে দিই। সন্ধ্যার দিকে ঠিকা কাজে চলে যাই। দেদার গাল গল্প এবং হাসি-ঠাট্টা চলে। তারপর রাতের দিকে ঝিমুতে ঝিমুতে ডেরায় ফিরে আসি ; এখানে খবরও তর্জমা করতে হয় না, কপিও দিতে হয় না—টেলিফোনের উপদ্রব নেই এখানে, চিঠিপত্রেরও তাড়া নেই—লেখক সাংবাদিকদের নিয়েও ঝকমারী করতে হয় না।' আমার বন্ধু আমাকে কি ফন্দিটাই না দিয়েছিল। শীতের সময় ঘাসের কাছেই চারপেয়েটা পেতে নোব—বাহ, খাসা জীবন। আমার মতে সকল সাংবাদিক খবরের কাগজে কলম পিষে তাদের জীবনটা বরবাদ করছেন। আমি তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি যেন প্রতি শহরে তাঁরা আমার মতো ঘাসের মেশিন বসিয়ে নেন এবং পরামর্শের জন্যে আমাকে দোয়া করেন।

জীবনটা ভালই চলছিল! ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। মহাযুদ্ধের খবরটা বারী সাহেব তাড়িখানায় বসে পেলেন।। মনের সুপ্ত সাংবাদিক সত্তা হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো তাঁর। সব

কিছু তার কাছে খারাপ লাগছিল। চার দিকের অন্যান্য মাতালদের বক বকানি শুনে তার মেজাজটা খিচড়ে উঠে এবং হঠাৎ চীৎকার করে উঠে তিনি বলেন—'খামোশ—তোমরা এসব কি আজে বাজে বকছ? সত্যি তোমাদের মতো মূর্খ আর হয় না। ইউরোপে একটা মস্তবড় যুদ্ধ দানা বেঁধে উঠেছে। সারা বিশ্বকে তা পদদলিত করবে। লাখো কোটি মানুষ নিহত হবে। দুনিয়াতে একটা প্রলয় বিষাণ বেজে উঠবে। আর তোমরা এখানে বসে আজেবাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছ। তোমাদের হলো কি?

১ম মাতাল ঃ ও কি সব সব বলছে?'

২য় মাতাল ঃ (অট্ট হাসি) আমি তো কিছুই বুঝলাম না। ও বারী আজকাল এসব কি ছাই পাশ বলছিস তুই?

১ম মাতাল ঃ ও কিছু না। পরিণামে একটু বেশী পান করে ফেলেছে।

২য় মাতাল ঃ ও তাই বলো।

বারী ঃ তোমরা অযথা বকবক করছ। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। তোমরাই বরং মাতাল হয়ে আছ। আমি যা ভাবছি তোমাদের মাথা মুণ্ডের কাছেও তা নেই।

১ম মাতাল ঃ ওরে বাবা বারী দেখছি মৌলবী সেজেছে।

বারী ঃ আমার কথা শুনে তোমরা হেসো না। অবশ্য এটা তোমাদের দোষ নয়। এটা আমারই অপরাধ। আমি এযাবৎ তোমাদের কাছে আমার নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে রেখেছিলাম তোমরা আমাকে চেন না। রাজনীতির জগতে আমার কত দাম তা আমি বেশ জানি।

১ম মাতাল ঃ মানলাম, তুমি মস্ত পালোয়ান। কিন্তু এখন একটু চুপ করলেই বাঁচি।

বারী ঃ তোমরা যত দিন না আমার আসল পরিচয় পাবে ততদিন আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করবে। জান আমি কে? আমার নাম আবদুল বারী। 'দৈনিক খালক' এর সম্পাদক মওলানা আবদুল বারী।

মরহুম বারী সাহেব শেষাবধি সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এবং তার পরিকল্পনানুযায়ী ঘাস কাটার মেশিন পেতে দিয়েছিলেন। তার ঘাস কাটার মেশিনটাও যেন ইংরেজ সরকারের মালিকানায় ছিল। শেষ

বয়েসে তিনি বৃটিশ ইনফরমেশন বিভাগে চাকুরী নিয়েছিলেন। লোকেরা তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতো। কেননা, সারা জীবন ইংরেজকে গালি-গালাজ করে শেষে কিনা ইংরেজের চাকুরীই নিলেন তিনি। লোকদের হাসি মস্করা শুনে হয়ত তিনি তখন মনে মনে বলেছেন, তোমরা যতদিন পর্য্যন্ত আমার আসল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত না হবে, ততদিন আমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে এতে আর বিচিত্র কি? অবশ্য এটা তোমাদের অপরাধ নয় আমি নিজেকে তোমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছি।

বারী সাহেব সম্পর্কে আমার আরও সুস্পষ্ট মন্তব্য হলো, তিনি সর্বক্ষণ নিজের এবং সমাজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতেন। পালাবার পথেও তিনি প্রতি পদক্ষেপ অত্যন্ত সন্তর্পণে ফেলতেন। তার এই পালিয়ে বেড়ানোর দরুন লোকরা তাকে চিনতে পারেনি, এতে লোকদের কোন দোষ ছিলনা সর্ব্বতোভাবে দোষ ছিল তার নিজের। তিনি দিগন্তপ্রসারী দুস্তর পারবার অতিক্রম করার জন্মে যাত্রা শুরু করতেন কিন্তু চলতে গিয়ে তার পা অন্যদিকে মোড় নিতো। এবং এসব তার অবচেতন মন থেকে সংঘটিত হতো।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে প্রচারিত 'সাংবাদিক' নাটকে বারী চরিত্রের অন্য একটি সংলাপ শুনুনঃ

বারী ঃ প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মধ্যযুদ্ধের মধ্যবর্তী ঘটনাবলী যদি আমরা পর্য্যালোচনা করি, তাহলে এটা ভেবে খুবই দুঃখ অনুভব করি যে, সভ্যতার জগৎ কলঙ্কের অন্ধকূপে নিমজ্জিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতি চরমে উঠেছে। কিন্তু আদর্শ এবং নীতিগত শিক্ষা কমে এসেছে। মানুষ সভ্যতার আদি যুগেই রয়ে গেছে। বর্ণ, ধর্ম্ম, এবং গোত্রগত বৈষম্য নিয়ে মানুষের মধ্যে হানাহানি চলেছে। আমি জিজ্ঞেস করছি, আমাদের সভ্য জগৎ ক্রমাগত কোন দিকে যাচ্ছে? মানুষের দেহের রক্ত শেষাবধি পানির চেয়েও সস্তা দামে বিকাবে দেখছি। কদিন পর মানুষের মাংস অন্যান্য জানোয়ারের মত বাজারেও বিকাবে। দুনিয়াতে কি হচ্ছে এ সব? আপনারাই বলুন, এসব কি অনাসৃষ্টি হচ্ছে? আদর্শচ্যুত সমাজ মানুষের মধ্যে শত শত গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছে। মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে,

জাতি জাতির বিরুদ্ধে, দেশ দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করছে, মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের এই হলো আসল চিত্র।

এসব মতবাদ বার্ট্রাণ্ড রাসেলের। কিন্তু আমি বারী সাহেবের মুখ থেকে তা বের করেছি বারী সাহেব ও রাসেল এর চেয়ে কোন অংশে কম যান না এইটেই বুঝাতে চেয়েছি আমি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এমন এক দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন যেখানে মানুষের প্রতিভা বিকশিত হতে পারেনা। এদেশের সংবাদপত্র মালিকদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি একবার এক মালিকের উদ্দেশে বলেছিলেন—'আপনি জাতির সেবা করে থাকেন। আমিও জাতি এবং সংবাদপত্রের সেবা করে থাকি। কিন্তু এই সেবার প্রতিদান আমি কোন দিনই সঠিক সময়ে পাই না। সঠিক সময়ে কেন, পাই না বললেই ঠিক হয়। চার মাসে আপনি আমাকে মাত্র ষোল টাকা দিয়েছেন। ওপরে আল্লা আছেন। আমি মানুষ, আমি কোন জড়পদার্থ নই। আমার ক্ষুধা আছে, পিপাসা আছে। এক আধটু মিষ্টি খেতেও ইচ্ছা করে বৈকি। আপনি আমাকে পত্রিকার সম্পাদক বানিয়েছেন। সাধু সন্ন্যাসী তো নই যে, ভোগ বিলাস বলতে কোন কিছু নেই আমার।' চারমাসে মাত্র ষোল টাকা। বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে আসলে কিন্তু সত্যি। তখন তিনি দৈনিক এহসান এ কাজ করতেন। পয়সায় কুলাতো না বলে অফিসের বাড়তি কাগজপত্র এবং সরঞ্জাম ইত্যাদি চুরি করে বিক্রি করে নিজের বাজার খরচ চালাতেন। তখন রাজা মেহদী আলী খানও এই পত্রিকায় কাজ করতেন। বারী সাহেব দেখলেন অফিসের কাগজ পত্র বিক্রি করে বাড়তি আয়টা মোটামুটি মন্দ যায় না। তিনি রাজা মেহদী আলীকেও এ ফন্দিটা বাতলে দিলেন। এব্যাপারে বারী সাহেব বরাবর মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। কিন্তু রাজা এ ব্যাপারে চরমপন্থী। রাজা রীতিমত বাণ্ডিল বাণ্ডিল চুরি করতে লাগলো।

এসব ডাকাতি দেখে বারী সাহেব ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু করা কি এপথটা বারী সাহেবই তাকে দেখিয়েছেন যে। এরপর রাজা একদিন বড় বড় টুকরী এবং কুলি নিয়ে হাজির হলো বারী সাহেব পাহাড়া দিতে লাগিলেন আর রাজা টুকরী ভরতে লাগলো। রাজা বলল, সেদিন আমরা দুজনে মিলে সিনেমা দেখেছিলাম।

রাজা মেহেদী আলী আমাকে জানালো বারী সাহেবকে নিয়ে একবার সে বাজারে ভিক্ষাও করেছিল। স্কীমটা ছিল বারী সাহেবের। লোকেরা যেন দয়াপরবশ হয়ে ভিক্ষা দিতে আকৃষ্ট হয় এজন্য চেহারা কেমন করে মেকআপ করতে হবে এবং নিরন্তর কি বলে ঘ্যান ঘ্যান করতে হবে সব পরিকল্পনা ছিল বারী সাহেবের। কিন্তু যথা সময় বারী সাহেবকে দিয়ে কোন কাজ হলোনা। হিসাব কষে দেখা গেল বারী সাহেব মাত্র দুই তিন আনা উপার্জন করেছেন। পক্ষান্তরে রাজা মেহদী আলী খান পৌনে তিন টাকা রোজগার করেছে।

রাজা মেহদী আলী খান কেমন করে ভিক্ষা করতো এসম্পর্কে একটি চমকপ্রদ কথা এখানে না বলে পারছি না।

সম্ভবতঃ রাজা সেদিন আনারকলিতে ভিক্ষা করছিল। সামনে দিয়ে একজনকে বিরাট মহাজন গোছের লোক একটা বিরাট ঝুড়ি মাথায় নিয়ে আসছিল। রাজা ভাবল, লোকটার গাঁটে আলবৎ অনেক পয়সাকড়ি রয়েছে। রাজা লোকটির পিছু নিলো। যথাস্থানে লোকটির মাথায় বোঝা নামানোর ব্যাপারে রাজা লোকটির সাহায্য করে অতঃপর হাত পেতে বলল, 'বাবা গরীবকে সাহায্য করুন—দু'দিন ধরে উপোস করছি।'

মহাজন লোকটি গাঁট থেকে একটা কৌটা বের করে খুললেন। ডিব্বাতে বহু টাকার নোট দেখতে পেলো সে। রাজা ভেবেছিল কমপক্ষে একটাকা খসানো যাবে তার কাছ থেকে। কিন্তু লোকটি শেষাবধি মাত্র একটি পয়সা রাজার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও, এবার বোঝাটা আবার তুলে দাও বাপু।'

বারী সাহেব এবং হাসান আব্বাস সম্পর্কে আমি এও জানি, ক্ষুধার তাড়নায় তারা একবার এক ফলের দোকানে কলাও নানা ফলমূল চুরি করে খেয়েছিল। ফলের দোকানের পাশের কামরাটিতেই তারা দুজনে থাকতো, রুমটিতে বিজলী বাতি পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু বারী সাহেব হাসান আব্বাসকে গোপনে বিজলী চুরি করার ফন্দি বাতলে দিয়েছিলো। মিউনিসিপ্যালিটির লাইন থেকে তারা নিজেদের কামরায় লাইন চুরি করে এনে বাতি লাগিয়েছিল।

এবার আরো একটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ঘটনাটি সে কামরাটি কেন্দ্র করেই। আমি তখন সাতবছর বোম্বেতে থেকে সবে অমৃতসরে ফিরেছি। ষ্টেশনেই হাসান আব্বাসের সাথে আমার দেখা হয়ে গেল। এসময় মদের ওপর কোনরূপ কড়াকড়ি ছিলনা। পুরনো টায়ারের ভেতরে পূরে তা দেদার বিক্রি হতো। হাসান আব্বাসের সাথে বহুদিন পর দেখা। এজন্যে সিদ্ধান্ত করলাম, পরদিন ভোর থেকেই আমরা শুরু করে দোব। যাতে করে আমাদের পূর্ব্ব সম্পর্কের আবেগটা তাজা থাকে। একথা বলেই আমি আমার মনের চাবিটি জনিওয়াকার এর হাতে ন্যস্ত করে দিলাম।

ভেবেছিলাম, বারী সাহেবও ষ্টেশনেই রয়েছেন। কিন্তু হাসান আব্বাস বলল, তার মতো বাজে লোক আর হয় না। কোথায় যে ডুব মেরে বসে আছে তার কোন পাত্তা নেই। আমি টাংগা গাড়ি দিয়ে চারিদিকে খোঁজাখুজি করলাম। বহু কষ্টে শেষাবধি তাকে পেয়ে গেলাম।

আমাকে দেখেই তারা একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। এত মদের ছড়াছড়ি দেখে তারা সব কিছু বাঁধাছাদা শুরু করে দিয়োছিলে। কিন্তু আমি একচোট বকাঝকা করলাম এবং পুরনো বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে বললাম, তোমাদের মতো হারামজাদা আর হয় না।

কিন্তু বারী সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো সম্ভবতঃ এসময় আবু সাঈদ কোরেশী বি, এ-কে কুপোকাৎ করার জন্যেই তিনি পায়চায়ী করছেন অথবা কুপোকাৎ করে ফেলেছেন।

তাদের সেই পুরনো কামরাটিতে আমরা সবাই বসেছিলাম। আমি, বারী সাহেব আবু সাঈদ কোরেশী, হাসান আব্বাস ও আবদুল্লা মালীক। এর কিছুক্ষণ পর রাজেন্দ্র সিং বেদী এসেও উপস্থিত হলো।

বারী সাহেব অপেক্ষাকৃত শুচীবাইগ্রস্থ ছিলেন। যেখানেই বসতেন, তার চারদিকের জায়গাটা যথাসাধ্য ঝেড়েমুছে পরিস্কার করে নিতেন। আপাততঃ সাজগোছ প্রসাধন ইত্যাদির জন্যে তার হাতের কাছে মোটামোটি কিছু উপকরণ থাকতো। এসব দেখলে কখনো বারী সাহেবকে শিশু বলে মনে হতো। নখ কাটার জন্যে একখানি ছোট কাঁচি। বই পুস্তকের ওপরে খবরের কাগজ মোড়ানো এবং তার ওপরে রয়েছে সুই সুতা।

কাঁচিটা বারী সাহেবের অতি প্রিয় জিনিস ছিল। কাঁচি দিয়ে বসে বসে কেটে ছোট ছোট ছবি জমা করতেন, সম্ভবতঃ নিউজ এডিট করার সময় থেকে হাতের কাছে কাচি রাখা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অমৃতসরের মাসাওয়াতের অফিসে বসে তিনি যখন কাচি হাতে নিউজ কেটে জোড়া দিতে বসতেন, মনে হতো এমন মজাদার কাজ তার কাছে পৃথিবীতে আর কোনটি নেই।

বারী সাহেবের টেবিল দেয়ালের সাথে লাগানো থাকতো। লিখতে বসলে যেন দেয়ালটা ঠিক সামনে থাকে। লেখার সময় তার সামনে কোন আড়াল বা প্রতিবন্ধকতা রাখার অভ্যেস ছিল তার। আমার বেশ মনে আছে, আমি একবার আমার কামরার টেবিল অন্যভাবে স্থাপন করেছিলাম। অথচ বারী সাহেব কি যেন লিখবেন বলে মনস্থ করেছেন। চেয়ারে বসতেই তার মধ্যে কেমন অস্থৈর্য্য পরিলক্ষিত হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অমন করছেন কেন? জবাবে জানালেন, আমার দৃষ্টির সামনে কোন আড়াল আবডাল না থাকলে আমি লিখতে পারি না। একথা বলেই একটা বিশ্বের মানচিত্র তুলে এনে তার সামনে টানিয়ে নিলেন।

এই দেখুন, কথা কোত্থেকে কোথায় এসে গেছে। কি করব, কথায় কথা এসে যায়। পুরনো আনারকলির সেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠের কথা বলতে বলতে কোথায় এসেছি। ধান ভানতে শিবের গীত আর কি। কিন্তু আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন বলে আশা রাখি। যে কথাই মনে আসে লিখে ফেলা উচিত। পাছে আবার কোন কথা ভুলে যাই। আমি এ মুহূর্তে যখন বারী সাহেবকে কল্পনার চোখে লিখতে দেখলাম, চেয়ে দেখি তিনি দাঁত কাটছেন। এটা তার বরাবরের অভ্যাস। লেখার সময় তিনি প্রায়শঃ দাঁতে দাঁত চাপেন, দেখে মনে হয় তিনি রেগে গেছেন। গোল গোল করে ছোট ছোট অক্ষর সাজিয়ে লিখতেন। অক্ষরগুলোকে গোল করতে গিয়ে এমন গোল করে ফেলেন যে, কোন কোন সময় তার পাঠোদ্ধার করতে কষ্টকর হয়ে পড়ে।

আনারকলির সেই পুরনো ঐতিহাসিক কামরায় বারী সাহেবের লেখার টেবিলের দেয়ালে একটি ঐতিহাসিক গ্রুফ ফটোও ছিল। এতে

আব্বাস, আমি, বারী সাহেব ও আবু সাঈদ কোরেশী ছিলাম। বারী সাহেব সম্ভবতঃ এ ছবির নিচে ছোট করে লিখেছিলেন 'অমৃতসর স্কুল অব থট'। এ গ্রুপ ছবিটি বারী সাহেবের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মিলাপ বা প্রতাপ অফিসে কাজ করার সময় গায়ের কোট খুটির সাথে লটকে রেখে বারী সাহেব সিগারেট আনতে গিয়ে একবার বর্মা গিয়ে পৌঁছলেন, তখনও তার সাথে এ ছবি খানা ছিল।

আমি সর্বপ্রথম যখন বারী সাহেবের ও আব্বাসের এ কামরাটীতে প্রবেশ করেছিলাম, প্রথমেই বারী সাহেব আমাকে ফটোটি দেখিয়ে উৎফুল্ল শিশুর মতো নেচে উঠেছিলেন। আমি কিছুই বললাম না। একগাল হাসিতে তার চোখ দুটো জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল।

মরহুম বারী সাহেব আমাকে যারপর নাই ভালো বাসতেন। তিনি আমাকে নিয়ে গর্ববোধ করতেন। অবশ্য তিনি আমার সামনে কখনো তা প্রকাশ করতেন না। সম্ভবতঃ তিনি লোকদের কাছে বলে বেড়াতেন যে, আমি মাণ্টোকে তৈরী করেছি। সত্যি বলতে কি, সাহিত্য চর্চার জগতে বারী সাহেবই আমাকে প্রবেশ করিয়েছেন। যদি অমৃতস্বরে তার সাথে আমার দেখা না হতো তাহলে আমি নেহাতই অখ্যাত অজ্ঞাত ব্যক্তি হিসেবে জীবনপাত করতাম। সম্ভবতঃ তখন চুরি ডাকাতি করে জীবিকার্জন করতাম।

বারী সাহেবের ভাষায়, আব্বাস এবং আমার মতো মাতাল নাকি হয় না। মদ পান করার ব্যাপারে আমরা কেউ কারো চেয়ে কম যেতাম না। বরাবর আবু সাঈদ চৌধুরীই মদের বোতলের কর্ক খুলতো। তার পর দেদার শুরু হয়ে যেতো। মদ পান করার পর বারী সাহেবের চেহারাটা বেশ চমকপ্রদ হয়ে উঠতো। বারী সাহেবকে দেখে মনে হতো তিনি কাপড়ের বদলে তৃণপত্র পরেছেন এবং চেয়ারে বসার বদলে কোরান শরীফ রাখার রেহালে বসে আছেন। কিন্তু এক গ্লাস পান করার পরই তার অবয়ব সম্পূর্ণ পালটে যেতো। তখন তাকে একটা আস্ত ভাঁড় মনে হতো? তখন ইচ্ছা হতো বারী সাহেব বলুক আর আমরা শুনি। বলা বাহুল্য সে সময় বারী সাহেব আর কাউকে বলতেই দেন না।

রাজেন্দ্র সিং বেদী রুশ উপন্যাস 'এণ্ড কুয়েট ফ্লোজ দি ডোন' সম্পর্কে আলাপ সালাপ করছিলেন। এ উপন্যাসটি আমরা কেহই পড়িনি। কিন্তু বেদী এমন ভঙ্গীতে আলাপ শুরু করে দিয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকেও নাক গলিয়ে বলতে হলো যে, আমিও ওটা পড়েছি। বেদী একটু থতমত খেয়ে গেল। বারী সাহেবকে আর বাধে কে। তিনি উপন্যাসের লেখক সলোখোফ সম্পর্কে এক বিরাট বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। ফলে, বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্বেও বেদীকে বারী সাহেবের বক্তব্য মেনে নিতে হলো এবং স্বীকার করতে হলো যে, আদপেই বেদী সলোখোফের উপন্যাসটি পড়েনি। শুনে বারী সাহেব খুব করে হাসলেন। অবশেষে উপস্থিত সকলকে এক বিশেষ ভঙ্গীতে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, সলোখোফ নামক উক্ত লেখকের নামটি তিনি এইমাত্র বেদীর মুখেই শুনতে পেলেন। এ সম্পর্কে তিনি যে বক্তৃতা ঝাড়লেন তা সম্পূর্ণ তার কল্পনা-প্রসূত। রাজেন্দ্রসিং বেদীর কোথাও যাবার তাড়া ছিল। এজন্যে সে তাড়াতাড়ি অনুমতি চেয়ে কেটে পড়লো।

সম্ভবতঃ ডিসেম্বর মাস ছিল। তখন বাইরে হাড়কাঁপানো শীত। আমি যেহেতু বেশকিছু সময় বাইরে ছিলাম, শীতের তীব্রতা আমিই বেশী অনুভব করছিলাম। বারী সাহেব ত্বরা করে বাইরে গিয়ে কিছু কাঠখড় কুড়িয়ে নিয়ে এলেন। এরপর তিনি জনি ওয়াকার-এর বোতল খুলে কাঠখড়ের ওপর ছিটিয়ে দিয়ে জরথস্ত্র জরথস্ত্র নাম জপে উঠলো। আমি দিয়াশলাই জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দিলাম। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতেই দেখলাম বারী সাহেব সেজদায় পড়ে আছেন।

সেজদা দেখেই আমার মনে পড়ে গেল যে, বারী সাহেব আবার সেজদা করার বেলায় বেশ পারদর্শী। এমন এককাল ছিল যখন বারী সাহেব অমৃতসরে পাঁচ বেলার বদলে আট দশ বেলা নামাজ পড়তেন। সেকালে আমরা যেখানে বসতাম, তিনি সেটার নাম দিয়েছিলেন 'দারুল আহমার'। আমাদের বাড়ীতে যখনি তার নামাজের দরকার হতো বিবিজানকে (আমার মরহুমা জননী) ডাক দিতেন এবং এক লোটা পানি ও জায়নামাজ চেয়ে নিতেন। এতো গেল তার ধর্মগত ব্যাপার। কিন্তু যখনি তিনি কোন অপরাধ করে বসতেন এবং আমি ও আব্বাস কৈফিয়ত

তলব করে বসতাম, তিনি স্বচ্ছন্দে কান দুটো মলে নিয়ে এক দু'বার ছহু সেজদা করে ফেলতেন।

প্রসঙ্গক্রমে আমারও এক সেজদার কথা মনে পড়ে গেল। ভাবতে এখনো আমার গা রি রি করে উঠে। তাও অমৃতসরেরই ঘটনা। আমি মদ পান করব এটা বারী সাহেব পছন্দ করতেন না। এক সন্ধ্যায় তিনি আমার সাথে ছিলেন। পায়চারী করতে করতে রেলওয়ের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে যেয়ে পৌঁছলাম। আমি বেয়ারাকে বললাম আমার জন্যে এক পেগ জিন মেশানো জিঞ্জার নিয়ে আসো।

বারী সাহেবের একটা না একটা অসুবিধা, বিশেষ করে পেটের ব্যামো লেগেই থাকতো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন অসুবিধা হবে না তো? বললেন, না, না, আমার পেটে অসুবিধা আছে।

বারী সাহেব যে কোন ব্যাপারে অটল ছিলেন না। যেন তেন একটা লেকচার দিলেই তাকে রাজী করানো যেতো। অতএব আমি এই পানীয়ের গুণ বর্ণনায় অবতীর্ণ হলাম। বললাম, জিঞ্জার আপনার পাকস্থলীর সকল অসুবিধা দূর করে দেবে। অবশেষে তিনি রাজী হলেন। বেয়ারা হুইস্কির বোতল এবং জিঞ্জার এনে সামনে রাখলো। আমি হুইস্কি নিঃশেষ করে দেখলাম জিঞ্জার পান করে বারী সাহেবের মেজাজ ফিরে এসেছে। আমি আর এক পেগ হুইস্কির অর্ডার দিতেই বারী সাহেব আরো জিঞ্জার আনতে বললেন।

বারী সাহেব বেশ উৎফুল্ল হয়ে বললেন, এসব পানীয়ের মধ্যে যে উপকার রয়েছে আমারও তা জানা আছে। আমি কোন এক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বইতে পড়েছিলাম যেন এটা। সকাল থেকে আমার যে বিতিকিচ্ছা ভাবটা ছিল সম্পূর্ণ কেটে গেছে।

আমি হেসে উঠলাম। অবশেষে আমি তাকে জানালাম যে মস্ত বড় একটা ধোকা দিলাম। শুনে তিনি ক্ষেপে উঠলেন। আমার এই ধৃষ্টতা তিনি ক্ষমা করেছিলেন বটে, কিন্তু মনে হলো মানসিক দিক থেকে তিনি বেশ কাবু হয়ে পড়েছেন। আমি বাধ্য হয়ে কায়মনোবাক্যে শপথ করলাম যে, আমি আর কখনো নিজে মদপান করবো না। বেয়ারা বিল

নিয়ে আসতেই বারী সাহেব তার উপরে পেন্সিল দিয়ে লিখলেন, ইয়ারব দর দিনে সিনায়ে দিলে বাখবর বিদা।

এঘটনা আমার মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার স্বষ্টি করল। বেশ মনে আছে, রাত্রে বাড়ী ফিরবার সময় গলি পথে নতজানু হয়ে সেজদা করে বললাম, হে প্রভু, আমি এই প্রতিজ্ঞায় যেন অটল থাকতে পারি। আর আমি যে পাপ করেছি তা আমাকে ক্ষমা করে দাও।

এই সেজদার দরুণ মনটা আমার বেশ হালকা হয়ে গেল। কিন্তু অপর একটি মানসিক অশান্তি দেখা দিল। তা হলো মদ পান না করতে পারার দুঃখ। কিছু দিন গত হলো। উদাসভাবে আমার দিনমান কাটতো। তবে একথা ভেবে আমি মনে শান্তি পেতাম যে, আমার প্রতিজ্ঞার ওপর আমি অটল থাকতে পেরেছি। এবং একটি খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করছি!

একদিন সন্ধ্যায় বারী সাহেব এলেন। আমি জানালার কাছে বসেছিলাম। তিনি বাইরের গলিতে দাঁড়িয়েই আমার কুশল জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি বললাম, বেশ আছি আর জিজ্ঞেস করতে হবে না।

বারী সাহেব এক মূহুর্তে কি যেন ভাবলেন এবং বললেন, এই আমি এক্ষুণি আসছি।

ফিরে আসতেই দেখলাম, বারী সাহেবের কাপড়ে জড়ানো মদের বোতল। আমার আপত্তির দিকে কোন রকম দৃকপাত না করেই তিনি বোতলের মুখ খুললেন। ইতিমধ্যে আব্বাস এসে উপস্থিত হলো। বারী সাহেবের কথা মতো সবদিকের দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। ভেতর থেকে রুটি আনিয়ে নিলাম। কিন্তু কেহই তা স্পর্শ করল না। কিছু তরকারী আনানো হয়েছিল। তাও কেউ স্পর্শ করল না। আব্বাস বাইরের কূপ থেকে লোটা ভর্তি করে পানি আনল। আমরা তিনজনে তা পান করলাম। সে নিরব রাতে অন্ধকার গলিতে আমি যে সেজদা করেছিলাম, আমার ললাট প্রান্তে তা ভীতি হয়ে থর থর করে কাঁপছিল।

আমরা সবাই পান করছিলাম। বারী সাহেবকে উত্তেজিত করার জন্যে আব্বাস বলল' 'এ বাড়ীতে আপনাকে সম্মানের চোখে দেখেন।

বিবিজান আপনাকে নামাজী মানুষ বলে শ্রদ্ধা করেন। তিনি যদি হঠাৎ করে এখানে এসে পড়েন আপনার কি উপায় হবে।

বারী সাহেব বললেন, আমি তাহলে জানালা দিয়ে পালিয়ে যাব এবং আর কোনদিন তাকে মুখ দেখাব না।

বারী সাহেব সব সময়ই তার জীবনের কোন না কোন জানালা দিয়ে পালিয়ে বেড়াতেন। এবং আর কখনো সেই জানলা পথে নিজের চেহারা দেখাতেন না।

জানালা খুলে বাইরে পালিয়ে যাবার কথা বলে আমি শুধু রস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিনা। আসল কথা হলো ইংরেজরা যে নিয়ম নীতির প্রবর্তন করেছে তার কল্যাণে মরহুম বারী সাহেব আংগুল চুষতে গিয়ে কলম এবং চুষতে গিয়ে নিজের রক্ত চুষিয়ে নেবার সকল সোপান শ্রেণী অতিক্রম করেছেন। অতঃপর রেডিও পাকিস্তানে সোচ্চারিত ইকবালের 'তেগুকে ছায়েমে' (খঞ্জরের ছায়ার নীচে) নিরিখে নিজের জীবনের সকল অস্পষ্টতা এবং অন্ধকারকে দুর করার জন্যে জীবনের জানালা গুলো সর্বদা উন্মুক্ত রেখেছেন তিনি। সামান্য ইচ্ছার বশবর্তী হলেই তার জানালাগুলো তাকে বাইরে গলিয়ে দেওয়ার জন্য সাহায্য করতো।

এই দেখুন আবার কোথায় এসে পড়েছি। হ্যাঁ যা বলছিলাম—পুরনো আনার কলির সেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে শীতের কনকনে রাতে আমরা পান করছিলাম। বারী সাহেব কিছুক্ষণ পর পরই বাইরে যেতেন এবং এবং আগুনের ইন্ধনের জন্যে কাঠখড় নিয়ে আসতেন। বহুদিন পরে আমাদের দেখা, এজন্যে কি ভাবে কোন দিক দিয়ে সময় চলে যাচ্ছিল তার কোন রকম খেয়াল ছিল না আমাদের। বারী সাহেব আগুনের ইন্ধনের জন্যে কতবার বাইরে গিয়েছেন তাও বলতে পারবো না। তবে সকাল বেলা যখন বাইরে বেরুলাম দেখলাম বাজারের কাছে লাকড়ির যে জাংলাটা ছিল তার আর কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

আব্বাস বারী সাহেবকে ভয় দেখাবার জন্যে বলল, বাড়ীর মালিক যদি জানতে পারে যে, তার কাঠগুলো আমরাই পুড়িয়ে শেষ করেছি তাহলে কান ধরে আমাদেরকে বের কয়ে দেবে। একথা শুনে বারী সাহেবের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। বারী সাহেবের এ অবস্থ দেখে

কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাতে বারী সাহেবের কোন ভাবান্তর হলোনা। অবশেষে আব্বাস আশ্বাস দিয়ে বলল; 'বাড়ীর মালিক জানবার আগেই আমরা কেটে পড়বো।'

কিন্তু বিপদ হচ্ছে কেটে পড়ার পূর্বে বারী সাহেব ছাড়া আর সবাই জেনে ফেলতো ব্যাপারটা। যখন মিলাপ বা প্রতাপের অফিসের চেয়ারের খুঁটিতে কোট ঝুলিয়ে রেখে সিগারেট আনবার জন্যে বাইরে এসে বার্মা গিয়ে পৌঁছলেন তখন তিনি ভেবেছিলেন, ঘুনাক্ষরেও কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু যারা বুঝতো তারা বিলক্ষণ জানতো তিনি কোথায় চলেছেন।

বারী সাহেব ছোট বড় সকল শহরে তার ভাগ্য তারকার গবেষণা করেছেন। কিন্তু ঘুরে ফিরে শেষাবধি তাকে লাহোরে ফিরে আসতে হয়েছে। এখানে এসে কিছুকাল আরব হোটেলে এবং অতঃপর 'নাগিনা বেকারীতে সকল তল্পিতল্পা সহ এসে উঠেছিলেন। এখানেও অসংখ্য ভাগ্য তারকার গবেষণ-কারীদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে।

বারী সাহেব কথার বাদশা ছিলেন। দারুল আহমারে যখন অলি আল্লা (তিনি নরম বালিশ, কুশন ও আরামপ্রদ শোফাকে অলি আল্লা বলতেন) হেলান দিয়ে বসতেন তখন রসালো কথার তুবড়ি ছুটতো তাঁর কণ্ঠ থেকে। সেকালে সুরুরও (আফাকের সম্পাদক) মাঝে মধ্যে আসতেন সেখানে। আমার প্রতি তিনি বিশেষ মনযোগী ছিলেন। বারী সাহেবের মতো তিনিও আমার প্রশংসা করে বলতেন কালে এই ছেলে বড় লেখক হবে।

অমৃতসর সম্পর্কে আরো একটি মজার কথা মনে পড়ে গেল আমার। আমি বারী সাহেব আর হাসান আব্বাস কোন সময়ই আমাদের মজলিশে অন্য কারো প্রবেশধিকার পছন্দ করতাম না। কমরেড ফিরুজউদ্দিন মনসুরকে আমরা সবাই সালাম আদাব করতাম। তিনিও মাঝে মধ্যে আমাদের মজলিসে আসতেন। কিন্তু তার উপস্থিতি আমরা সবাই অপছন্দ করতাম। বারী সাহেব রসিকতা করে কথা বলতেন। পটশিয়াম প্রেগনেট দিয়ে বোমা তৈরী করতেন বলে আব্বাস তাকে ফ্রডউদ্দিন মনসুর বলতো। প্রথমতো আমরা তাকে কোনমতে সহ্য করে নিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বারী সাহেব একটা পন্থা আবিস্কার করলেন।

কমরেড সাহেব আসতেই বারী সাহেব আব্বাসকে চোখ মেরে ইশারা করে বললেন, আরে খাজা সাহেব আবার দেরী হয়ে যাবে নাতো? বলেই তিনি উঠে দরজা জানালা বন্ধ করতেন।

কমরেড সাহেব বসবার উদ্যোগ করছিলেন। কিন্তু শেষাবোধি আমাদের রেখে রওয়ানা হতে হলো। বাজারের কাছে এসে বারী সাহেব তার কাছে অন্যত্র যাবার জন্যে অনুমতি চাইলেন এবং বাজারে এক চক্কর ঘুরে আবার দারুল আহমারে ফিরে এলেন। এ কাণ্ডের পর বারী সাহেব খুব করে একচোট হাসলেন।

বারী সাহেব ছোটখাট কথাতেও খুশীতে ফুলে আটখানা হয়ে যেতেন। এবং তাঁর খুশীর অভিব্যক্তিটা ছিল শিশুদের মতো। খুশীর সময় হাতে তালি পিটাতেন তিনি।

বারী সাহেব নেহাতই নির্বিরোধ লোক ছিলেন। এমন কি আসন্ন মৃত্যু নিয়েও তিনি কোন সময় লড়াই ঝগড়া করেননি। আসল কথা হলো তিনি লড়াই ঝগড়ার ব্যাপারে সব সময় শংকিত থাকতেন। তাঁর মেজাজটা সব সময় সন্ধিপ্রিয় ছিল। মানসিক দ্বন্দ্বের রোগটা সব সময়ই ছিল। কিন্তু তিনি তার চিকিৎসা শান্ত সমাহিত নীতিতে সম্পন্ন করতেন। বিদ্রোহাত্মক নীতি তিনি কোন সময়ই পছন্দ করতেন না।

আমার বেশ মনে আছে, মৃত্যুর দুদিন পূর্বে আমার সঙ্গে তার মেয়ো রোডে দু'হাত হয়ে গেল। যোহরা চকের মাঝ দিয়ে তার টাঙ্গা গাড়ি যাচ্ছিল। আমাকে দেখেই টাঙ্গা থামাতে বলল। আমি খুবই ক্ষেপে ছিলাম তার ওপর। এত ক্ষেপেছিলাম যে, তার ওপর আর ক্ষেপামী নেই। ক্ষেপেছিলাম এ জন্যে, তিনি আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। বৃটিশ হাই কমিশনার অফিসে চাকুরী নেবার পর তিনি আমাদের সাথে মেলামেশা একেবারে ছেড়েই দিয়েছেন। আকস্মিকভাবে পথে ঘাটে দেখা সাক্ষাৎ ছাড়া তার সাক্ষাৎ আমরা পেতামই না। দেখা হলেই অচেনা অপরিচিতের মতো কথাবার্তা বলতেন।

আমি টাংগার কাছে পৌঁছুতেই তিনি টাংগা থেকে নেমে এলেন এবং আমার সাথে করমর্দন করলেন। তারপর কুশলও জিজ্ঞেস করলেন। তার এসব ফর্মালিটিজ দেখে আমার গা জলে উঠল। আমি আর নিজেকে

সামলে নিতে পারলাম না। বললাম, আপনি এত বড় অপদার্থ হয়েছেন। আমাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত আপনি ত্যাগ করেছেন। আপনি ইংরেজদের চাকুরী গ্রহণ করে আপনার সম্পূর্ণ ক্যারেক্টার জলাঞ্জলি দিয়েছেন।

আমার এসব উদ্ধত কথা শুনে রুগ্ন মানুষের মতো পাণ্ডর মুখে একটু করে হাসলেন। তার চেহারাটার এমনিতে সাদাটে ছিল। তার ওপর স্বরও ছিল কাঁপা কাঁপা দুর্ব্বল। আমি বললাম, থাক সে সব কথা, এখন বলুন আপনি কেমন আছেন?'

আমার প্রশ্নের জবাবে অত্যন্ত নম্রস্বরে জানালেন, বেশ কিছুকাল থেকে তিনি হৃদরোগে ভূগছেন। বহু চিকিৎসা করিয়েছেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। এখন তিনি মেয়োরোডের জনৈক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার্থ চলেছেন।

আমি তাকে রসিকতার স্বরে বললাম, 'রাখুন ওসব বারী সাহেব, এসব আপনার মনের রোগ; মানসিক দৈন্য থেকেই আপনার এ হীনমন্যতার উৎপত্তি। আপনার এ রোগের ঔষধ শুনেছি লোকমান হাকিমের কাছেও নেই। আপনি সব সময় একটু বেশী পরিমাণে খেয়ে থাকেন, তাই আপনার পেট একটু খারাপ থাকে বৈকি? সব কিছু মন থেকে ঝেরে ফেলে দিন।'

আমার কথা তার বেশ মনে লাগল। বললেন, মনে হয়, আপনার কথাটাই ঠিক। অন্যান্য ডাক্তাররাও এ ধরনের মন্তব্য করে থাকেন।

এভাবে বহুক্ষণ তাঁর সাথে আমার কথাবার্তা চলল। প্রসঙ্গান্তরে তিনি আমাকে জানালেন যে, তিনি সারা বিশ্বের ইতিহাস পুনরায় বিস্তারিতভাবে লিখতে শুরু করেছেন (বহু খণ্ডের এই ইতিহাস গ্রন্থ শেষাবধি তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি) এবং তুর্কী ভাষায় পাঞ্জাবী ভাষার ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করছেন।

মরহুম বারী সাহেব পাঞ্জাবী ভাষা খুব পছন্দ করতেন। কোন এক সময় তিনি পাঞ্জাবীকে পাঞ্জাবের জাতীয় ভাষার মর্যদায় উন্নীত করার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন। সম্ভবতঃ তখন শিখদের পত্রিকা অজিত' এর সম্পাদক ছিলেন। যেখানেই বসতেন, তিনি তার বহুমুখী পরিকল্পনার

কথা শুনিয়ে সবাইকে চমৎকৃত করতেন। এবং এভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনার খাতিরে তিনি উর্দু ছেড়ে পাঞ্জাবী প্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। তখনকার দিনে তিনি প্রত্যেক দর্শনার্থীকে উপদেশ দিয়ে বলতেন, তারা যেন উর্দুর বদলে পাঞ্জাবী ভাষাতেই একটু বেশী জোর দেন। তার মতে যে ভাষাতে গালিগালাজের শব্দগুলো অত্যন্ত ওজস্বী, সে ভাষাই দেশে স্থায়িত্ব লাভ করবে। তাঁর মতে, পাঞ্জাবী ভাষাতে যে পরিমাণ উৎকৃষ্ট গালির সম্ভার রয়েছে, বিশ্বের আর কোন ভাষাতে তা নেই। এ ব্যাপারে আরো চমকপ্রদ কথা হলো বারী সাহেব তাবৎ জীবনে এক লাইন পাঞ্জাবী ও লিখেননি।

বিভাগপূর্ব কালে আনার-কলিতে কৈলাশ হোটেল নামে একটা হোটেল ছিল। তাতে বারও ছিল। মকদ্দমার সময়ে যখন লাহোর আসতাম, চৌধুরী নজির আহমদের সাথে এই হোটেলে খুব জমে উঠতো। বারী সাহেবকেও এই মজলিশে এনে বসাতাম! আমার ওপরের তলায় চলে যেতাম। হুইস্কির প্রবাহ চলতো। হোটেলে এক শিখ বেয়ারা ছিল। বারী সাহেব যখন দ্'পেগ নিতেন তখন এই বেয়ারার সাথে খাসা পাঞ্জাবী বলতে শুরু করতেন। এ সময় তাঁর মন মেজাজ পাঞ্জাবী ভাষায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতো। কিন্তু চার পেগ নেবার পর তিনি আবার উর্দু ভাষায় ফিরে আসতেন। এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে উর্দুর গুণকীর্তন শুরু করে দিতেন। এ সময় বলতেন, পাঞ্জাবী হচ্ছে গুণ্ডা এবং লম্পট-দের ভাষা। পাঞ্জাবী দুশ্রাব্য এবং অমার্জিত ভাষা। দু চার শব্দ শুনলে কান ঝালা পালা করে ওঠে। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পেগের সময় উর্দু ভাষার সাথে তার একবারে নিবিড় বন্ধুত্ব জমে ওঠে। ষষ্টম পেগের পর হঠাৎ তিনি উর্দু ছেড়ে ফরাসী ভাষাতে অবতীর্ণ হতেন। এরপর পস্তু ভাষা। এরপর আবার পাঞ্জাবী, আরবী, উরদু, ফারসী—সব কিছু মিশিয়ে তার মাথায় তালগোল পাকিয়ে কটটেল হয়ে তার চেতনার নৃত্য করতো।

মরহুম বারী সাহেব নিজের স্বরের প্রতি বিশেষ সচেতন ছিলেন এবং নিজের স্বর শুনতে ভালবাসতেন। কোন সভা সমিতিতে বক্তৃতা করার মতো সাহস তাঁর ছিল না। তবে বন্ধু-বান্ধবদের মহলে নিজের কণ্ঠের

মহড়া শুনিয়ে ইচ্ছা চরিতার্থ করে নিতেন। একবার আমরা দিল্লী মুসলিম হোটেল থেকে বের হলাম। বারী সাহেব মুডে ছিলেন। আনারকলির মাঝামাঝি এসে আমরা খাকসারদের খপ্পরে পড়লাম। বারী সাহেব তাদের প্রপাগাণ্ডায় প্রভাবিত হয়ে পড়লেন এবং রাজপথেই একচোট অনলবর্ষী বক্তৃতা ঝাড়লেন। বেশ লোকজন হয়ে গিয়েছিল। তারপর আমরা সবাই চকের কাছাকাছি এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে 'আল্লামা মাশরেকী জিন্দাবাদ' বলে একচোট শ্লোগান দিলাম। শ্লোগান দেবার পর আমরা কতকগুলো মোতির মালা কিনে প্রত্যেকের গলায় পরে নিলাম। বারী সাহেব মোতির মালা গলায় পরে আমাকে বললেন, 'খাজা সাহেব, চলো হিরামণ্ডি থেকে ঘুরে আসি। মোতির মালা পরে হিরামণ্ডি না গেলে কেমন দেখায় ?'

আমরা সবাই হিরামণ্ডি পৌঁছলাম। হিরামণ্ডি পৌঁছে বারী সাহেব একটু নার্ভাস হয়ে পড়লেন যেন। বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ আমরা হিরামণ্ডির অন্ধঅলিগলিতে ঘুরা ফিরা করলাম। এ সময় বারী সাহেব ক'জন গাট্টা, গোট্টা পাঠানের সাথে পশতু ভাষায় কথা বললেন। একবার একজনের সাথে পশতুতে কথা বলছিলেন এমন সময় তার পাশ দিয়ে একজন পরিচিত লোক ধাওয়া করে যেতেই বারী সাহেব এগিয়ে গিয়ে তাঁর সাথে করমর্দন করলেন এবং লোকটি বলল, 'মওলানা সাহেব আপনি এখানে কি করছেন ?'

পাঠান লোকটিকে একদিকে ইশারা করে দেখিয়ে বললেন, 'ওই মেয়েটির সাথে তিনি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে এসেছেন।'

পরদিন সকালে হাসান আব্বাস গত রাতের ঘটনাবলী লবণ মরিচ লাগিয়ে এমনভাবে বারী সাহেবকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল যে, বারী সাহেব রীতিমত লজ্জিত হয়ে পড়লেন। বারী সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাজা সাহেব, আব্বাস যেগুলো বলছে এগুলো কি সত্যি সত্যি ?'

আমি ঠোঁট উল্টে নিয়ে বললাম, 'তা কি আর বলতে পারি সাহেব। গতরাতে আপনি এমন সব কাণ্ড কারখানা করেছেন যা সত্যি আপনার জন্যে লজ্জাজনক।'

শুনে বারী সাহেব খুবই লজ্জিত হলেন। এতই লজ্জিত হলেন যে, তাড়াতাড়ি উঠে অজু করে নামাজ পড়তে প্রবৃত্ত হলেন।

একজন সমাজ সংস্কারক হবার খুবই শখ ছিল বারী সাহেবের। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল, জাতির একজন বরেণ্য পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত হবেন। প্রতি মুহূর্তে তাঁর এ ভাবটা ভারাক্রান্ত থাকতো। তিনি এমন একটা বিরাট কাজ করতে চাইতেন, আগামী বংশধররা যা যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে এবং তাকে মনে রাখবে। কিন্তু সে জন্যে নির্ভীকতা এবং তেজস্বিতার প্রয়োজন ছিল। এধরনের নির্ভীকতা এবং তেজস্বিতা প্রকাশের জন্যে কখনো কখনো তিনি দুচার পেগ পান করে হিরামণ্ডির মেয়েদের সাথে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতে যেতেন। কিন্তু হিরামণ্ডি থেকে ফিরে এসে অজু করে নামাজ পড়তেন এবং বেশ কিছুকাল ধরে মনে মনে তওবা আস্তাগফের পড়তেন।

তাঁর হাতের আঙুলে বরাবর কাঁচি আটা থাকতো। এই কাঁচি দিয়ে তিনি কপি কেটে সারা জীবন তার স্বপ্ন এবং ভালবাসাকে জোড়া দিতেন। কিন্তু তার সে সব স্বপ্ন কোন দিনই তিনি বাস্তবের কঠিন পাষাণে রূপান্তরিত করতে পারেন নি। সম্ভবত পাষাণের কঠিন নিষ্পেষণের ভয়েই তিনি তা করতে পারেননি। সব সময় কোন না কোন বস্তুর আঘাতে নিষ্পেষিত হবার ভয় থাকতো তাঁর।

তিনি ইংরেজদের ঘোর শত্রু ছিলেন। অথচ ইংরেজদের অধীনে চাকরি নিয়েছিলেন। তিনি 'কোম্পানীর শাসন' নামক একটি বিদ্রোহাত্মক পুস্তক রচনা করেছেন। অথচ এসব কোম্পানীর অধস্তনদের অধীনে তিনি চাকরি করে জীবনের মূল্যবান এবং বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন।

বারী সাহেবের সাথে আমার শেষ সাক্ষাতের কথা বলছি। তিনি তখন এক হোমিওপ্যাথ-এর কাছে মানসিক রোগের কথা বলতে যাচ্ছিলেন। বারী সাহেব এতই ভাল মানুষ ছিলেন যে, কাপুরুষ এবং ভীরু প্রকৃতি তাঁর স্বভাবকে জেঁকে ধরেছিল।

আমি সে সময় আগা হাশর সম্পর্কে একটি স্মৃতিকথা লিখছিলাম (এই পুস্তকে সন্নিবেশিত)। তাতে জিজুর হোটেলে বারী সাহেবের সাথে

আমার প্রথম সাক্ষাতের কথা বলেছিলাম। বারী সাহেব আগা হাসরের লেখাটি পড়ে আমাকে পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে এক পত্র লিখেছিলেন। আমি আবু সাঈদ কোরেশী, আব্বাস, অশোক ফটোগ্রাফার ও বারী সাহেবকে নিয়ে অমৃতসরের অলি গলিতে ঘুরে বেড়াতাম সে সব স্মৃতিকথার উল্লেখ ছিল চিঠিটিতে। তখনকার দিনে আমরা এ ক'জন নেহাতই উদ্দেশ্যহীন, ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াতাম। আমরা ক'জন মিলে 'ফ্রি থিংকার গোষ্ঠীর' পত্তন করেছিলাম। এ গোষ্ঠীর ম্যানিফেস্টোর প্রথম ধারায় ছিল যে ফ্রি থিংকাররা যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। তাদের কার্যকলাপ ও গতিবিধি নিয়ে পরস্পরে সমালোচনা করবে এটা কেউ বরদাস্ত করবে না। অতএব মাঝে মধ্যে এমন হতো যে, পথিমধ্যে চলতে চলতে হঠাৎই বারী সাহেব একদিকে কেটে পড়তেন। অথবা কোন বিষয়ে গরম বিতর্ক হচ্ছে এমন সময় দেখা গেল সহসা আব্বাস নিশ্চুপ এবং কোন রকম বলা কওয়া ছাড়াই একদিকে কেটে পড়েছে।

বারী সাহেবের সেই চিঠিটা সম্পর্কে শেষ সাক্ষাতের সময় সংক্ষিপ্ত আলাপ হয়েছিল। এমনিতে বারী সাহেব দাবি করতেন যে তাঁর স্মৃতিশক্তি নাকি খুবই ভাল। কিন্তু চিঠি সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে দেখলাম তিনি অতীতের বহু কিছু ভুলে বসেছেন। বারী সাহেব ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, সেই চিঠিখানার কথা তাঁর তেমন বিশেষভাবে মনে নেই। চিঠিখানা তিনি খুবই তাড়া হুড়োর মধ্যে লিখেছিলেন। লিখবার বহু কিছু ছিল, কিন্তু মানসিক দিক থেকে তিনি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন।

তিনি মানসিক অপ্রস্তুতির কথা বলতেই আমি আবার তাঁকে নিয়ে পড়লাম। মানসিক দুশ্চিন্তার ভূত ছাড়াবার জন্যে আমি বেশ কিছু কথা বললাম।

এর তিনদিন পর সকাল বেলা চায়ের টেবিলে ইমরোজের পাতা উল্টাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় লাল অক্ষরে দেখতে পেলাম, বামপন্থী সাহিত্যিক, সাংবাদিক বারী সাহেব ইন্তেকাল করেছেন।

বারী সাহেব আজ কবরে শায়িত। জানিনা সেখানেও এমন কোন উন্মুক্ত জানালা রয়েছে কিনা, বারী সাহেব যেখান দিয়ে পালিয়ে যেতে পারেন।

সম্পাদক বাবুরাও প্যাটেল

সম্ভবত আটত্রিশ সালে বাবুরাও প্যাটেলের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। আমি তখন 'সাপ্তাহিক মুসাওয়ার' সম্পাদনা করতাম। সর্বমোট বেতন পেতাম চল্লিশ টাকা। 'মুসাওয়ার'-এর মালিক নজির লুধিয়ানুভীর ইচ্ছা আমার আরো কিছু বেশী উপার্জন হোক, এজন্যে তিনি আমাকে বাবুরাও প্যাটেলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বাবুরাও প্যাটেলের সাথে আমার সাক্ষাতের বর্ণনা দেবার পূর্বে ফিল্ম ইণ্ডিয়া কিভাবে ভারতের আনাচে-কানাচে প্রসিদ্ধি অর্জন করল সে সম্পর্কে কিছু বলে নেই। আপনারা বেশ জানেন, এমন এক কাল ছিল যখন পুনার প্রভাত ফিল্ম কোম্পানীর নামে ছিল জয় জয়কার। 'অমৃত মন্থন' ও 'অমর জাবতী' নামক দুখানি অমর ছবি নির্মাণ করে সারা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ সংস্থা শেষাবধি একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে প্রভাত নগরে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রভাত নগরের প্রতিটি কর্মীর মনে ছিল অপরিসীম কর্মপ্রেরণা ও উদ্যোগ। শান্তারাম, সৈয়দ ফতে লাল, ধাইবর—সবাই প্রভাত নগরের অমিত তেজীয়ান প্রতিভাধর শিল্পী হিসেবে পরিচিত।

ঠিক এমন দিনে প্রভাত নগর তিনটি সন্তানের জন্ম দিল।

১। ফেমাস পিকচার্স—প্রভাত নগরের ছবির একমাত্র পরিবেশক। এর মালিক ছিলেন বাবুরাও প্যাটেল।

২। বিজ্ঞাপন কোম্পানী বি. পি. সামন্ত এণ্ড কোম্পানী, প্রভাতের সকল ছবির প্রচারণা কার্যে নিয়োজিত ছিল। নিউজেক প্রিন্টিং প্রেস—প্রভাতের সকল পোস্টার পত্র ইত্যাদি ছাপার কাজে নিয়োজিত ছিল।

ফিল্ম ইণ্ডিয়া এই নিউজেক প্রিন্টিং-এরই সন্তান। প্রেসের মালিক পার্কার বাবু প্যাটেলের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। পড়ালেখা মামুলী

জানতেন। দুজনে মিলে পরিকল্পনা নিলেন ফিল্ম ইণ্ডিয়া বের করার। প্রেসতো রয়েছেই, কাজও সুলভে পাওয়া যায়। বি. পি. সামন্ত কোম্পানীর মাধ্যমে প্রভাত কোম্পানীর ছবির বিজ্ঞাপন ছাড়াও অন্যান্য ছবির বিজ্ঞাপন সহজে পাওয়া যাবে। মোটকথা, সকল উপাদান হাতের কাছেই। বাবুরাও খুবই পরিশ্রমী ছিলেন—রসবোধও ছিল প্রচুর। তিনি স্বপ্ন দেখার লোক ছিলেন না। সঠিক জায়গায় আঘাত হেনে কাজ হাসিল করার লোক ছিলেন তিনি। অতএব ফিল্ম ইণ্ডিয়ার প্রথম সংখ্যা ছাপা হবার পর ভারতীয় চিত্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হলো।

বাবুরাও-এর লেখায় পাণ্ডিত্য ছিল—রস ছিল এবং বখাটে ছোকরাদের মনের মতো করে টিপ্পনি কাটতেও পারতেন বেশ। তার লেখনিতে চুলচেরা সমালোচনা এবং প্রচ্ছন্ন আঘাত হানারও ক্ষমতা ছিল প্রচুর। মোট কথা আমি তার লেখায় যা দেখেছি ভারতের আর কোন ইংরেজী লিখিয়ে সাংবাদিকদের কলমে তা দেখিনি।

বাবুরাও-এর লেখায় যে দিকটি সবাইকে চমৎকৃত এবং মুগ্ধ করেছে তা হলো তার ধারালো অথবা প্রচ্ছন্ন টিপ্পনি। টিপ্পনি কাটার জগতে তিনি এমন সব আঙ্গিক ও কৌশল আবিষ্কার করেছেন যে সম্পর্কে ভারতীয় পাঠকরা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। বাবুরাও-এর লেখা পাঠকদের মাঝে চাটনীর স্বাদ পরিবেশন করতো।

বাবুরাও বড় জাঁকজমক প্রিয় লোক ছিলেন। আপালু ষ্ট্রিটের মোবারক বিল্ডিং-এর এক প্রশস্ত কামরায় তিনি ফিল্ম ইণ্ডিয়ার অফিস স্থাপন করেন এবং তাকে খুব আকর্ষণীয় করে সাজিয়েছিলেন।

এই সুসজ্জিত অফিস কামরাতেই বাবুরাও-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন ফিল্ম ইণ্ডিয়ার সবেমাত্র সাত-আট সংখ্যা বেরিয়েছে। মুসাওয়ারের দফতরে আমি তার প্রত্যেকটি কপি দেখেছি এবং চমৎকৃত হয়েছি।

আমার ধারণা ছিল, এমন ঝরঝরে ইংরেজী লিখিয়ে অবিশ্যি পাতলা ছিমছিমে ধরনের লোক হবেন। কিন্তু আমি যখন তাকে এক জাহাজের টেবিলে ইয়াবড়া চেয়ারে বসে থাকতে দেখলাম, আমি নিরাশ হলাম।

তার চেহারার কোন অভিব্যক্তিই, কোন হাবভাবই তার ধারালো লেখার সাথে সুসমঞ্জস নয়। চোখ দুটো ছোট ছোট। চওড়া কপাল, মোটা নাক, মোটা এবড়ো থেবড়ো ঠোঁট আর বিটকেলে দাঁত। তবে কপালটা চওড়া।

তিনি যখন আমার সাথে হাত মেলাবার জন্যে দাঁড়ালেন, দেখলাম তিনি আমার চেয়ে লম্বা—খুবই লম্বা। দশাসই দেহ আবেষ্টনী, কিন্তু করমর্দনের বাঁধনটা খুবই ঢিলা মনে হলো। এরপর তিনি যখন আমার সাথে উর্দুতে কথা বলতে শুরু করলেন, আমি আরো নিরাশ হলাম। গেঁায়ার লম্পটদের মতো স্বর—কথায় কথায় বোম্বের অসভ্য সম্প্রদায়ের মতো 'শালা বাঞ্চোত' বলে গালাগাল দেন।

আমি মনে করলাম উর্দুটা ভালভাবে তার রপ্ত নেই বলে এমনটা হচ্ছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি যখন টেলিফোনে অন্য এক জনের সাথে ইংরেজীতে কথা বললেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো এ লোকটি কোনদিনই ফিল্ম ইণ্ডিয়ার সেই ধারালো ও জোরালো সম্পাদকীয় লিখতে পারেন না, ইংরেজীতেও তিনি প্রতি ফুলস্টপের পর একবার করে শালা বললেন।

আমি মনে মনে বললাম, 'এই শালা যদি বাবুরাও প্যাটেল হয়ে থাকে তাহলে আমি শালা সাদাত হাসান মাণ্টো'।

কথাবার্তা অল্প কিছুক্ষণ হলো। নজির লুধিয়ানভী আমার খুব প্রশংসা করলেন। এরপর বাবুরাও বললেন, 'হা হা আমি জানি। ওই শালা আবেদ গুল প্রতি সপ্তাহে আমাকে মুসাওয়ার পড়ে শোনায়।' এরপর তিনি আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, এই শালার মাণ্টোটা আবার কি?

আমি তাকে মাণ্টোর অর্থ বুঝিয়ে দিলাম।

আসল ব্যাপার ছিল প্রভাতের একটি ছবির যে কাহিনী বাবুরাও লিখেছিলেন আমি তার উর্দু তরজমা করব! আমি তার সেই কাহিনীটা নিয়ে ঝটপট অল্পদিনের মধ্যে অনুবাদ করে লুধিয়ানভীর মাধ্যমে তার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি বেশ পছন্দ করলেন আমার অনুবাদ।

এরপর অনেকদিন থেকে তার সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। আমি অফিস থেকে খুবই কম বের হতাম। ফিল্ম কোম্পানীতে চাকরি নেয়ার জন্যে দ্বারে দ্বারে ধন্না দেওয়া আমার নীতি বিরুদ্ধ ছিল।

শান্তারাম যাতে করে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন এ জন্যে বাবুরাও তাকে রাজী করালেন। এ পত্রিকার মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গীতে এই ফিল্ম কোম্পানীর প্রচারণা করা যাবে। শান্তারাম যদিও পড়ালেখা জানতেন না, কিন্তু জাতে ছিলেন শিল্পী। বাবুরাও এর কথায় সহজেই মেনে গেলেন। এবং অল্প দিনের মধ্যেই 'প্রভাত' বের হলো। বাবুরাও সত্যিই অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে শান্তারামের ফিল্ম কোম্পানীর পাবলিসিটি করালেন।

নজির লুধিয়ানভী খুবই সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাবুরাও এর কাছে যেয়ে পৌঁছলেন এবং তাকে রাজী করালেন যাতে করে প্রভাতের বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী 'মুসাওয়ার' এ-ছাপানো যায়।

আমি এখানে একটা কথা বলে নিতে চাই যে, বাবুরাও নিজে জীবনে বহু দুঃখ কষ্ট করেছেন। এজন্যে অভাবী মানুষের প্রতি সব সময়ই তিনি সদয় ছিলেন। তিনি জানতেন লুধিয়ানভীর অবস্থা খুব বেশী ভাল নয়। এজন্যে তিনি তার প্রস্তাব মেনে নিলেন। তবে তিনি সন্দেহ পোষণ করতেন যে, তিনি যা কিছু ইংরেজীতে লিখেছেন উর্দুতে ভাষান্তরিত হতে পারবে না। কিন্তু নজির লুধিয়ানভী যখন আমার নাম নিলেন, তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হলেন।

কসম করে বলছি ইংরেজীতে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। বাবুরাও যা কিছু লিখেছেন, তা যে আমার বোধগম্যের বাইরে এমনও নয়! তবে হুবহু অনুবাদ কিছুটা কষ্টসাধ্য বই কি। বাবুরাও-এর প্রকাশ ভঙ্গির একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। শব্দ চয়নের মধ্যে অভিনবত্ব ছিল। লেখায় বৃটেন এবং আমেরিকান উভয় প্রবাদাবলীর অনুসরণ ছিল। কোন শব্দ তিনি এমন খেলো ভাবে প্রয়োগ করেছেন যে, তার পরিভাষা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বহু চিন্তা ভাবনার পর সিদ্ধান্ত নিলাম, লেখা সামনে রেখে যা কিছু বুঝে আসে তারই ভাব রক্ষা করে অনুবাদ করে যাব। শেষ পর্যন্ত করলামও তাই।

যখন এ অনুবাদ ছাপা হলো নজির লুধিয়ানভী সেগুলো নিয়ে বাবুরাও এর কাছে গেল। আমিও তার সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে দেখেই বলে উঠলেন,

'শালা তুমিও বাবুরাও হবার চেষ্টা করছ দেখছি।'

আমি তাকে আগাগোড়া সব কিছু ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে বললাম। আমি যেভাবে অনুবাদ করেছি এ ভাবে ছাড়া আপনার লেখা ভাষান্তর করার আর কোন উপায় নেই। অতএব আমি যা করেছি ঠিকই করেছি।

ডানহাতের শেষ আঙুলে সিগারেট চেপে ধরে ঠায় গেঁয়ো গোঁয়ারদের মতো লম্বা করে কেশে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'শালা আমি আবেদগুলের কাছে সব শুনেছি, শুনে বেশ মজা পেলাম। আমি তাকে বললাম—(গালি) ও তো বলছিল তুই নাকি উর্দু'র মস্ত বড় রাইটার।'

এ ধারা স্বীকৃতি শুনে আমি মনে মনে কষ্ট পেলাম। এরপর ঠিক হলো আমি নিয়মিত এ ভাবে অনুবাদ করব। কিন্তু মাত্র দু'সপ্তা পরই প্রভাত কোম্পানীর এই মাসিকী বন্ধ হয়ে গেল। কেননা দু সংখ্যাতেই কোম্পানীর বিস্তর পয়সা নেমে গেছে।

যাক, আমি বেশী বিস্তারিত বর্ণনায় যেতে চাই না। কেননা ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে হবে তাহলে! আসলে আমার উদ্দেশ্য হলো বাবুরাও প্যাটেল সম্পর্কে আমার মতামত ব্যক্ত করা।

এমন কতকগুলো ঘটনা হলো যার দরুন নজিরের সাথে আমার……না না সেগুলো পরে বলব। জি হাঁ, যা বলছিলাম, আমি বিয়ে করার মনস্থ করলাম। এ সময় আমি ইম্পেরিয়াল ফিল্ম কোম্পানীতে আশি টাকা বেতনে একটা চাকরি নিলাম। এখানে এক বছর চাকরি করলাম। কিন্তু বেতন পেয়েছিলাম মাত্র আট মাসের। চার মাসের বেতন না পেতেই কোম্পানী লালবাতি জ্বালিয়ে দিল।

এখান থেকে আমি সরোজ ফিল্ম কোম্পানীতে চলে গেলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে মনে হলো আমি কোম্পানীতে ঢুকবার পূর্বেই কোম্পানী পাততাড়ি গুটাতে শুরু করেছে। কিন্তু আমি সহজে দমবার পাত্র ছিলাম না। এই কোম্পানীর শেঠজী কোম্পানী উঠে যাবার পর সেই চারদেয়ালীর মাঝেই অন্য একটি ছোটখাট কোম্পানীর পত্তন করলেন। আমি এখানে একশ টাকায় চাকরি নিলাম। একটা চমৎকার কাহিনী লিখলাম। এর তিন চতুর্থাংশ চিত্রায়িতও হলো। ইতিমধ্যে আমার বিয়ে হয়ে গেল। এখন কনে তুলে আনবার পালা। এজন্যে আমার যথেষ্ট টাকার প্রয়োজন

ছিল। একটা মামুলী বাসা ভাড়া নিয়ে তাতে বউকে তুলতে হবে। কিন্তু যখন টাকা চাইলাম, শেঠ নানু ভাই সোজা হাত উল্টে দিলেন এবং বললেন, আমার অবস্থা কাহিল। তার অবস্থা খারাপ কতটুকু ছিল সেটা আমি জানতাম। কিন্তু আমার অবস্থাটা চিন্তা করে দেখুন। আমি শেঠকে সবকিছু খুলে বললাম। কিন্তু তার কোন প্রতিক্রিয়াই তার মনে পড়লো না। বিগড়ে গেলাম। পরিস্থিতি কিছু হাতাহাতির পর্যায়ে উপনীত হলে শেঠ আমাকে দফতর থেকে বের করে দিলেন। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কোম্পানীর দ্বারে বসে অনশন ধর্মঘট করব। এখান থেকে এক পা-ও নড়ব না।

আমার এই অবস্থার খবর কি ভাবে যেন বাবু রাও-এর কান অবধি পেঁছিল। তিনি প্রথমে নানু ভাই দেশাইকে টেলিফোনে এক চোট নিলেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না দেখে তিনি নিজেই নানু ভাইয়ের অফিসে এলেন। বারশো টাকা পাওনা ছিল। বারশোর স্থলে আটশো টাকায় তিনি মীমাংসা করে দিলেন। আমি মনে মনে বললাম, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। আমার জাতকুল রক্ষা হলো।

আমার ইজ্জতটা কোন মতে বেঁচে গেল। হ্যা, আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমি যখন ইম্পেরিয়াল ফিল্ম কোম্পানীতে কাজ করতাম তখন সেখানে নেহাতই ভদ্র স্বভাবের এক চিত্রাভিনেত্রীর সাথে আমি পরিচয় লাভ করি, তার নাম পদ্মা দেবী। আমার প্রথম ছবি 'কিষাণ কন্যা'তে তাকেই নায়িকা বানিয়েছিলাম। আমার সাথে তার খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তবে তার সাথে সত্যিকারভাবে দৈহিক সম্পর্ক ছিল বাবুরাও প্যাটেলের সাথে। বাবুরাও সব সময় তার প্রতি কড়া নজর রাখতেন।

এটাও এখানে বলে নেয়া ভালো যে, বাবুরাও-এর এ সময় দু'জন স্ত্রী ছিলেন। দু'স্ত্রীর একজনকে আমি দেখেছিলাম, তিনি ছিলেন ডাক্তারনী।

সে যা-ই হোক, এর মধ্যে এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেল যে, আমার অক্লান্ত সেবা এবং পরিশ্রমকে অস্বীকার করে আমার সাথে অসহযোগিতা প্রদর্শন করলেন। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। অবশ্য এজন্যে আমার কোন দুঃখ ছিল না। তার কাছ থেকে কিইবা পেতাম—তাছাড়া

আমার বাড়ীভাড়া পঁচিশ টাকা—তাও চুকিয়ে দিতো সে। এ সময় থেকে আমি রেডিওতে লিখতে শুরু করলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এখন আর একা ছিলাম না। এজন্যে ভাবলাম, বাবুরাও-এর সাথে দেখা করা দরকার। আরে দাঁড়ান আমি হঠাৎ করে এগিয়ে এলাম, মাঝখানে আরো অনেক কথা রয়ে গেছে যে।

অত্যন্ত আজব পরিস্থিতির মধ্যে আমার বিয়েটা হয়েছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় বাড়ীতে আমার মা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। চিত্র শিল্পের লোকজনরা আসা-যাওয়া করতো। তাদের মেহমানদারী কে করতো? মার দ্বারা কি এসব সম্ভব ছিল?

বাবুরাও জানতে পারলেন মাণ্টো খুবই অসুবিধার মধ্যে আছে। তিনি পদ্মাদেবীকে পাঠিয়ে বললেন, যাও মাণ্টোর মাকে গিয়ে একটু সাহায্য করো। আমার বেশ মনে আছে পদ্মাদেবী বিয়ের সময় আমার স্ত্রীকে গহনাপত্র ইত্যাদি দিয়েছিল।

বলুন, এবার চলি। জী হাঁ আমি বাবুরাও-এর কাছে যেয়ে পৌঁছলাম। কেননা তিনি 'কারওয়া' নামে একটি উর্দু পত্রিকাও বের করতেন। ইচ্ছা ছিল আবেদগুলরেজ-এর একটা উপায় হয়ে যাক। আবেদগুল ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু কবি গুলের মেজাজটা ছিল অন্য ধরনের! খবরের কাগজের কাজ ছেড়ে দিয়ে সে সংলাপ গীত ও চিত্র নির্মাণের ধান্দায় নেমে পড়েছিল।

আমি বাবুরাওকে নজিরের লিখিত বরখাস্ত নামা দেখালাম। সেটা দেখে বাবুরাও মুহূর্তের জন্যে প্রমাদ গুনলেন। তারপর অত্যন্ত ভারী একটা গালি ঝেড়ে বললেন, 'তাহলে এই ব্যাপার? তা'লে শালা তুই আমার এখানে কেন চলে আসতে চাস না? আমার 'কারওয়া' আছে। দুই কথা বলবে এমন শালা কে আছে?'

আমি জানালাম, 'আপনি যদি বলেন তাহলে আমি রাজি আছি।'

বাবুরাও জোরে ডাকলেন, 'রিটা।'

দরজা খুলে সটান দেহবল্লরী সম্পন্না জনৈকা ক্রিশ্চান মেয়ে প্রবেশ করল। বাবুরাও তার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ দিলেন এবং বললেন, 'কাছে এসো।'

মেয়ে আসনের কাছ ঘেঁষে বসল। বাবুরাও আবার বললেন, 'মুখটা এদিকে করো।'

মেয়েটি তার হুকুম তামিল করল। বাবুরাও এরপর তার নিতম্বে এমন একটা চপেটাঘাত করলেন, মনে হলো, সেখানকার মাংস একেবারে আলাদা হয়ে গেছে। তারপর বললেন, 'যাও কাগজ পেনসিল নিয়ে এসো।'

মেয়েটির নাম ছিল রিটা কারলাইল। সেক্রেটারী, স্টেনো ও প্রেমিকা—সবকিছুই ছিল সে বাবুরাও-এর। সে সর্ট হ্যাণ্ড-এর খাতা আর পেনসিল নিয়ে হাজির হলো। বাবুরাও আমার নামে নিয়োগপত্র লিখতে শুরু করলেন। লিখতে লিখতে বেতনের কাছে পোঁছতেই বাবুরাও বললেন, 'মাণ্টো কত হলে চলবে?' তারপর নিজেই বললেন। 'একশো পঞ্চাশ হলে ঠিক হবে তো?'

আমি বললাম, 'না।'

বাবুরাও অনেকটা অনুনয়ের সুরে বললেন, 'দেখো মাণ্টো, এর বেশী দেয়া যায় না।'

আমি বললাম, 'আমি দেড়শো টাকার বেশী চাইনা। আমি বরং কম চাচ্ছি। আমি মাত্র ষাট টাকা নেবো, এর বেশীও নয় কমও নয়।'

বাবুরাও মনে করেছেন, আমি তার সাথে ঠাট্টা করছি। কিন্তু আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, আমি ষাট টাকাই নোব। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি দেখছি আস্ত—গাধা।' আমি বললাম, 'গাধা বলুন আর যা-ই বলুন, আমি ষাট টাকার বেশী চাই না। এবং এজন্যে চাইনা যাতে স্বাধীনভাবে আসতে যেতে পারি, কোন রকম টাইম টেবল আমি মানব না, যখন ইচ্ছা আসবো যখন ইচ্ছা যাব। কিন্তু পত্রিকা ঠিক মতোই বের হবে।'

কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেল।

আমি বাবুরাও-এর অফিসে সম্ভবত ছ'সাত মাস কাজ করেছিলাম। এ সময়ে আমি তার আজব ব্যক্তিত্বের বহু খুঁটিনাটি জানতে পেরেছি।

রীটাকে তিনি খুবই ভাল বাসতেন। তার মতে রীটার মতো সুন্দরী মেয়ে দ্বিতীয় কেউ নেই। অন্যান্য ক্রিশ্চান মেয়েদের মতো রীটার দিব্যি

চলে যাচ্ছিল তাদের নিয়ম মাফিক। কিন্তু বাবুরাও-এর কারণে রীটার দামটা বেড়ে গেল।

আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত, রীতা যদি এক আধটু উর্দু বলতে পারতো তাহলে বাবুরাও তাকে অল্প কদিনেই খ্যাতির শীর্ষে তুলে দিতেন।

পদ্মা দেবীকে কেউ জানতো না। কিন্তু যখন বাবুরাও-এর সংস্পর্শে এলো, বাবুরাও তাকে 'কালার কুইন' বানিয়ে দিলেন। ফিল্ম ইণ্ডিয়ার প্রত্যেক সংখ্যায় তার ডজন ডজন ছবি থাকতো। ছবির নীচে বাবুরাও চমৎকার কেপশন দিতেন।

বাবুরাও সম্পূর্ণভাবে সয়ম্ভূ। নিজেই নিজেকে বানিয়ে নিয়েছেন। যৌবনেই বাবার সাথে তার অ-বনিবনা হয়ে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাবুরাও-এর কাছে যখনি বুড়ো প্যাটেলের কথা শুনতাম বলতেন, ও শালা একটা আস্ত হারামী।

জানিনা এ দুজনের মধ্যে আসলে হারামী কে ছিলেন। বুড়ো প্যাটেল যদি সত্যি হারামী থেকে থাকেন, তাহলে এই বাবুরাও হারামীপনায় তার চেয়ে কয়েক পা অগ্রসর ছিলেন।

বাবুরাও-এর কলমের ক্ষুরধার তেজ তার মানসিকতারই ফসল। এবং এই মানসিকতার কারণ রয়েছে। তিনি সুলতান মাহমুদ হয়ে মন্দিরের মূর্তিগুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে চাইতেন। কেননা ছোটবেলা তার বাবা তার স্বাভাবিক মননশীলতাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছেন। বাবা তাকে জোর করে বিয়ে করিয়েছেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। দ্বিতায় বিয়ে নিজে করেছেন নিজের ইচ্ছায়! কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি ধোঁকা খেয়ে নিজের ওপর নিজে চটে গেছেন এবং প্রত্যেকের ওপর সে চটার বিকার প্রতিফলিত হয়েছে।

বাবুরাও-এর সামনে কোন লোক একটু ওপরে বসবে এটা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তবে যে লোক ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে পড়তো তাকে টেনে তুলবার জন্যে তিনি কয়েক ক্রোশ পায়ে হেঁটে আসতেন, তাকে ওপরে তুলবার জন্যে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। তবে লোকটি তার চেষ্টায় ওপরে উঠে গেলে বাবুরাও পুনরায় তাকে নীচে নামাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতেন।

বাবুরাও সম্পূর্ণ স্ববিরোধী পুরুষ ছিলেন।

এমন এককাল ছিল যখন তিনি শান্তারামকে মনে করতেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফিল্ম ডাইরেক্টর। কিন্তু পরে এমন সময়ও এলো, শান্তারামের ছবি, এমন কি স্বয়ং শান্তারামের ব্যক্তিগত ক্রিয়া কর্মেও কালি ঢালতে শুরু করেন তিনি। কারদারকে তিনি দু'চোখে দেখতে পারতেন না। কিন্তু কিছুকাল পর বাবুরাও তাকে আবার পছন্দ করতে লাগলেন। কিন্তু দেশ ভাগাভাগির পর আরেকবার তিনি কারদারের বিরোধিতা করতে শুরু করলেন এবং তার স্টুডিও ও বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন কিন্তু কারদারের কপাল ভালো ছিলো। কোনমতে বেঁচে গেলেন।

মাঝখানে একবার এমন সময় এলো যখন তিনি একেবারে খোলাখুলি ঘোষণা করলেন যে, একমাত্র মিয়া ভাইরাই (মুসলমান) ছবি তৈরি করতে জানেন। মুসলমান চিত্র পরিচালকদের মধ্যে যে শিল্পগুণ ও সৃষ্টিধর্মী প্রবণতা আছে হিন্দুদের মধ্যে তার লেশমাত্রও নেই। এমন এক সময় ছিল যখন তিনি পৃথ্বিরাজকে মানুষ বলেও গণ্য করতেন না। আবার এমন সময়ও আমরা দেখেছি যখন কিশোরশাহুর মত শিল্পী আর হয় না।

সময় সময় বাবুরাও-এর ওপর ভাবাবেগের প্রবাহ চলতো। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তার মানসিক অবস্থা মোটেই সুস্থ ছিল না। তার মধ্যে একটা ভবঘুরে প্রাণাবেগ অহরহ ধমনীর মধ্যে চলাফেরা করে। এই অন্ধ ভাবাবেগে কখনো তিনি নিজেই নিজেকে নানাভাবে আঘাত করে বসতেন। তিনি এমন এক জন শিল্প-মনা পুরুষ, যিনি ভাবাবেগের তেপান্তরে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন।

আমি যদ্দিন 'কারাভাঁ'তে ছিলাম ফিল্ম ইণ্ডিয়াতে আমার পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতার বেশ ঢাক-ঢোল পেটানো হতো! কিন্তু সেখান থেকে সম্পর্কচ্যুত হতেই আমি 'এই মাণ্টোটা আবার কে' এই ধরনের মন্তব্যের সম্মুখীন হলাম। কিন্তু এর কিছুদিন পর যখন আমার ছবি 'আট দিন' মুক্তি পেল ফিল্ম ইণ্ডিয়া মাথার টুপি অবনত করে আমাকে অভিনন্দন জানাল। বলা হলো, মাণ্টো এদেশের একজন অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর কাহিনীকার।

বাবুরাও যখন প্রভাত ফিল্ম কোম্পানীর সাথে জড়িত ছিলেন তখন 'শান্তা আপ্তে' ভারতের একজন প্রথম শ্রেণীর নায়িকা হিসেবে আখ্যায়িত হন। কিন্তু সেখান থেকে সম্পর্কচ্যুত হবার পর শান্তা আপ্তের মতো বদসুরত নায়িকা আর হয় না বলে বেড়াতে লাগলেন। শান্তা আপ্তেকে নিয়ে তিনি ফিল্ম ইণ্ডিয়াতে বহু বিষোদগার করেন। কিন্তু শান্তা আপ্তে ছিল জাত মারাঠার মেয়ে। একবার সে অতর্কিতে বাবুর অফিসে ঢুকে পড়ল এবং হাণ্টার দিয়ে লাগিয়ে দিল কয়েক ঘা।

একটা প্রবাদ আছে, উটের দেহের কোন অঙ্গই নাকি সোজা নয়। এ ব্যাপারে উটের পরই বাবুরাও প্যাটেলের স্থান। বেশ কিছুকাল আগে বোম্বের ইংরেজী সাংবাদিক জগতের জনক মিঃ বি. জি. হার্ণিম্যান একবার 'বোম্বে সেণ্টিনল' পত্রিকায় বাবুরাও সম্পর্কে দু'চারটা নির্যাস মন্তব্য করেছিলেন। বাবুরাও বেকায়দায় পড়ে গেলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করে দিলেন। আশি বছরের ঝানু হার্ণিম্যান তা শুনে খুব হাসলেন এবং এক বন্ধুর মারফতে একজনকে বলে পাঠালেন যে, তুমি যদি চাও আমি তোমার সাথে লড়ব, তাহলে আমি প্রস্তুত, আর যদি তুমি নিজের ভাল চাও তাহলে অনতিবিলম্বে আমাকে হাজার দুয়েক টাকা পাঠিয়ে দাও। তাহলে আমি চুপচাপ থাকব।

বাবুরাও আর একবার ক্ষেপে গেলেন। কিন্তু বৃদ্ধ হার্ণিম্যানের অতীত কার্যকলাপ যখন শান্ত মনে চিন্তা করলেন তখন বাধ্য হয়ে তার নামে দু'হাজার টাকা নজরানা পাঠালেন।

বাবুরাও ছিলেন বোকার হদ্দ। এত বড় বোকা আর হয় না। তার মনে মানবহিতৈষণার পুরোপুরি আবেগ বিদ্যমান ছিল। অসহায় গরীবদের জন্যে তার সহানুভূতির অন্ত ছিল না। আমার বেশ মনে আছে, একবার তিনি একটা মানবতাবিরোধী কাজে হৈ চৈ করে আকাশ পাতাল একত্রিত করেছিলেন।

তখন সবে বোম্বের বড় বড় বাড়ীতে লিফ্‌ট বসান হয়েছে। যে বাড়ীতে লিফ্‌ট আছে তাতে সিঁড়িও আছে। কিন্তু বেচারী ডাক হরকরাদের জন্যে এই লিফ্‌ট ব্যবহার করার অর্ডার ছিল না। কোন বাড়ীর পাঁচতলার একটা চিঠির জন্যে পুরো বাড়ীর সিঁড়ি ভেঙ্গে

পাঁচতলায় উঠতে হতো। বাবুরাও এই নির্মমতার বিরুদ্ধে খুব লাগলেন। এবং বহু বাদ প্রতিবাদের পর শেষাবধি এই নিষেধাজ্ঞা বাতিল করিয়ে ছাড়েন।

পাক-ভারতীয় চলচ্চিত্রের মানোন্নয়নের জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বিদেশী চলচ্চিত্রকাররা যারা পাক-ভারতীয় চলচ্চিত্র নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতেন তাঁদের তিনি দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন এবং ব্রিটেনের চলচ্চিত্রকারদের বোকামিগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন।

বাবুরাও-এর সন্তান-সন্ততি অনেক। ডজন খানেক না হলেও ডজনের কাছাকাছি। একদিন বাবুরাও-এর সাথে তার বাড়ীতে গেলাম। বাবুরাও সব বাচ্চাকে 'কিউ' দিয়ে দাঁড়াবার জন্যে অর্ডার দিলেন। বাবুরাও এসব সন্তানদের একজন স্নেহময় পিতা কিন্তু—

যাক কিন্তু। কেননা এ, কিন্তুর পরই বাবুরাও-এর আরম্ভ।

মাহমুদ গজনভীর মূর্তি ধ্বংস করার মতো যে টুকু প্রবণতা তার মধ্যে ছিল এবারে তা নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করল।

ইতিমধ্যে জওহরলাল নেহেরুর জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির ওপর ক্ষেপে গিয়ে একবার তিনি তাকে গান্ধীজীর পথের কাঁটা এবং জনগণের মাথা-ব্যথার কারণ বলে মন্তব্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে তা পাকিস্তান বিরোধী সংবাদে রূপান্তরিত হয়। কেননা এতদিনে পাকিস্তান হয়ে গেছে। বিশ্বের মানচিত্রে পাকিস্তান নিজের জন্যে একটা আলাদা স্থান করে নিয়েছে। এবং পাকিস্তানের অবস্থিতিটা এখন তার সম্পূর্ণ মত-বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'ফিল্ম ইণ্ডিয়া'র নাম শুনেই মনে হয় এতে চলচ্চিত্র সম্পর্কিত ব্যাপার থাকবে। অবশ্য থাকতোও তাই। কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা গেল তাতে রাজনীতি ঢুকে পড়েছে। শেষকালে এমনও দেখা গেল যে, চলচ্চিত্র রাজনীতি এবং যৌনশাস্ত্র ইত্যাদি এ পত্রিকায় একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে বসেছে। এগুলো পড়লে বাবুরাও এর চেহারাই ভেসে উঠতো তাতে। পাকিস্তান সমাচার, মোরারজী দেশাই এবং মেয়েদের ঋতুস্রাব ইত্যাদির আলাপ-আলোচনাও বাদ যেতো না।

রাজনীতিতে পা দিয়ে বাবুরাও এটাকেও রীটা, সুশীলা বা পদ্মা মনে করেছিলেন। মনে করেছিলেন, দুহাতে এদেরকে দিয়ে ডুগডুগি বাজাবেন আর নিজে তামাশা দেখবেন। অথচ তিনি নিজেই জানতেন চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে ব্যর্থ হয়েছেন এবং এক্ষেত্রেও তেমন সুবিধা করতে পারবেন না। তা সত্ত্বেও একটা হৈ চৈ ও কাদা ছোড়াছুড়ি ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন তাহলে আমি বলব, পাকিস্তান, হিন্দুস্তান কোনটাই বাবুরাও এর মাথা ব্যাথার কারণ ছিল না। আসলে তিনি সব রকম ভাঁড়ামির দুশমন ছিলেন। আসলে তিনি ওমর পার্কের কাছে বেশ পয়সা খরচ করে যে বাংলোটি নিয়েছেন তা নিয়ে বেশ সুখী ছিলেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী সুশীলা রানীকে নিয়েও তিনি সুখী ছিলেন। সুশীলাকে আকাশে তুলবার জন্যে দু'বছর যাবৎ ফিল্ম ইণ্ডিয়াকে নিয়োজিত করেছিলেন। সুশীলাকে তিনি একটা ছবিতেও পেশ করেছিলেন। পাছে আবার অন্য লোক সুশীলাকে স্পর্শ করবে এজন্যে তিনি নিজেই সে ছবিটি পরিচালনা করেন। কিন্তু সবই বিফল।

বাবুরাও-এর দুনিয়াতে কোন কিছুর পরোয়া ছিল না। তার কাছে রানী ছিল রেসের ঘোড়া। জমজমাট দফতর ছিল। তার পেটে রয়েছে গ্যাষ্ট্রিক। কিন্তু তার ট্রেজারীতে যে পরিমাণ অর্থ রয়েছে তা দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে আমেরিকা গিয়ে তার চিকিৎসা করতে পারেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার একটা মস্ত বড় দুঃখ রয়েছে মনে।

তার সে দুঃখটা কি জানেন? দুঃখটা হলো মুসলমানরা এত বেইমান কেন? আমি কসম করে বলছি, তার বহু মুসলমান বন্ধু তার সাথে বহু রকম বেইমানী করেছে। হিন্দু বন্ধুরাও যে বেইমানী না করেছে-এমন নয়। তবে তিনি মুসলমান বন্ধুদেরকেই বেশী ভালবাসতেন। মুসলমানদের কথাবার্তা, চালচলন এবং চেহারা তার বেশ পছন্দ ছিল। তিনি সবচেয়ে মুসলমানদের খাবার পছন্দ বেশী করতেন।

মতবাদের দিক থেকে বাবুরাও বেশ উদারমনা ছিলেন। তার এক মেয়ে প্রেসের এক মুসলমান কর্মচারীকে ভালবেসে ফেলে। কর্মচারীটি প্রায় নিরক্ষর ছিল। অথচ বাবুরাও তনয়া ছিল শিক্ষিতা। কিন্তু প্রেম

শিক্ষা-অশিক্ষা চায় না। একদিন তারা দু'জনে পালিয়ে গেল।

বাবুরাও দু'জনকে পাকড়াও করে নিয়ে এলেন। বাবুরাও প্রথমতঃ মেয়েকে খুব বকলেন। কিন্তু পরে যখন দেখলেন, মেয়ে ছেলেটিকে খুবই ভালোবাসে। তখন তিনি তাদের বিয়ে করিয়ে দিলেন।

কিছুদিন পর বাবুরাও-এর সাথে আমার দেখা হলে তিনি অশ্রু সজল চোখে বললেন,

‘তোমরা মুসলমান শালারা কি ধরনের? একজন আমার কাছ থেকে মেয়ে নিয়ে আমার কাছ থেকে আবার খোর পোষও চায়।’

এর পরই বাবুরাও মুসলমানদের ওপর ক্ষেপে গেলেন। কিন্তু এটা কোন ধরনের বোকামি, একজন কিংবা দু'জনের প্রতিশোধ তিনি পুরো জাতির ওপর থেকে তুলতে শুরু করলেন। বাবুরাও ছিলেন একজন শিল্পী। হিংসা এবং জিঘাংসা তাকেও একজন সাধারণ মানুষ বানিয়েছিল। ফিল্ম ইণ্ডিয়ার প্রতি লাইনে তা বিম্বিত করেছেন তিনি।

খোদার কসম করে বলছি, এসময় ফিল্ম ইণ্ডিয়ার ক'টি সংখ্যা দেখে আমার প্রাণভরে ঘৃণা হলো। শিল্পী ও সাংবাদিক বাবুরাও যেন বহু আগেই মারা গেছেন, এমন মনে হলো।

ইসমত চুঘতাই

প্রায় দেড় বছর পূর্বে আমি যখন বোম্বেতে ছিলাম হায়দ্রাবাদ থেকে পাঠানো এক ভদ্রলোকের চিঠি পেলাম। তার চিঠির বিষয়বস্তু ছিল অনেকটা এরকম।

"কি ব্যাপার, ইসমত চুঘতাই এখনো আপনাকে বিয়ে করলো না। মাণ্টো এবং ইসমত এ দুটি হরিহর আত্মা যদি এক হয়ে যেতে পারতো তাহলে কত ভালো হতো। কিন্তু আফসোস, ইসমত শাহেদ লতিফকে বিয়ে করল আর মাণ্টো......"

সেবারে হায়দ্রাবাদে প্রগতিশীল লেখকদের একটা কনফারেন্স হয়ে গেল। আমি তাতে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু হায়দ্রাবাদের একটা পত্রিকায় এই সম্মেলনের বিবরণ ছাপা হয়েছিল। এতে লেখা হয়েছিল যে, এখানে এক পাল ধিঙ্গি মেয়ে ইসমতকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি মাণ্টোকে বিয়ে করলেন না কেন?'

আমি জানিনা এসব ঘটনা কতটুকু সত্যি। কিন্তু ইসমত যখন বোম্বেতে এলো, আমার স্ত্রীকে বলল, হায়দ্রাবাদের এক মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল 'মাণ্টো কি অবিবাহিত?' তখন সে একটু রসিকতার সুরে বলল, 'জীনা'। একথা শুনে সে মেয়েটি থতমত খেয়ে চুপসে গেল।

ঘটনা যা-ই হোক। কিন্তু এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ চমকপ্রদ ছিল যে. পুরো হিন্দুস্থানে শুধুমাত্র হায়দ্রাবাদের মেয়ে পুরুষরাই আমার এবং ইসমতের বিয়ের ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্ত ছিল।

সে সময়তো আমি তেমন কিছু ভাবতে পারিনি, কিন্তু এখন ভাবছি, আমি এবং ইসমত সত্যি যদি স্বামী-স্ত্রী হতে পারতাম তাহলে কি হতো? এই 'যদি'টাও এমন এক ধরনের 'যদি' যার প্রকৃত মানে খুঁজতে হিমসিম

খেতে হয়। যদি বলা হয়, ক্লিওপেট্রার নাক যদি এক ইঞ্চির আঠার ভাগের এক ভাগ বড় হতো তাহলে তার প্রভাবে নীল নদের ইতিহাসে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো। কিন্তু এখানে ইসমত কেমন ক্লিয়োপেট্রা নয়। তেমনি মাণ্টোও এণ্টনী নয়। তবে এতটুকু অবশ্য বলা চলে যে, যদি মাণ্টো এবং ইসমতের বিয়ে হয়ে যেতো তাহলে সমকালীন সাহিত্যের ইতিহাসে তা একটা আণবিক বিস্ফোরণের কাজ করতো বৈকি। গল্প হতো ঠিক গল্পের মতো। কাহিনীর চরিত্রগুলো আড়মোড়া ভেঙ্গে বিদ্রোহ করে উঠতো। তখন এমনও হতে পারে যে, লেখার রসনার বুক থেকে সকল দুধ শুষ্ক হয়ে যেতো। হয়ত বা তখন এমন একটা রূপ পরিগ্রহ করতো যখন তাকে আর পরখ করা সম্ভব হতো না। অথবা এমনও হতো যে, বিবাহের 'নিকাহ নামা'র স্বাক্ষরই তার শেষ লেখা রূপে গণ্য হতো। তবে বেশীরকম আশংকা হয়, নিকাহ নামার উপর দুজনেই 'গল্প' লিখে ফেলে কাজী সাহেবের কপালে দুটো সই দিয়ে বলত, বাহ, সুন্দর তো! তাছাড়া বিয়ের মজলিশে কতকগুলো সংলাপ এমনও হতে পারতো ঃ

'ইসমত, কাজী সাহেবের কপালটা বেশ চওড়া, ঠিক শ্লেটের মতো।'

'কি বললে?'

'কেন, শুনতে পাওনা, কানের মাথা খেয়েছ নাকি?'

'আমার কান ঠিকই রয়েছে, বরং তোমার কথাই গলার ভেতর থেকে বের হতে চায়না পুরোপুরি।'

'তওবা, তওবা, নাও এবার ভালকরে শোন। আমি বলছিলাম কাজী সাহেবের কপালটা ঠিক শ্লেটের মতো।'

'শ্লেটের মতো? শ্লেট তো মসৃণ হয়ে থাকে।'

'তার কপালটাও বেশ মসৃণ।'

'মসৃণ কাকে বলে তা তুমি জানো থোড়াই।'

'না, আমি জানিনা, তুমি জানো বড়।'

'তুমি জান তোমার মাথা। কাজী সাহেবের মাথা...'

'বড় সুন্দর।'

'বুঝলামতো সুন্দর, তারপর?'

'তুমি বড় বক বক করতে পার।'

'বক বক তো তুমি করছ।'

'আমি বলছি, তুমি বক বক করছ।'

'তোমাকে মানতে হবে তুমি বক বক করছ।'

'বাহ্‌, তুমি দেখছি এখন থেকেই আমার সোয়ামী হয়ে গেছ দিব্যি।'

'কাজী সাহেব আমি এই মেয়েকে বিয়ে করব না। যদি আপনার মেয়ের মাথা ঠিক আপনার মাথার মতো হয়, তাহলে তার সাথেই আমার নিকাহ্‌ পড়িয়ে দিন দয়া করে।'

'কাজী সাহেব, আমিও এই লোকটাকে বিয়ে করব না। যদি আপনার চার স্ত্রী এখনো না হয়ে থাকে তাহলে দয়া করে আমাকে আপনার ঘরে তুলে নিন। আমি আপনাকে খুব পছন্দ করি।'

কৃষণচন্দর 'চোঁটে'র ভূমিকায় লিখেছিল ঃ

"বিষয়টি প্রচ্ছন্ন রেখে, পাঠককুলকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে, শেষে হঠাৎ নাটকীয় ভাবে আসল কথাটি বলে ফেলার মতো চমৎকারিত্বের ব্যাপারে ইসমত এবং মান্টো কারো চাইতে কম যায় না। এ ব্যাপারে উর্দু গল্প লিখিয়েদের মধ্যে খুব কম লোকই এ ধরনের গুণের অধিকারী।"

যদি আমাদের দু'জনের বিয়ের খেয়াল কালে ভদ্রে কখনো হয়, তখন অন্যদেরকে বিস্মিত ও বিব্রত না করিয়ে বরং আমরাই তাতে ডুব দেব তা কেমন কথা? ইসমত এবং মান্টো দুজনের বিয়ে পুরো ব্যাপারটাই চরম হাস্যকর নয় কি?

ইসমত একবার লিখেছিল ঃ

'শুধু এই সামান্য ভালবাসার জগতে কত শওকত, কত মাহমুদ, আব্বাস, আসকরী, ইউনুস আরো কত নাম না জানা প্রেমিক তাসের ঘরের খেলার মতো হারিয়ে গেছে। কিন্তু কেউ কি বলতে পারো এরমধ্যে সত্যিকার প্রেম সুধাপ্রাপ্ত লোকটি কে? শওকতের সেই কাহিনীর অতৃপ্ত আত্মার চাহনিগুলো, মাহমুদের সাপের মতো কিলবিল করা অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো, আসকরীর নির্দয় হস্তযুগল, ইউনুসের কালো ঠোঁটের আবেগ, আব্বাসের উদাস উদাস স্মিত হাসি আর হাজার হাজার আবেগ বিদ্ধ চওড়া বুক, প্রশস্ত কপাল, কোকিল কালো কেশদাম, মসৃণ সুঢৌল নিতম্ব, পেশল বাহু—সবকিছু একসাথে মিলে পাকা সুতার ডোরে বাঁধা

অবস্থায় ঘুড়ির মতো ঝুলে আছে নিসীম শূন্যে অনন্তকাল। অস্থির চাতকের মতো তলিয়ে দেখি এদের দিকে। ভেবে পাইনা কাকে রেখে কাকে ধরবো। কোন ডোরটি ধরে টানতে থাকব আর টানতে টানতে আমিও ঘুড়ির মতো উড়তে থাকব নিঃসীম শূন্যে, দূরে, আরো দূরে।'

(ছোট্টি আপা)

মাণ্টো লিখেছিল ঃ

আমি শুধু এতটুকু বুঝি, মেয়েদের সাথে প্রেম করা আর জমি খরিদ করা একই কথা। তুমি ভালবাসার চেয়ে দু'এক বিঘা জমি কিনে সারা জীবন তা দখলে রাখো। জীবনে শুধু একটি মেয়ে, আর সারা দুনিয়া জুড়ে এত? কেন এতে এত তামাশা জমা হয়ে আছে? শুধু গন্ধম সৃষ্টি করেই আল্লামিঞা তার কর্মের পরিসমাপ্তি করলেন না? আমার কথা শোনো, এই যে জীবন, যা তোমাকে দান করা হয়েছে, বেশকরে উপভোগ করো। তুমি এমন একজন খদ্দের, যে মেয়ে লাভ করার জন্য সারা জীবন রসদ জুগিয়েও যা পাবে তা যৎসামান্য মনে করবে। আমি এমন একজন খদ্দের যে জীবনে অনেক মেয়েকেই লাভ করবে। তুমি এমন একটা প্রেম করতে চাও, যে প্রেমের ব্যর্থ উপাখ্যান নিয়ে একজন বটতলার লেখক উপন্যাস লিখবে, নারায়ণ দত্ত সায়গল তা ময়লা কাগজে ছাপবে আর ডিব্বি বাজারে রদ্দি মাল হিসাবে সেরদরে বিক্রি হবে। আমার জীবন খাতার সকল পাতা উই পোকার মতো নিশেষ করে দিতে চাই, যেন আর কিছুই বাকী না থাকে। তুমি প্রেমের মাঝে জীবন লাভ করতে চাও আর আমি জীবনে আকণ্ঠ প্রেমসুধা পান করতে চাই।"

(তাকলীফ)

'চোটেঁ'র ভূমিকায় কৃষণচন্দর বলেন,

"ইসমতের নাম উচ্চারণ করতেই পুরুষ গল্প লিখিয়েদের চক্ষু চড়কগাছ হয়। লজ্জায় অধোমুখ হয়ে পড়ে। নিজে নিজেই সংকুচিত হয়ে পড়ে। এই ভূমিকাও সংকোচন ও লজ্জা থেকে রেহাই পাবার একটি প্রয়াস মাত্র।"

ইসমতের ব্যাপারে যা-কিছু লিখছি। কোন রকম লজ্জা, সংকোচ

যা নিজের দৈন্য ঢাকবার জন্যে নয়। একটা ঋণ বলা যায়, যা কিনা সামান্য সুদের সঙ্গে পরিশোধ করছি।

সর্বপ্রথম আমি ইসমতের কোন্ গল্পটি পড়েছি, আজ তার কোন কিছুই মনে নেই। এই কথাগুলো লেখার সময় আমার স্মৃতি শক্তিকে খুব খোঁচা দিলাম, কিন্তু কোন কাজ হলোনা। মনে হয় ইসমতের গল্প কাগজে ছাপা হওয়ার পূর্বেই আমি পড়ে ফেলেছি। এজন্যে ইসমতের ব্যাপারে আমার কোন সংকোচ ছিল না। কিন্তু আমি যখন তাকে প্রথমবার দেখি, দারুণ হতাশ হয়েছিলাম। বোম্বের চেম্বারজ ক্লিয়ার রোডের ১৭ নং ফ্লাটে সাপ্তাহিক মোসাওয়ারের অফিস ছিল, শাহেদ লতিফ তার স্ত্রীকে (ইসমত) নিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসের ঘটনা। মহাত্মা গান্ধী সহ সকল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হয়েছেন। শহরময় একটা উত্তেজনা বিরাজ করছিল। রাজনৈতিক চিন্তাধারা সকলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এজন্যে দেশের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা হলো বেশ কিছুক্ষণ। তারপর শুরু হলো সাহিত্য জগতের চুলচেরা আলোচনা।

এর একমাস পূর্বে 'আদবে লতিফ' পত্রিকায় ইসমতের 'লেহাপ' গল্প ছাপা হয়েছিল। আমি তখন অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে কর্মরত ছিলাম। গল্পটি পড়ে আমি কৃষণচন্দরকে বলেছিলাম, 'বেশ খাসা গল্প তো,' তবে গল্পটির শেষের লাইনটা একেবারে বেখাপ্পা, গা জালা করে। আহমদ নদীমের স্থলে আমি যদি সম্পাদক হতাম তাহলে লাইনটা কেটে দিতাম। অতএব কথায় কথায় যখন গল্পের কথা উঠল, আমি ইসমতকে বললাম, আপনার 'লেহাপ' (লেপ) গল্প আমার খুব ভাল লেগেছে। গল্পের বর্ণনায় আপনার সংযম অতুলনীয় কিন্তু আমি ভেবে পাইনা আপনি গল্পের শেষে এই কথাটা কেন লিখলেন যে, 'এক ইঞ্চি উপরের দিকে উঠানো লেপের ফাঁক দিয়ে আমি কি দেখেছি, আমাকে লক্ষ টাকা দিলেও আমি কাউকে তা বলব না।'

ইসমত বললো,

'কেন, এ লাইনটায় অসংগতি কোথায়?'

জবাবে আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বলার আগেই ইসমতের চেহারার একটা অনির্বচনীয় লজ্জা বিজড়িত অভিব্যক্তি ফুটে

উঠল, ঠিক যেমন অন্য দশটি লজ্জাবতী গৃহস্থ বধূদের মুখে ফুটে ওঠে। আমি খুবই হতাশ হলাম। আমি আসলে চেয়েছিলাম 'লেহাপের' চুলচেরা বৃত্তান্ত নিয়ে তার সাথে আলাপ করব, কিন্তু হা হতোস্মি। ইসমত চলে যাবার পর আমি মনে মনে বললাম, 'হতভাগী দেখছি নেহাত লজ্জাবতী মেয়ে।'

আমার বেশ মনে আছে, এই সাক্ষাতের দ্বিতীয় দিনেই আমি দিল্লীতে আমার স্ত্রীকে চিঠি লিখলাম, 'শোনো, ইসমতের সাথে দেখা হয়েছিল। তুমি শুনে বিস্মিত হবে যে, ইসমত ঠিক তোমারই মতো একটি নেহাত ঘরোয়া মেয়ে। এক ইঞ্চি উপরের দিকে তোলা লেপের কথা তুলতেই সে লজ্জায় মরে গেল। আমার সব আশা মাঠে মারা গেল। তবে তুমি তাকে খুব পছন্দ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।'

এরপর দীর্ঘদিন আমার এই মানসিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছি এবং আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম, মানুষকে তার শিল্পের স্থায়িত্বের জন্য নিজের সহজাত প্রবৃত্তির সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করা অপরিহার্য। ডঃ রশিদ জাহানের শিল্প সংজ্ঞা আজ কোথায়? কিছু তার ঘনকালো কেশদামে অন্তর্লীন আর কিছু পাতলুনের পকেটে রয়ে গেছে। ফান্সে জর্জ সান নারীত্বের সুন্দর পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে সুকুমার শিল্পের জীবন গ্রহণ করেছেন। সংগীতকার পুলস্তানী সংগীতের রাগ রাগিণী নিংড়াতে গিয়ে অবশ্যই হিরা চুনি পান্নার জন্ম দিয়েছেন, কিন্তু তার নিজের রাগ-রাগিণী অংকুরেই মরে গেছে।

আমি ভেবেছিলাম মেয়েরা পুরুষের পাশাপাশি যুদ্ধের মাঠে লড়বে, পাহাড় কাটবে, গল্প লিখতে লিখতে ইসমত চুঘতাই হবে। কিন্তু তাদের হাতে মেহেদীর রংও কখনো সখনো লাগাতে হবে, হাতের চুড়ির কংকন ধ্বনিও বাজতে হবে। "ইসমত নেহাত ঘরোয়া মেয়ে" এই কথা বলে সত্যি আমি হোচট খেলাম। ইসমত যদি সত্যিকার মেয়ে না হতো তাহলে তার গল্প সংকলনে রোমান্টিক প্রেমের উঁকিঝুঁকি, ভুলভালাইয়া, লেহাপ ও গিন্দা ধরনের মোলায়েম ও মনোমুগ্ধকর গল্প থাকতো না। গল্পের মাঝেই বরং মেয়েদের জন্য আরেক ধরনের অভিনয়কলা নিহিত। কোনরকম ভাঁড়ামি ও গোঁজামিল বর্জিত অকৃত্রিম আবেগমাখা

বাক্যাবলী—যা কিনা তীর হয়ে পুরুষদের হৃদয় বিদ্ধ করে যায়, দৈহিক বা বাহ্যিক অভিনয়ের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। হৃদয়ের গভীর অনুভূতির ইঙ্গিতের গন্তব্যে উপনীত হবার জন্যে মানুষের প্রাণাত্মার যে তাগিদ নারী সত্তারই আধো জানা, আধো অজানা প্রবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত। লেখার নমুনা ঃ

তার মুখাবয়ব পাণ্ডুর আকার ধারণ করল, 'আহ্‌, বেচারী অবলা শিশু—ওর বাপ বোধহয় মারা গেছে।'

'তোমার মুখে ছাই পড়ুক, খোদা না করুন।' আমি বাচাধনকে বুকে টেনে নিলাম।

'বাস্‌।' সুযোগ বুঝে ছেলে উঠে গিয়ে বন্দুক ছুড়ল।

'হায় পাজী, আব্বাকে মারতে হয় কোনদিন।' আমি বন্দুক কেড়ে নিলাম। (ভুল ভালাইয়া গল্প থেকে)

'সাকী'তে ইসমতের 'দোজখী' গল্প ছাপা হয়েছিল। আমার বোন গল্পটি পড়ে আমাকে বলেছিল; 'সাদত, এই ইসমতের মতো এমন কট্টর মেয়ে তো আর হয় না। হতভাগী নিজের সহোদর ভাইকে পর্যন্ত রেহাই দেয়নি। কিসব আজেবাজে কথা লিখেছে তার গল্পে।'

আমি বললাম, 'ইকবাল, আমার মৃত্যুর পর তুমি যদি এ ধরনের গল্প লিখবে কথা দাও, তাহলে খোদার কসম, আজই আমি মরতে প্রস্তুত।'

সম্রাট শাহজাহান প্রিয়তমার স্মরণে তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন আর ইসমত তার প্রিয় ভাইর স্মরণে 'দোজখী' গল্প লিখেছে। শাহজাহান এই মর্মরসৌধ নির্মাণের জন্য অন্যদের দ্বারা পাথর সংগ্রহ করেছেন। অন্য কারিগরদের দ্বারা পাথরে নকশা নমুনা উৎকীর্ণ করেছেন এবং অতঃপর তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন অমর সৌধ তাজমহল। আর ইসমত নিজের হাতেই নিজের আবেগের গড়া মর্মর পাথর একত্রিত করে একটা উঁচু বেদী তৈরি করেছে এবং নরম হাত দিয়ে আপন ভাইর শবদেহ তাতে তুলে রেখেছে। তাজমহল শাহজাহানের প্রেমের একটা নগ্ন প্রতীক বিশেষ। কিন্তু ইসমতের 'দোজখী'তে ভ্রাতৃ-প্রেমাবেগ সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন এবং শিল্পসম্মত। এই গল্পে যে স্বর্গ সুধা রয়েছে শিরোনামে তা নেই।

আমার স্ত্রী এ গল্প পড়ে ইসমতকে বলল, 'এসব কি অনাসৃষ্টি তৈরি করেছ তুমি?'

'বক বক করোনা, নাও, সেই আইসক্রিম কোথায়?'

বলাবাহুল্য, ইসমত বরফ বেশ পছন্দ করতো। ঠিক ছোট শিশুদের মতো কড়কড় করে চিবিয়ে সে আইসক্রিম খেতে থাকতো। আইসক্রিম খেতে খেতে সে তার বহু গল্প লিখেছে। চার পেয়েতে কনুইর উপর ভর দিয়ে কাত হয়ে আছে। সামনে বালিশের ওপর লেখার কাগজ, হাতে ফাউণ্টেন পেন এবং অন্য হাতে আইস্‌ক্রিমের ডাটি। ঘরে রেডিওর ভলিউম জোরে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। রেডিও জোরে জোরে চীৎকার করছে। কিন্তু তার কলম এবং মুখের আইসক্রিম নিধনের আওয়াজ চলছে একই রকম। কড় কড়··· ।

ইসমতের লেখার একটা বিশেষ সময় আছে। যখন লিখবে না মাসের পর মাস গত হবে, কিন্তু যখন লেখার ঝোঁক চাপবে তখন শত শত পৃষ্ঠা তার কলমের নীচ থেকে চলে যাবে। তখন খাওয়া-দাওয়া, স্নান—কিছুই তার খেয়ালে থাকবেনা। সব সময় চার পেয়েতে কনুইর উপর ভর দিয়ে সামনের কাগজে তার আঁকা বাঁকা হস্তাক্ষরে মনের কথা উৎকীর্ণ হতে থাকবে অবিরাম। 'টেরহী লকিব্‌' (আঁকাবাঁকা রেখা)-এর মতো বেশ বড়ো সড়ো উপন্যাসটিও সে মাত্র ৭।৮ বার বসেই শেষ করেছে।

কৃষণচন্দর ইসমতের লেখার দ্রুততার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন ঃ

''গল্প সম্পর্কে (ইসমতের) আরো একটি উপমা বেশ মনে করা চলে, তা হলো 'ঘোড় দৌড়'। অর্থাৎ লেখার গতি, স্পন্দন, বিদ্যুৎ সদৃশ ধাবমানতা থেকে মনে হয় পুরো গল্পটাই যেন দৌড়াচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। তখন প্রতিটি বাক্য, ইঙ্গিত, ধ্বনি, চরিত্র, আবেগ এবং অনুভূতি যেন বেয়ে চলে এক প্রলয় গতি সম্পন্ন বাহনের মতো।''

ইসমতের কলম এবং মুখ—দুটোই সমান ধারালো। লিখতে শুরু করলে কল্পনা শক্তি তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় দ্রুত গতিতে। তখন শব্দগুলো অনেক পেছনে পড়ে কাঁপতে থাকে। তখন কথা বলবে তো শব্দ একটার ঘাড়ে একটা চড়তেই থাকে। যদি খবরদারী করার জন্যে কখনো একবার বাবুর্চিখানায় ঢুকে পড়ে তাহলে আর রক্ষে নেই। হয়তো সবে আটা

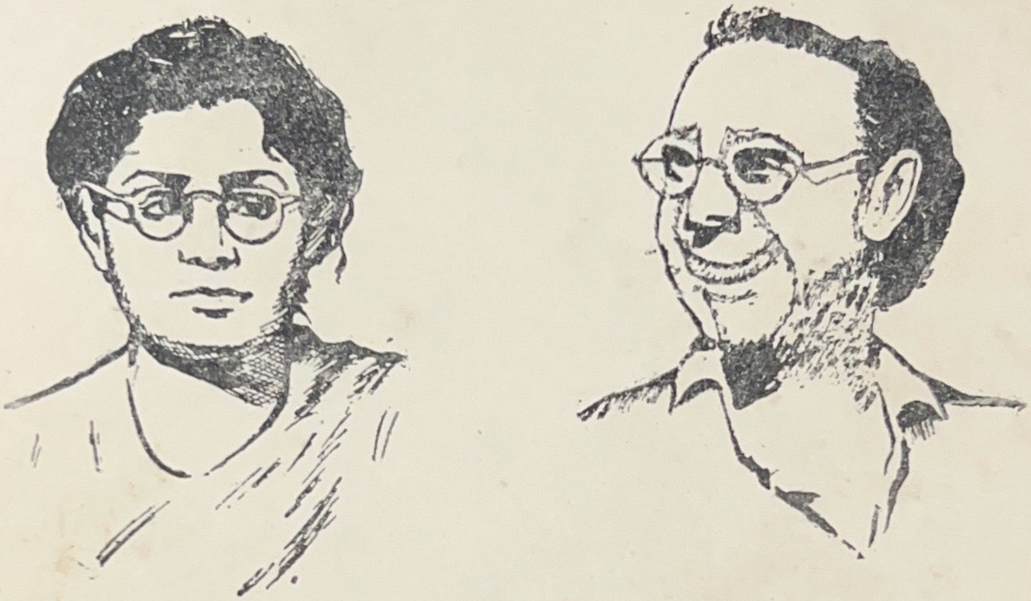

ইসমত চুঘতাই ও কৃষণ চন্দর

পিঁড়িতে পেষা হচ্ছে, কিন্তু তার মগজে রুটি তৈরী হয়ে যায়। হয়ত আলুর খোসা এখনো ছাড়ানোই হয়নি কিন্তু সালুনের রং ঝোলের স্বাদ চেখে ফেলেন কল্পনার চোখে। আমার মনে হয় কোন কোন সময় সে রান্নাঘরে ঢুকে ঘ্রাণে অর্ধভোজন সেরে ফিরে আসে। তার এই প্রচণ্ড দ্রুততার পাশাপাশি—ধীর-স্থির ও ঠাণ্ডা মাথার স্বভাব ও আমি কখনো দেখেছি, যখন সে চুপচাপ বসে বাচ্চার জন্যে ফ্রক সেলাই করছিল। দ্রুতগতিতে লেখার সময় তার কলম অনেক সময় বানান ভুল করে বসে. কিন্তু বাচ্চার ফ্রক সেলাইর সময় সুঁচের একটা খোঁট ও ভুল হয় না। সব দিকে মেপে পাকা দরজীর মতো সে ফ্রক সেলাই করে, কোন দিকে একটু ঝুল হবারও অবকাশ নেই।

'উফ্‌ রে বাচ্চে' (হায়রে ছেলেপিলে) গল্পে ইসমত লিখেছিল ঃ

বাড়ী বাড়ী নয়, মহল্লা জুড়ে কলেরা আসুক, সারা দুনিয়ার বাচ্চা পটাপট মরতে থাকুক। কিন্তু কৈ একটাও না। প্রতি বছর মা'শাল্লা পুরো বাড়ী হাসপাতাল হয়ে যায় (তবু মরেনা)। শুনেছি দুনিয়াতে ছেলে পিলেরাও মরে—হয়ত মরে, কি খবর ?'

কিন্তু কিছুকাল আগে বোম্বেতে যখন তার মেয়ে সীমার ক্ষয়কাশ হলো, রাতভর সে জাগতে লাগল। দুশ্চিন্তা আর উদাসীনতা ছেয়ে থাকতো তার চোখে মুখে। মা হবার পরই মেয়েদের মমতা প্রকাশ পায়।

ইসমত দারুণ হঠকারী ছিল। তার ক্রোধটা ছিল অনেকটা শিশুসুলভ। জীবনের কোন মতবাদ, কোন সহজাত প্রবৃত্তির শাসনকে একেবারে প্রথমেই সে মেনে নিতোনা। বিয়েতে তার প্রথম অসম্মতি ছিল। যদিও বা কোনমতে রাজী হলো, কারো ঘরনী হতে রাজী হলো না। যদিও বা অনেক বলা কওয়ার পর তাতে রাজী হলো, কিন্তু মা সে কোনমতেই হবেনা বলে রায় দিল। কষ্ট করতে রাজী, দুর্ভোগ পোহাতে রাজী তবু যেটা নিয়ে জিদ ধরবে তা থেকে একচুল হটবে না। আমি মনে করি এটাও তার একটা পদ্ধতি। এভাবে ধাক্কা খেয়ে, হোচট খেয়ে, জীবনে গভীরতর তত্ত্ব আহরণ করতে চায়, বুঝতে চায় সব কিছু আপন বৈশিষ্ট্যে। সত্যি, তার সব কিছুই আলাদা প্রকৃতির।

ইসমতের নারী সত্তা এবং পুরুষ প্রকৃতির মাঝেও আজব ধরনের জেদ এবং অসম্মতি বিদ্যমান। হয়ত প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে, কিন্তু প্রকাশ্যে অনীহা প্রকাশ করে যাচ্ছে। চুমো খাবার জন্যে হয়ত প্রাণ তার মাথা কুটে মরছে, কিন্তু চুমোর বদলে সে গালে সুই চালিয়ে দিয়ে তামাশা দেখবে। আহ্লাদে, সোহাগে কোন ছোট শিশুকে স্পর্শ করার জন্যে হয়ত হাত নিসপিস করছে, কিন্তু কোলে নিয়ে তাকে এমন ছেলেমি করবে যে, শিশুটি চোখে সরষে ফুল দেখবে। তার এই স্ব বিরোধী প্রেম সত্তা প্রথমত খেলাচ্ছলে শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা তার নতুন গল্পে ফল্গুধারা হয়ে পরিণতি প্রাপ্ত হয়।

ইসমতের নিজের জীবনের পরিণতিও যদি এভাবে শুরু হয়ে শেষ হয়, আর তা দেখার জন্য আমি যদি জীবিত থাকি, তা আর তেমন বিচিত্র কি?

ইসমতের সাথে মেলা-মেশা শুরু হয়ে আমার পাঁচ ছ' বছর গত হয়েছে। দু'জনেরই চরিত্রে সহনশীলতা বলতে ছিলনা কিছুই, মনে হতো ফুৎকারে, সব উড়ে যাবে। দুজনের মাঝে এত দিনে শতশত ঝগড়া ফ্যাসাদ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল অনিবার্য। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মাঝে মাত্র একবার একটু সংঘর্ষ দানা বেঁধে উঠেছিল, তাও তা ছিল ক্ষণস্থায়ী।

শাহেদ এবং ইসমতের আমন্ত্রণক্রমে আমি এবং আমার স্ত্রী সাফিয়া মিলাদে (বোম্বাইর উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি স্থান, শাহেদ বোম্বে টকিজে কর্মরত অবস্থায় এখানে থাকতো) উপস্থিত হলাম। রাতের খাবার শেষে কথায় কথায় শাহেদ আমাকে বললো,

'মান্টো, এখনো তোমার লেখায় প্রচুর ভুল থাকে।'

রাত দেড়টা পর্যন্ত আমি আমার লেখার ভুল কোনক্রমেই স্বীকার করতে রাজী হলাম না। রাত্র দু'টার দিকে ইসমত তার স্বামীর পক্ষ নিল। হঠাৎ কোন একটা কথা বলতে গিয়ে ইসমত 'দস্ত দরাজী' (হস্তক্ষেপ) শব্দ উচ্চারণ করল। আমি মওকা পেয়ে গেলাম, বললাম, প্রকৃত শব্দ হচ্ছে 'দরাজ দস্তি'। রাত তিনটা বাজল, ইসমত কোনক্রমেই নিজের ভুল স্বীকার করলো না। আমার স্ত্রী ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে। শাহেদ ব্যাপারটি সহজে মিটাবার জন্যে অন্য রুম থেকে 'অভিধান' তুলে

নিয়ে এলো। কিন্তু দস্ত দরাজী শব্দ অভিধানে খুঁজে পাওয়াই গেলনা। তবে 'দরাজ দস্তি' শব্দ এতে ছিল এবং তার অর্থও সুস্পষ্ট ভাবে বলা আছে। শাহেদ বললো, 'ইসমত এবার তোমাকে মানতেই হবে।' এরপর স্বামী-স্ত্রীতে শুরু হলো। ওদিকে ভোরের আগমনী শোনা গেল মোরগের আওয়াজ শুনে। ইসমত অভিধানটা তুলে অন্য দিকে ফিকে ফেলে বলল, 'যখন আমি নিজে অভিধান প্রণয়ন করব তখন সত্যিকার শুদ্ধ শব্দ 'দস্তদরাজী' থাকবে। দরাজ দস্তি কোন একটা কথা হলো, যত্তসব··· ।

ঝগড়া ফ্যাসাদ বলতে এই একটি ঘটনাই, এটাই প্রথম এবং শেষ। এরপর আমরা কোন দিন কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হইনি। বরং বলা যায়, এধরনের বিতর্কের কোন সুযোগ আমরা সৃষ্টি করিনি। কথা বলতে বলতে যখন এধরনের কোন সংঘর্ষের মুখোমুখি হতাম, হঠাৎ ইসমত প্রসঙ্গ বদলে ফেলতো অথবা আমি হঠাৎ অন্য পথে চলে যেতাম।

আমি ইসমতকে পছন্দ করি, আর ইসমতও আমাকে পছন্দ করে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় 'তোমরা দুজনে একত্রে কোন্ বস্তুটা পছন্দ করো' তাহলে মনে হয় আমি এবং ইসমত কিছুক্ষণের জন্যে নির্বাক হয়ে যাব।

ইসমতের চেহারা সুরত খুব একটা আহামরি না হলেও বেশ স্নিগ্ধময়তা ছিল তার চেহারায়। তার প্রথম দর্শনের প্রতিচ্ছবি এখনো আমার মন প্রাণকে আচ্ছন্ন করে আছে। একেবারে সাদাসিদা পোশাকে আবৃত ছিল তার দেহাবয়ব। ছোট পাড়ের সাদা শাড়ী, সাদা জমিনের উপর কালো ডোরাকাটা আঁটসাঠ ব্লাউজ, হাতে ছোট ব্যাগ, পায়ে খুর বিহীন ব্রাউন চপ্পল, ছোট বুদ্ধি দীপ্ত চোখ জোড়ার উপর মোটা পুরো লেন্সের চশমা, ছোট ববকাট চুল, তীর্যক চাহনী, একটু হাসলেই গালে টোল পড়ে যায়—এই ছিল আমার প্রথম দর্শনের ইসমত।

আমি ইসমতের প্রেমে পড়িনি, তবে আমার স্ত্রী তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। সাফিয়া যদি ইসমতকে এব্যাপারে কোন সময় বলতো তাহলে অবিশ্যি সে বলতো, প্রেমে পড়ার আদিখ্যেতা তোমার তো কম নয়। তোমার বয়েসের মেয়েদের বাপরা পর্যন্ত আমার প্রেমে হাবুডুবু খায়, আর তুমি··'

আমি এক সম্মানিত মসিজীবী ভদ্র লোককে জানি, ইসমতের প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন বহুকাল; পত্রের মাধ্যমে তিনি প্রেম নিবেদন করলেন। ইসমত ও সাড়া দিয়ে যেতে লাগল নিয়মিত। কিন্তু শেষাবধি বেচারীকে এমন চিৎপটাং করে দিল যে তা আর বলাই বাহুল্য। এ সত্য ঘটনা কোনদিন এই ভদ্রলোক লিপিবদ্ধ করতে পারবেন না বলে আমার বিশ্বাস।

পারস্পরিক মতদ্বৈততার আশংকায় আমার এবং ইসমতের মাঝে কথাবার্তা খুবই কম হতো। কখনো আমার কোন লেখা ছাপা হলে পড়ে প্রশংসা করতো। একবার 'নিলাম' গল্প ছাপা হওয়ার পর ইসমত অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলল, 'এই বোন পাতানোটা কি? আপনি ঠিকই বলেছেন কোন মেয়ের সাথে বোন সম্পর্ক পাতানো তার অবমাননারই নামান্তর।'

এরপরই আমি ভাবতে লেগে গেলাম, সেতো আমাকে মাণ্টো ভাই বলে আর আমি তাকে ইসমত বোন বলে ডাকি—এবার বুঝুন ঠেলাটা।

আমাদের পাঁচ ছ' বছরের বন্ধুত্বের জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা চলে। অশ্লীলতার অভিযোগে একবার আমরা দু'জনে একত্রে গ্রেফতার হলাম। আমার তো এ ব্যাপারে পূর্বের দু' দুবারের অভিজ্ঞতা ছিল। এজন্যে সে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে আমাদের গ্রেফতারটা শেষাবধি বেআইনী বলে প্রতিপন্ন হলো। কেননা, পাঞ্জাব পুলিশ আমাদের বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেফতার করেছিল। এতে ইসমত খুব খুশী হলো। কিন্তু অভিযোগ যখন একবার উঠেছে তা আর কত চাপা দিয়ে রাখা যায়। অবশেষে তাকে লাহোরের আদালতে হাজির হতেই হলো।

বোম্বাই থেকে লাহোর—এ বেশ দীর্ঘ পথ। কিন্তু শাহেদ এবং আমার স্ত্রী সাথে সাথে ছিল। এরা দু'জন এক পক্ষ হয়ে আমাদের দু'জনকে উত্তেজিত করার জন্যে অশ্লীলতা সম্পর্কে নানা ধরনের হামলা করতে লাগল। জেল জীবনের নানা যন্ত্রণার একটা চিত্র তুলে ধরা হলো। ইসমত শেষে উত্তেজিত হয়ে বলল, শুলে চড়ালেও এই কণ্ঠ থেকে 'আনাল্‌হক'ই বের হবে জেনো।'

এই মামলার ব্যাপারে আমরা বার দুয়েক লাহোরে গিয়েছিলাম। দু'বারই আমাকে এবং ইসমতকে দেখার জন্যে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা দল বেঁধে আদালতে আসতো। ইসমত আমাকে বলল, মাণ্টো ভাই, চৌধুরী নজিরকে বলুন সত্বর টিকেট সিষ্টেম চালু করতে; আমাদের আসা যাওয়ার খরচটা উঠে আসবে অনায়াসে।

আমরা দু'বারই লাহোরে গিয়েছিলাম এবং দু'বারই কর্ণেল শপে গিয়ে বিভিন্ন নমুনার দশ-বার জোড়া সেণ্ডেল এবং জুতা কিনেছিলাম। বোম্বাইতে ইসমতকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, 'মামলার ব্যাপারেই লাহোর গিয়েছিলেন তাহলে?' ইসমত চট করে জবাব দিল, 'না, জুতা কিনতে গিয়েছিলাম।'

সম্ভবত সাড়ে তিনবছর আগের কথা। হোলি উৎসবের দিন এসে গিয়েছিল। মিলাদে আমি এবং শাহেদ ব্যালকনিতে বসে পান করছিলাম। ইসমত আমার স্ত্রীকে এটা ওটা বলে উত্তেজিত করছিল। 'সাফিয়া, এরা এত টাকা অপচয় করছে, চলো আমরাও এদের দলে শরিক হয়ে যাই।'

এরা দু'জন এক ঘণ্টা ধরে একথা সেকথা বলছিল। এরি মধ্যে হঠাৎ ফিলামিস্তানের প্রডিউসর তার রাশভারী স্ত্রী এবং অন্যান্য লোকরা এসে আমাদের হামলা করে বসল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের আর চেনার উপায় ছিলনা। ইসমত হুইস্কি নিয়ে বসেছিল, তারও দৃষ্টি রং এর প্রতি আকৃষ্ট হলো। আর যায় কোথায়? বলল, 'চলো সাফিয়া আমরাও রং-এর খেলায় নেবে পড়ি।'

আমরা সবাই বাজারে নেবে এলাম। ঘোর বন্দর রোডে রীতিমত হোলি খেলা জমে উঠল। নীলা, হলুদ, সবুজ, কালো—সব রকম রং-এর খেলা চলছিল। ইসমতের সাথে কেউ এটে উঠতে পারছিলনা। একবার তো সে এক বাঙ্গালী ভদ্রমহিলার পুরো চেহারাটাই লেপ্টে দিল রং দিয়ে। এ সময় আমার হঠাৎ ইসমতের ভাই আজিম বেগ চুঘতাইর কথা মনে পড়ে গেল। ইসমত হঠাৎ বলে উঠল, 'চলো পরীরাণী নাসিম বানুর বাড়ীতে হানা দেয়া যাক।'

পরীরাণী নাসিমা বানু তখন আমাদের ছবি 'চল চলরে নওজোয়ানে' কাজ করছিল। ঘোড়বন্দর রোডের পাশেই ছিল তার বাংলো। ইসমতের

প্রস্তাবটা সকলের মতপুত হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নাসিমের বাড়ীতে যেয়ে উঠলাম। নাসিম স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় পুরো মেকআপ নিয়ে বসেছিল। চমৎকার রেশমী জর্জেটশাড়ী পরে ঠিক পরীরাণী হয়ে বসেছিল। আমাদের হৈ চৈ শুনে তার স্বামী এহসান বেরিয়ে এলো। ইসমতের অবস্থা নানা রং-এ একেবারে জবুস্থবু। আমার স্ত্রীকে আরো যদি কয়েকবার রং ছিটানো হয় তাহলে বেশ হয় আমার মতে। ইসমত নাসিমের প্রশংসা করে বলল,

'সাফিয়া, নাসিম সত্যি অপরূপ সুন্দরী।'

আমি নাসিমের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'সুন্দরী বটে, তবে নিস্তেজ ধরনের।'

রঙ্গিন চশমার কাচের আড়ালে ইসমতের ছোট বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটোতে দুষ্টুমির ঝিলিক খেলে উঠল। সে বলল, 'নিস্তেজ বটে, তবে রোমান্টিক চরিত্রের জন্যে এ ধরনের অভিব্যক্তি বেশ উপযোগী।'

একথা বলেই ইসমত একটু সামনের দিকে এগোল। পর মুহূর্তেই দেখা গেল পরীরাণী নাসিম সার্কাসের সং সেজেছে।

ইসমত ও আমি মাঝে মধ্যে আজগুবি ধরনের ভাবনা চিন্তা করতাম। একদিন ইসমত বলল, 'মাণ্টো ভাই, মোরগ-মুরগীদের রোমান্স নিয়ে একবার লিখলে কেমন হয়?' অথবা বলতো,
'ধ্যাৎ, আমার কিছুই ভাল লাগেনা। আমি অচিরেই সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে, উড়োজাহাজ চালাব।'

মাত্র কয়েক মাস আগের ঘটনা। আমি এবং ইসমত বোম্বে টকিজ থেকে ট্রামে বাড়ী ফিরছিলাম। কথায় কথায় আমি বললাম, 'কৃষণচন্দরের লেখায় আজকাল আমি দু'টো জিনিস প্রায়ই লক্ষ্য করি। তা হচ্ছে 'জিনা বিলজবর' (ধর্ষণ) এবং 'কাওস ও কাজা' (বর্ণিল স্বপ্নালোক, অতীন্দ্রিয় জগৎ বা ইন্দ্রলোক)।' ইসমত বলল, 'হাঁ ঠিকই ধরেছ।'

'আমি ভাবছি একটা প্রবন্ধ লিখব যার শিরোনাম থাকবে 'কৃষণচন্দর, জিনা বিলজবর এবং কাওস ও কাজা।' কিন্তু পরক্ষণেই ভাবছি জিনা বিলজবর এর সাথে কাওস ও কাজার মনস্তাত্বিক সম্পর্ক কি?'

ইসমত কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বলল, 'সৌন্দর্যের প্রশ্নে কাওস ও কাজার' বর্ণচ্ছটার মধ্যে রয়েছে অপরূপ আকর্ষণ। কিন্তু আপনি তো অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি উত্থাপন করেছিলেন। প্রবন্ধটা লিখুন তাহলে তাড়াতাড়ি।'

'শুনেছি খ্রীষ্টান চিত্রকলার লাল রং ঐশ্বরিক প্রেমের প্রতীক। না না··· (হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল) ক্রুসে বিদ্ধ করার সকল আয়োজনও লাল রং-এর সমবায়ে চিত্রিত করা হয়। কুমারী মেরির (মরিয়ম) আচ্ছাদন ও গাঢ়লাল রং-এর।'

বলেই আমি সাদা পোশাক পরিহিত ইসমতের দিকে তাকালাম। ইসমত হেসে দিল। 'মান্টো ভাই' আপনি এ প্রবন্ধটা অবশ্যই লিখুন। তবে 'বিল জবরটা' (বলপ্রয়োগ) উহ্য রাখুন।'

'কৃষণ চন্দর তাহলে রাগ করবে। বলপ্রয়োগ করে কার্যসম্পাদন করে বলেই তো মেয়েটি কান্নাকাটি করে।'

'বল প্রয়োগ করে বলেই কাঁদবে কেন? অলক্ষ্যে এই বল প্রয়োগই হয়ত নায়িকাটির ভাল লেগেছে।'

ইসমতের লেখা সম্পর্কে প্রচুর প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। স্বপক্ষে কম, বিপক্ষেই বেশী। কিছু কিছু নিবন্ধকার তো আকাশ পাতাল একত্র করেছেন তার সাহিত্য কর্ম আলোচনা করতে গিয়ে।

লাহোরের সাহিত্য জগতের ঠিকাদাররা যাকে কৌটা ভর্তি করে রেখেছিল সেই পেট্রিস সাহেব একবার কৌটার ভেতর থেকে হাত বের করে কলম হাতে নিলেন এবং ইসমত সম্পর্কে এক নিবন্ধ লিখলেন। লোকটি মোটামুটি পণ্ডিত, মনে রসিকতা রয়েছে পর্যাপ্ত, এজন্যে লেখাটা বেশ রসোত্তীর্ণ হয়েছিল। তিনি মেয়ে লেখিকাদের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'একজন শক্তিমান এবং পাকা ভূমিকা লেখকও (সালাউদ্দিন সাহেব) দেখছি মসিজীবীদের দল থেকে নরনারীদেরকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পাচ্ছেন। ইসমত সম্পর্কে তিনি (সালাহুদ্দিন) বলেন, মেয়ে লেখিকা হিসাবে উর্দু সাহিত্যে ইসমতের স্থান ইংরেজী সাহিত্যের জর্জ ইলিয়টের সমকক্ষ। মনে হয় সাহিত্য কর্মটা একধরনের টেনিস টুর্নামেন্ট যেখানে মেয়ে এবং ছেলেদের ম্যাচ আলাদা ভাবে খেলা হয়।'

এসব প্রশ্নাবলীর জবাব নিশ্চয়ই এমন নয় যে, শ্রেণীভেদ হিসাবে মেয়ে এবং পুরুষ লেখকদের দু'লাইনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু জবাব দানের সময় লোকরা অবশ্যই সর্বাগ্রে প্রশ্ন করবে প্রশ্নকারীটি কে? পুরুষ না মেয়ে? কেননা, কোন লিংগের মানুষ তা জানার পরই না বুঝা যাবে প্রশ্নকর্তার আসল দৃষ্টি ভঙ্গি কি?

পেট্রিস সাহেব যে বলেছেন, 'মনে হয় সাহিত্য কর্মটা এক ধরনের টেনিস টুর্নামেণ্ট যেখানে মেয়ে এবং ছেলেদের মেচ আলাদা ভাবে খেলা হয়' কথাটি নেহাৎ পেট্রিস-সুলভ বাগ্মিতা। টেনিস টুর্নামেণ্ট সাহিত্য কর্ম নয়, কিন্তু মেয়ে এবং ছেলেদের মেচ আলাদা অনুষ্ঠিত হলেও তেমন মহাভারত অশুদ্ধ হবার কথা নয়।

পেট্রিস সাহেব যখন ক্লাসে লেকচার দেন তখন ছাত্র এবং ছাত্রীদের তিনি আলাদা ভাবে সম্বোধন করেন না। কিন্তু ব্যাক্তিগত ভাবে যখন তিনি লেকচার শ্রোতাদের সংস্পর্শে আসেন এবং লেখা পড়া সম্পর্কে আদেশ উপদেশ দেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি ভুলে যান না যে, সে মেয়ে না ছেলে।

কোন মেয়ে যদি জর্জ ইলিয়ট বা ইসমত চুঘতাই হয়ে যায়, তার মানে এই নয়, তার সাহিত্য কর্মে লিঙ্গের প্রভাব সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করা হবে না। কোন ক্লীবলিঙ্গের সাহিত্যকর্মী সম্পর্কেও পেট্রিস সাহেব একই মত পোষণ করবেন কি?

আমি মেয়ের ওপর মেয়ের এবং পুরুষের উপর পুরুষের লেবেল লাগানোকে একটা পাগলামি বৈ কিছু মনে করি না। মসজিদ এবং মন্দিরে যদি সাইন বোর্ড টানিয়ে বলা হয় 'এখানে উপসনা করা হয়' তাহলে ব্যাপারটা হাস্যকর হবে না? কিন্তু যখন কোন মসজিদ বা মন্দিরের সামনে আমরা কোন বাসভবন বা প্রমোদভবন নির্মাণের চিন্তা করব, তখন নিশ্চয়ই এর পবিত্রতা সম্পর্কে আমরা একেবারে নির্লিপ্ত থাকব না।

ইসমতের মেয়ে হওয়ার স্বাক্ষর রয়েছে তার লেখার প্রতি ছত্রে ছত্রে যা বুঝবার জন্যে পদে পদে আমাদের দিক নির্দেশ করে। তার সাহিত্যের সৌন্দর্য এবং দৈন্য নিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে পেট্রিস সাহেব যে নিবন্ধ

লিখেছেন তা সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তারমতে কোন ক্রমেই লেখা থেকে তার লেখককে আলাদা করা যায় না। তা করার জন্যে না আছে কোন বিচার বিবেচনার পথ, না আছে রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

আজিজ আহমেদ সাহেব 'নয়া দৌর' পত্রিকায় ইসমতের 'টেরহী লকিড়'-এর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

'দেহগত পার্থক্য নিরূপণ করার জন্যে ইসমতের কাছে একই প্রক্রিয়া রয়েছে, তা হলো অনুভূতির যাদুকাঠি। অতএব রশিদ থেকে শুরু করে টেলর পর্যন্ত যে গোটা বিশেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এই উপন্যাসে, তাদের সকলকেই তিনি অনুভূতির যাদুস্পর্শে সনাক্ত করেছেন।, এই যাদুস্পর্শেই ইসমত মানুষকে চিনেছেন, জীবনকে দেখেছেন—সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করেছেন।'

আজিজ আহমদ অন্য এক নিবন্ধে বলেছেন ঃ

'ইসমতের গল্পের নায়িকার সবচে' বড় ট্রাজেডী হলো, সত্যিকার ভাবে না কোন পুরুষ তাকে কামনা করেছে, না সে কোন পুরুষকে প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করেছে। প্রেম এমন এক বস্তু যার সাথে দেহের সম্পর্ক হলো বিদ্যুতের সাথে তারের সম্পর্কের মতো। সুইচ অন করে দিলে মুহূর্তে এই বিদ্যুৎ হাজার হাজার বাল্বে আলো জ্বলে উঠে। দুপুরের গরমে 'বন্ বন্' পাখা ঘুরতে থাকে। জীবন যাত্রার সকল হুইল সচল হয়ে উঠে এই বিদ্যুতের স্পর্শে। কাপড়ের ইস্ত্রি, চুলকাটার মেশিন—সবই চলতে থাকে তখন নির্বিবাদে। বিদ্যুতের মতো প্রেমের এই প্রকৃতি সম্পর্কে একজন শিল্পী হিসাবে ইসমত চুঘতাই অবগত নন।'

স্বভাবতই বলা যায়। আজিজ আহমদ সাহেবের এজন্য আক্ষেপ রয়ে গেছে। কিন্তু আজিজ আহমদ সাহেব যে ধরনের প্রেম সম্পর্কে অবহিত, মনে হয় তিনি তা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পদ্ধতিতে তৈরী করেছেন এবং এখন তা সকল মানুষের জন্য ন্যস্ত করতে চান। আজিজ আহমদ সাহেবকে খুশী করার জন্যে আমি বলতে চাই যে, ইসমতের নায়িকা এই প্রেমের এ সি এবং ডি সি উভয় কারেন্ট সম্পর্কেই ওয়াকেফ-হাল। কিন্তু তার পরও এই ট্রাজেডী কেমন করে হলো যে, প্রাণ দিয়ে সে কাউকে ভাল বাসেনি এবং সেও কোন পুরুষের ভালবাসা পায় নি।

ইসমত সত্যি আজিজ আহমদ সাহেবের লিখিত প্রেম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং তার এই অনভিজ্ঞতাই সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা। যদি আজ তার জীবনের তারের সাথে এই প্রেমের বিদ্যুৎ সংযোগ করে দিয়ে সুইচ অন করে দেয়া যায় তাহলে সম্ভবত অন্য এক আজিজ আহমদ জন্মলাভ করবে। কিন্তু তেল, গিন্দা, ভুলভালাইয়া এবং জালের মতো গল্পের রচয়িতা ইসমত অবশ্যই মারা যাবে।

ইসমতের নাটক দুর্বল। নানা জায়গায় অসংযম। ইসমত প্লটকে বিভিন্ন দৃশ্যে মেপে কাঁচি দিয়ে কেটে বণ্টন করেন না। এমনি দাঁত দিয়ে কেটে ছিঁড়ে জোড়া তালি দিয়ে সাজান।

দলাদলির জগতে ইসমত নেই। এই জগতে ইসমত একেবারে নির্লিপ্ত, নির্বিকার। মেয়ে সত্তা ইসমতের একটি দুরারোগ্য ব্যাধির মতো সদা সঞ্চরমান। ইসমতের শৈশব কেটেছে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। পর্দার অন্তরালের ঘটনা বিবৃত করার ব্যাপারে ইসমতের পারদর্শিতা তুলনাহীন। সমাজের প্রতি ইসমতের ক্ষোভ নেই, ক্ষোভ রয়েছে ব্যক্তিত্বের প্রতি। ইসমতের কাছে দৈহিক কামনার পরিমাপ যন্ত্র হচ্ছে অনুভূতির পরশকাঠি। ইসমতের লেখার বিশেষ কোন ধাঁচ নেই। প্রতিটি বিষয়ে ইসমতের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা পাঠককে অভিভূত করে। ইসমত অশ্লীল। সূক্ষ্ম রসিকতা ও হালকা টিপ্পনী ইসমতের লেখার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইসমত তলোয়ারের ধারের উপর পদচালনা করে।

ইসমত সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হলো। আরো লেখা হবে অনাগত দিনগুলোতে। কেউ তাকে পসন্দ করবে, কেউ করবে না। কিন্তু লোকদের পসন্দ অপসন্দের ঊর্ধ্বে রয়েছে ইসমতের লেখার অসীম ক্ষমতা। ভালো, মন্দ, নগ্ন, প্রচ্ছন্ন—সব কিছুতেই তার অবাধ বিচরণ। সাহিত্যে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। তাকে নিয়ম-কানুন ও ভৌগোলিক সীমারেখার আওতা মুক্ত রাখাই সমীচীন।

কিছুদিন হলো দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পত্রিকা 'দেশ' এক আজব ধরনের কারবার করে বসল। "আমার জবানীতে অপরের কাহিনী শোন, পড়লে অনেকের উপকার হবে" এ ধরনের শিরোনামে এক স্তম্ভ প্রকাশ করল। তাতে আমার, ইসমত, মুফতী, প্রেমচান্দ, খাজা শফি এবং

আজিম বেগ চুঘতাইর গল্প সন্নিবেশ করা হলো। অথচ ভূমিকায় প্রগতিশীল সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে দাঁত-মুখ খিঁচে একচোট নেয়া হলো। তার এই কীর্তিকে দুটি ছোট ছোট শিশুর নামে উৎসর্গ করা হলো। এর এক কপি আমার জন্যে এবং এক কপি ইসমতের নামে পাঠানো হলো। 'দেশ'-এর এই অশোভন ও অপসন্দনীয় কারবারে ইসমত যারপর নাই বিরক্ত হলো। অনেক অনুযোগ করে সে আমাকে লিখল ঃ

'মাণ্টোভাই 'দেশ' নামে যে পত্রিকাটি বেরিয়েছে তা আপনি দেখেছেন কি? আদ্যোপান্ত পড়ে দেখুন এবং ওদের নামে একটা নোটিশ ইস্যু করুন। নিরপেক্ষ ভাবে প্রতিটি নিবন্ধের জন্যে দু'শো টাকা করে জরিমানা দাও, অন্যথায় মামলা ঠুকে দোব। কিছু একটা হওয়া উচিত। আপনিই বলুন কি করা যায়। বেশ তো, যার ইচ্ছা সে-ই আমাদের এভাবে কাদা ছিটাবে আর আমরা এভাবে বসে থাকব? বেশ মজা হবে। লোকটিকে ধমক দিন, তুমি যদি নগ্ন বা যৌন বিষয়ক গল্পের বিরোধী হও, তাহলে তা আবার তোমার কাগজে ছাপলে কেমন করে? তোমার কাগজের কাটতির জন্যে ভাল ফন্দি এঁটেছ দেখছি। এই বুঝি আমাদের কপালে ছিল, আজে বাজে গোমূর্খদের কথা শুনতে হবে আমাদের। আমার চিঠির মর্ম অনুযায়ী আপনি লেখা তৈরী করুন। আপনি বলবেন, আমি কেন লিখছিনা। আপনি থাকতে আমি লিখব, এ কেমন কথা?'

যখন ইসমতের সাথে দেখা হলো চিঠি সম্পর্কে বললাম, 'সর্বাগ্রে লাহোরের চৌধুরী মোহাম্মদ হোসাইন-এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। আমরা আবেদন করলে তিনি নিজেই মামলা ঠুকে দেবেন।'

ইসমত বলল 'প্রস্তাব তো মন্দ না। কিন্তু মুশকিল হলো, তার আগে না আমাদেরকেই ধরে নিয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'কি বললে? আদালত কাঠ খোট্টা জায়গা বটে, কর্ণেল শপতো বেশ মনোরম জায়গা। মিঃ দেশকে সেখানেই নিয়ে যাব।'

শুনে ইসমতের কপোল আরক্ত হয়ে উঠল সহসা।

কবি আখতার শিরানী

আল্লা জানে এরিমধ্যে কত বছর গত হয়ে গেছে। স্মৃতিশক্তি এত দুর্বল যে, নাম, সন এবং তারিখ কিছুই মনে নেই। অমৃতসরে গাজী আবদুর রহমান সাহেব দৈনিক 'মাসাওয়াত' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। এর সম্পাদনার জন্য বারী সাহেব (আলীগড়) এবং আবুল আলা চিশতী আস্ সাহাফীকে (হাজী লকলক খ্যাত) ডেকে পাঠানো হলো। এ সময় আমার ভবঘুরে জীবন চরম পর্যায়ে। দিনভর সারা শহর চষে বেড়াতাম। মন-মেজাজ বিগড়ে থাকতো। এসময় আমি টের পাইনি, তবে পরে বুঝতে পেরেছি, আমার নিজের জন্যে মস্তিষ্কটা সারাক্ষণ পথ খুঁজে পাবার জন্যে মাথা কুটে মরত। জিজের হোটেলে (সিরাজ) প্রায় প্রতিদিনই আড্ডা বসত গাল-গল্পের। বালা, আনোয়ার পেইণ্টার, আশেক ফটোগ্রাফার, ফকির হোসেন এবং আরো এক ব্যক্তি যার নাম আমি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না, রীতিমত এই আড্ডায় শামিল হতো। সব রকম বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা হতো। বালা বেশ বলতে পারতো ভালো। মন মেজাজটাও ছিল তার রোমান্টিক। যেদিন সে অনুপস্থিত থাকত আসর মোটেই জমতোনা আমাদের। ভালো কবিতা রচনা করতে পারতো। তার কবিতার এক চরণ আমার এখনও বেশ মনে আছে।

আশ্‌ক্ মুজগাঁ পে হায়
আটক্‌ছা গ্যায়া,
নোক ছি চুভ্ গেয়ি হ্যায়
ছালে মে।

জিজে থেকে শুরু করে আনোয়ার পেইণ্টার পর্যন্ত সংগীত এবং কাব্যচর্চার ব্যাপারে কম যেতোনা। আর যে ভদ্রলোকের নাম ভুলে গিয়েছিলাম তার নাম হচ্ছে ক্যাপ্টেন ওয়াহিদ। নীল নীল একজোড়া চোখ। শক্ত সুঠাম লম্বা চওড়া একজন দশাসই লোক। তার প্রিয় হবি ছিল শ্বেতাঙ্গদের ঠেঙানো। তিনি বেশ ক'জন ইংরেজকে পিটিয়েছেন। বেশ চোস্ত ইংরেজী বলতে পারেন। অভিজ্ঞ তবলচীদের মতো তবলা বাজাতে পারতেন।

এ সময় জিজের হোটেলে আখতার শিরানী নামক একজন কবি সম্পর্কে বেশ আলাপ-সালাপ হতো। প্রায় প্রতিটি সভা-সমিতিতে তার কবিতা এবং গজল গাওয়া হতো। জিজে প্রায়শঃ 'ম্যায় আপ্‌নে ইশ্‌ক মে ছব কুছ তাবাহ্‌ কর লোঙ্গা' (সম্ভবত এ চরণ হুবহু এরকম নয়) গুন গুন করে গাইত। অর্থাৎ আমার প্রেমের জন্য সব কিছু বিলিয়ে দোব। এধরনের একটা প্রেমাবেগ তখন প্রায় সকলের মনেই সঞ্চারিত ছিল। দয়িতাকে উদ্দেশ্য করে এধরনের একটা চ্যালেঞ্জ তখন বেশ মনঃপূত ছিল সকলের জন্য। জিজে আখতার শিরানীর নামে একেবারে পাগল ছিল। কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে পয়সা উসুল করছে আর গাইছে, 'আয় ইশ্‌ক্‌ কাহিলে চল মুঝে'। অথবা মোসাফিরদের কামরা দেখিয়ে দিচ্ছে আর গাইছে 'কেয়া বিগাড় জায়েগা রাহ যাও এহিঁ রাত কি রাত'।

আশেক ফটোগ্রাফারের কণ্ঠস্বর যদিও কিছুটা পাতলা ধরনের ছিল তবু তার কণ্ঠে 'আয় ইশ্‌ক্‌ কাহিঁলে চল' অপূর্ব শোনাতো। আমি যখনই তার মুখে এ গান শুনতাম, আমি ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে উঠতাম। তখনকার দিনগুলোতে যেহেতু মনটা ছিল উদাস ও নানা অনিশ্চয়তায় ভারাক্রান্ত, তাই এসব গান আমাকে দূরে বহু দূরে স্বপ্নালোকে নিয়ে যেতো। হারিয়ে যেতাম আবেগের অথৈ পাথারে।

এতকাল চলে গেছে, কিন্তু তখনকার সে সময়ের মানসিক প্রতিক্রিয় এখনও যেন আমি অনুভব করি। তখনকার দিনগুলোর ভাবনা চিন্তাই ছিল অন্যরকম। জিজের হোটেলের প্রায়ান্ধকার অথচ শীতল প্রকোষ্ঠে বসে আমি চিন্তা করতাম, আমি একটা দোলায়মান নৌকাতে বসে আছি।

নৌকায় চারদিকে পরীরা আমাকে নাগর দোলা দিচ্ছে। সময়টা ছিল রাতের বেলা, তাই পরীদের চাক্ষুষ দেখিনি, দেখেছি শুধু ছায়ার মিছিল। ওদিকে সমুদ্রের তাণ্ডব শান্ত হয়ে এসেছে। নৌকাগুলো হালছাড়া ভেসে যাচ্ছে ধীরে ধীরে যেন অজানার উদ্দেশ্যে। এই পাপের পৃথিবী পেছনে রয়ে গেছে আর আমরা চলেছি কলরব পূর্ণ এই পৃথিবীকে পেছনে রেখে হাজার হাজার মাইল সামনের দিকে।

জিজের হোটেলে কিছুদিন পর বারী সাহেব এবং চিশ্‌তী সাহেবেরও আনাগোনা শুরু হলো। দু'জনেই এসে খাবার খেতেন অথবা চা পান করে চলে যেতেন। কিন্তু জিজে যখন জানতে পারল যে, এরা দু'জন খবরের কাগজের লোক তখন গায়ে পড়ে পরিচয় করে একটা মোটামুটি সম্পর্ক তৈরী করে নিল।

বারী সাহেব আখতার শিরানীর কাব্য-কর্ম সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন। কিন্তু ব্যাক্তিগতভাবে এই কবিকে জানতেন না। চিস্তি সাহেব বেশ কিছুকাল বাগদাদ এবং মিসর ইত্যাদি জায়গা পরিভ্রমণ করে সবে নতুন এসেছেন। এ জন্যে এখানকার কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তিনি তেমন খোঁজ খবর রাখতেন না। কিন্তু তিনি জিজের কাছে আখতার শিরানীর কবিতার উদ্ধৃতি শুনে বেশ মুগ্ধ হন।

এ সময় আমিও বারী সাহেবের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ি। তাঁর সহজ সরলতা এবং সাহিত্যিকসুলভ রসিকতা আমার বেশ লাগত। মানসিক দিক থেকে প্রভাবান্বিত করে ক্রমান্বয়ে আমাকে সাংবাদিকতার দিকে আকৃষ্ট করেন তিনি। সাহিত্য সাধনার ব্যাপারেও তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করেন। প্রথম দিকে আমি তীর্থরাম ফিরোজপুরীর উপন্যাস পাঠ করি। অতঃপর বারী সাহেবের নির্দেশক্রমে আমি অস্কার ওয়াইল্ড ও ভিক্টর হুগোর লেখা পাঠ করি। হুগোর লেখা আমার বেশ পছন্দ হতো। পরে আমি উপলব্ধি করলাম এই ফরাসী লেখকের ধাঁচটি বারী সাহেবের লেখায় ছায়াপাত করেছে।

আজকাল লেখার জগতে যেটুকু আমার খ্যাতি, তার মূলে রয়েছে বারী সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতা। যদি অমৃতসরে এই গুণী লোকটির সাথে

আমার দেখা না হতো এবং মাস তিনেক আমি তাঁর সাহচর্য না পেতাম তাহলে হয়ত এ লাইনে আমি কোনদিনই আসতাম না।

যেহেতু আমি ততদিনে সাহিত্য সম্পর্কে বেশ অনেক কিছু রপ্ত করেছি, এজন্যে আমি আখতার শিরানীর লেখাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু করলাম। তার কাব্য বেশ ঝরঝরে এবং হাল্কা রোমান্টিক ধাঁচের ছিল। আজ আমার বেশ মনে হচ্ছে, আখতার শিরানী নিছক কলেজ ছাত্রদের কবি ছিলেন। এরা হচ্ছে এক বিশেষ বয়েসের তরুণ, যাদের মনমগজে শুধু রোমান্টিকতা কিলবিল করে। আমিও এই জগতে পা রাখতে সচেষ্ট হলাম। এক বন্ধু জানাল আখতার শিরানী এদিকে এসেছেন এবং 'সিরাজ হোটেলে' উঠেছেন। তখনই রওনা দিয়ে সেখানে পৌঁছলাম। কিন্তু পৌঁছে দেখি তিনি নেই, জিজেকে নিয়ে কোথাও যেন বেরিয়ে পড়েছেন। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম কিন্তু তারা দু'জন আর এলোনা।

সন্ধ্যার দিকে পৌঁছলে সিন্ধি বাবুর্চি এসে জানাল, সবাইকে নিয়ে উপরে আসর জমিয়ে বসেছেন। দুরু দুরু বুকে উপরের দিকে রওনা হলাম। বেশ সাজগোজ করে চারপেয়ের উপর বিছানা পাতানো হয়েছে চারদিকে কিছু চেয়ারও ছিল। দেশী মদের প্রবাহ চলছিল। আমার চেনাজানা দশ-বারজন লোক বসেছিল। শুধু একটি মুখ অচেনা আর তাহলো শিরানীর মুখ। বেশ দশাসই দেহসৌষ্ঠব, চওড়া কপাল, মোটা নাক, মোটা ঠোঁট, গাঢ় শ্যামলা রং, ঘাড় অবধি চুল, চোখ দুটো বড় বড় এবং আকর্ষণীয়, তবে কিছুটা উদাসীনতা ছেয়েছিল তাতে। সাদাসিধে বাজারী উর্দুতে সবাইর সাথে কথা বলছিলেন।

আমি কাছে পৌঁছুতেই বালে আমাকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। বেশ আন্তরিকতার সাথে আমাকে স্বাগত জানালেন এবং বসতে বললেন। আমি চারপেয়ের একেবারে কাছের চেয়ারটিতে বসে পড়লাম। আখতার সাহেব জিজের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আজিজ (আমার দিকে চেয়ে), এর জন্য গ্লাসের বন্দোবস্ত করো।'

গ্লাস আসার পর আখতার সাহেব নিজেই আমার জন্যে এক পেগ তৈরী করে দিলেন। আমি তা ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রহণ করলাম। কে

যেন আখতার সাহেবকে ধরে বসল তার কবিতা শোনার জন্যে। তিনি বললেন, 'না ভাই, আজ আমি কিছু শোনাব না, বরং শুনব।' তারপর জিজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, আজিজ শোনাও তো,

রসিলি আংখিরিউঁ ছে নিন্দ
বরসাতে হুয়ে আনা।'

এই চরণ বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস টানলেন অলক্ষ্যে। মনে হলো অতীত কোন স্মৃতি হঠাৎ মনে পড়ে গেছে। জিজের কোন সাধ্য ছিল না এই আদেশ লংঘন করে। গলাটা একবার সাফ করে নিয়ে আখতার সাহেবের একটি বিখ্যাত গজল গাইতে শুরু করল। সুর লয় সবই ঠিক ছিল, তবে গলাটা একটু ফ্যাকাশে। তবুও বেশ জমে উঠল। ওদিকে আখতার সাহেব পান করছিলেন এবং ঝিমুচ্ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন দুপুরের দিকে আমি সিরাজ হোটেলে আখতার সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। তিনি কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে গিয়েছেন। এ সময় বোরখা পরিহিতা জনৈকা মহিলা টাঙ্গা গাড়ীতে চড়ে এলেন। তিনি একজন ভৃত্যকে আখতার সাহেবের খোঁজ জিজ্ঞেস করলেন। সে জানাল, 'তিনি বাইরে গেছেন, আপনার নামটা বলে যান।' কিন্তু বোরখাধারিণী নাম না বলেই চলে গেল।

আখতার সাহেব আসার পর আমি সেই মহিলার কথা বললাম। তিনি খুবই কবি-সুলভ চাহনি নিক্ষেপ করে আমার সব কথা শুনলেন। ফলে, এই মহিলা এক রহস্য হয়ে বিরাজ করতে লাগল আমার মনে। রাতের খাবারের পূর্বে যখন একপালা আসর বসল, জিজে পুনরায় সেই বোরখা পরিহিতা মহিলার কথা বলল, 'হজরত, কে এই ভদ্রমহিলা যিনি আজ দুপুরের দিকে পদার্পণ করেছিলেন?'

আখতার সাহেব মুচকি হাসলেন এবং কৌশলে জবাব এড়িয়ে গেলেন। এবারে বালে বলল, 'সালমা সাহেবা এসেছিলেন বুঝি?'

আখতার সাহেব হেসে উঠে তার গালে একটা চড় মারলেন এবং শুধু বললেন, 'দুষ্টু কোথাকার'। ব্যাপারটি আরো রহস্যময় হয়ে উঠল; যা অদ্যাবধি রহস্য হয়ে রইল। জানিনা এই বোরখা পরিহিতা ভদ্রমহিলা কে ছিলেন। তবে তখন আরো এতটুকু জানতে পেরেছিলাম যে,

আখতার সাহেবের চলে যাবার পরও এই অদৃশ্যময়ী মহিলা একবার এসে আখতার সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

পালাক্রমে সবাই আখতার সাহেবকে নিমন্ত্রণ করতো এবং তা সিরাজ হোটেলেই সম্পন্ন হতো। নিমন্ত্রণের পদ্ধতি ছিল এইরকম, রাতদিন যত বোতল মদ শেষ করা হতো নিমন্ত্রণকারীকে তার দাম চুকিয়ে দিতে হতো। আমিও এই পদ্ধতির অনুসরণ করলাম এবং এক সন্ধ্যায় দুই বোতল স্কোয়াস হুইস্কি নিয়ে হাজির হলাম। বোতলের কাগজটা তুলে ফেললাম। তা দেখে আখতার সাহেব বললেন,

'এটা তুমি কি করলে? দেশী মদই তো ভাল ছিল। এক বোতলের বদলে না হয় দু'বোতলই লাগতো, এই তো।'

আমি বললাম,

'এটা শেষ হলে আরো আসবে।'

'সেটা শেষ হলে?' আখতার সাহেব মুচকি হেসে বললেন।

আমি বললাম,

'দরকার হলে আরো আসবে।'

তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বেঁচে বর্তে থাকো বেটা।'

দু'বোতলই শেষ হলো। আমার মনে হলো, আখতার সাহেব স্কোয়াস-এ খুব একটা জুৎ পাচ্ছেন না। তাই আমি বেয়ারাকে দিয়ে অমৃতসর ডিস্টিলারীর এক বোতল আনালাম। তাতে আখতার সাহেবের যেটুকু তৃষ্ণা বাকী ছিল, মিটিয়ে নিলেন।

যেহেতু এই মহফিল নিছক সাহিত্য বিষয়ক ছিলনা, আখতার সাহেবের ভক্তদের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছিল, এজন্যে শুধু তাঁরই কবিতা পাঠ হতো গজল গাওয়া হতো। কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে অন্য কোন শিক্ষণীয় কিছু আলাপ হতোনা। তবে আখতার সাহেবের আলাপ আলোচনা থেকে আমি আঁচ করে নিয়েছিলাম, এব্যাপারে তাঁর জানাশুনা অত্যন্ত গভীর।

এর কিছুকাল পর আমি আখতার সাহেবকে আমাদের বাসায় দাওয়াত করে নিলাম। তবে তা ছিল শুধু চায়ের দাওয়াত। কিন্তু আখতার

সাহেবের চা পানে কোন আসক্তি ছিলনা। তবু আমার অনুরোধক্রমে তিনি বাধ্য হয়ে এক পেয়ালা চা পান করলেন।

এসব মহফিলে বারী সাহেব খুব কমই আসতেন। তবে চিস্তি সাহেবের পানাভ্যাস আখতার সাহেবের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী ছিল। তিনি এই মহফিলে আসতেন এবং স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনাতেন, তবে তা ছিল খুবই রসকষহীন।

আখতার সাহেব প্রায় দশদিন অমৃতসরে অবস্থান করেছিলেন। এ সময় তিনি জিজের পীড়াপীড়িতে 'সিরাজ হোটেল' সম্পর্কে একটি কবিতা লেখেন। জিজে এই কবিতাটি বারী সাহেবের সহযোগিতায় বড় কাগজে সুন্দরভাবে 'খোশখত' করে লিখিয়ে আয়নাতে বাঁধাই করে হোটেলের শোভা বর্ধনের চেষ্টা করে। জিজে খুব খুশী হয়েছিল কেননা কবিতায় তার নামোল্লেখ করা হয়েছিল।

আখতার সাহেব চলে যাওয়ার পর জিজের হোটেলের জৌলুষ কমে গেল যেন।

বারী সাহেবও মাস তিনেক অমৃতসরে ছিলেন। এ সময় তিনি আমাকে দিয়ে ভিক্টর হুগোর একটি বই 'ছেরগুজাস্তে আসির' নাম দিয়ে অনুবাদ করালেন। কিন্তু এটা যখন প্রেস থেকে ছেপে বাজারে এলো, তখন তিনি লাহোরে চলে গেছেন। ছাপানো বইটা দেখে আমি বেশ উৎসাহ বোধ করি এবং এ ধরনের আরো কিছু অনুবাদ করার ইচ্ছা পোষণ করলাম। অতএব আমি অস্কার ওয়াইল্ড এর 'ভিরা' অনুবাদে হাত দেই। অনুবাদ শেষ করে আমি বারী সাহেবকে সংশোধন করার জন্য দিলাম। কিন্তু তিনি কাটছাট তেমন করতেন না। অনেক জায়গায় ভাষার ভুল থেকে যেতো, কিন্তু সে সম্পর্কে তাঁকে কিছু বলাও একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার ছিল। শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক করলাম পাণ্ডুলিপি খানি আখতার সাহেবকে দেখাব।

আরব হোটেলে যাতায়াত করতাম বলে মুজাফফর হোসেন শামীম সাহেবের সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল।

আমি পাণ্ডুলিপি সংশোধনের কথা পাড়তেই তিনি আমাকে তক্ষুণি আখতার সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। ছোটমতো নোংরা একটা

কামরা। চারপেয়েতে একটা আয়েশী বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। সালাম বিনিময় হলো। আমাকে চিনতে আখতার সাহেবের তেমন কোন কষ্ট হয়নি। সিরাজ হোটেলের ইয়ার দোস্তদের কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি যা জানতাম তা বললাম।

শামীম সাহেব এবং আখতার সাহেবের কথাবার্তার মধ্যে বেশ লৌকিকতা পরিলক্ষিত হলো। কিন্তু আমাকে কে একজন বলেছিল, এরা দুজন এককালে 'হরিহর আত্মা' বলে পরিচিত ছিল। শামীম সাহেব আমার উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করলেন। তিনি স্বচ্ছন্দে রাজী হয়ে বললেন, 'আমি আজ রাতেই পুরো পাণ্ডুলিপি দেখে ফেলব।'

আখতার সাহেব বুকের সাথে রেখে একটা বালিশ দিয়ে চাপ দিচ্ছিলেন। কেননা কিছুক্ষণ পর পর সেখানে ব্যথা উঠত। এসময় তাঁর যকৃত প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল বলে শোনা যায়। আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সন্ধ্যায় আসব বলে শামীম সাহেবকে নিয়ে আরব হোটেলে চলে এলাম। তিনি আমাকে ইঙ্গিতে বললেন, যদি তুমি আখতার সাহেবকে দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজটা করিয়ে নিতে চাও তাহলে 'সেই বস্তু' নিয়ে যাও যেন।

সন্ধ্যায় আমি যখন আখতার সাহেবের কাছে পৌঁছুলাম, আমার বগলে সেই বস্তু ছিল। আমি ভয়ে ভয়ে বোতলটি বের করে তাঁর সামনে রেখে বললাম, 'এখানে এসব চলে কিনা আমি ঠিক জানিনা। ক্ষমা করবেন যদি কোন বে আদবী করে থাকি।'

দেখে আখতার সাহেবের চোখে মুখে এক আলোর দ্যুতি খেলে গেল যেন। মনে হলো সকাল থেকে এই বস্তু তাঁর গলায় এক ফোঁটাও পড়েনি। মুচকি হেসে সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'মদপান কেন বে আদবী হতে যাবে?'

একথা বলে আমার হাত থেকে বোতলটা নিলেন, হাতের বালিশটা নিচে রেখে দিয়ে বোতল ঝাঁকাতে লাগলেন যাতে করে কর্কটা বেরিয়ে আসে।

কথায় কথায় এবং পান করতে করতে রাত অনেক হয়ে এলো। ততক্ষণে আখতার সাহেবের খাবার এলো। খাবার যে ভাবে এলো

তাতে মনে হলো সংসারের সাথে তাঁর সম্পর্ক ভাল যাচ্ছেনা। এরপর সত্যি সত্যি জানতে পারলাম। তাঁর পিতা হাফেজ মাহমুদ শিরানী সাহেব (মরহুম) তাঁর পানাভ্যাসের দরুন খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু শেষাবধি তাঁর সাথে আর না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

রাত অনেক হয়ে এলে আমি আখতার সাহেবকে পাণ্ডুলিপির কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি পাণ্ডুলিপিতে হাত দিলেন এবং পাতায় পাতায় সংশোধন করে যেতে লাগলেন। কয়েক পাতা সংশোধন করার পর তিনি অস্কার ওয়াইল্ড-এর বিচিত্র জীবন সম্পর্কে কথা তুললেন। সম্ভবত তিনি অন্য কারো কাছে এসব কথা শুনেছেন। অস্কার ওয়াইল্ড এবং লর্ড আলফ্রেড ডগলাস-এর প্রেমজীবন সম্পর্কে রসিয়ে রসিয়ে বলতে লাগলেন। ওয়াইল্ড কি ভাবে গ্রেফতার হলেন তাও বললেন। সহসা তাঁর আলোচনার মোড় ঘুরে গেল লর্ড বায়রনের দিকে। এই কবির সব কিছু তাঁর বেশ পসন্দ। তাঁর অসংখ্য প্রেমাভিনয় আখতার সাহেবের মতে আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। পরে আমি জানতে পেরেছি, আখতার সাহেব লর্ড বায়রনের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু গজল এবং কবিতা লিখেছেন।

লর্ড বায়রন এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির হৃদয়হীন বেপরোয়া ধরনের লোক ছিলেন। তা ছাড়া বৈষয়িক দিক থেকে তিনি একজন নবাব ছিলেন। অপরিসীম ধনরত্নের অধিকারী ছিলেন। আখতার সাহেব ছিলেন অভাবী, দয়ালু এবং বন্ধুবৎসল। বায়রন উৎকৃষ্ট মদ খেতেন আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আর আখতার সাহেব অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে চোলাই মদ সংগ্রহ করেন। বায়রনের দেশ ও কাব্য-পরিবেশ ছিল একরকম আর আখতার সাহেবের অন্যরকম। আখতার হাজার চেষ্টা করেও কোনদিন লর্ড বায়রন হতে পারবেন না। কিন্তু তার পরও তিনি তাঁর মানসিক প্রশান্তির জন্য দুজন প্রেমিকার অস্তিত্বের সৃষ্টি করে নিয়েছেন। এরা দুজন হলেন সালমা এবং আজরা।

সালমা সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত। কারো মতে, সত্যিকার ভাবে সালমার কোন অস্তিত্ব ছিল না। তবে আখতারের কবিতায় যে সালমার সাক্ষাৎ মেলে তা নিছক কবিতার অস্তিত্বেই সীমাবদ্ধ। কবিতায় যে সালমাকে উপস্থাপিত করা হয় তার রূপ-গুণের বর্ণনা অপরিসীম।

সত্যি, সালমা যদি বাস্তবের কোন রক্ত-মাংসের মেয়ে হতো, তার সাথে আখতার এতখানি চুটিয়ে প্রেম করতে পারতো না। সালমা তাঁর কল্প-লোকের দেবী বলেই এতখানি অবারিত প্রেমাভিনয় করা সম্ভব হয়েছে।

লর্ড বায়রনের কথা শুনতে শুনতে আমার ঘুম এসে গেল। সেখানেই শুয়ে পড়লাম। সকালে চোখ খুলে দেখি আখতার সাহেব শান্তমনে পাণ্ডুলিপি দেখে চলেছেন। পাশের বোতলে সামান্য কিছু ছিল। তা ঢেলে নিয়ে শেষ চুমুক দিলেন এবং আমার পাণ্ডুলিপি দেখাও শেষ হয়ে এলো। দেখা শেষ করে পাণ্ডুলিপি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'অনুবাদ বেশ পছন্দ হয়েছে, তবে স্থানে স্থানে ভাষাগত ভুল ছিল আমি তা সংশোধন করে দিয়েছি।'

আমি ভাবগদগদ হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম এবং অমৃতসর রওনা হয়ে এলাম। এরপর যখনই আমি লাহোরে যেতাম আখতার সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করতাম। একবার যেয়ে দেখি আখতার সাহেবের মাথায় ব্যাণ্ডেজ। জিজ্ঞেস করার পর বললেন, 'আমার তো কোন কিছুই মনে নেই। তবে লোকেরা বলছিল গতরাতে আমি টাংগা ঘোড়ায় চড়ার চেষ্টা করতে যেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম এবং তাতেই এ অবস্থা হয়েছে।'

আখতার সাহেবের ব্যক্তিগত ব্যাপারে এই স্পষ্টভাষণ আমার বেশ ভাল লাগল। তিনি কোন কোন সময় একেবারে শিশু-সুলভ ব্যবহার করতেন। চাল চলনে, ব্যবহারে একেবারে শিশু বনে যেতেন এবং শিশু-জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতেন।

এর কিছুকাল পর আমি বোম্বে চলে গেলাম। কিন্তু তেমন ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠেনি বলে চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়নি। তবে তিনি যখন 'রোমান' পত্রিকা প্রকাশ করেন আমি ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখলাম। তখন আমি বেশ ভাল গল্প লিখিয়ে হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছি। অনুবাদ কর্ম ছেড়ে এসেছি লাহোর এবং অমৃতসরেই। মৌলিক গল্প লিখিয়ে হিসাবে মোটামুটি একটা স্বীকৃতি হয়ে গেছে আমার তখন। একবার 'রোমান'-এ প্রকাশিত আহমদ নদীম কাশেমীর একটা গল্প আমার খুব ভাল লেগেছিল। বোম্বের 'মোসাওয়ার' পত্রিকায় প্রকাশিত এক

নিবন্ধে আমি 'রোমান'-এর এই গল্পের ভূয়সী প্রশংসা করি। তাছাড়া আখতার সাহেবকে লিখিত আলাদা এক পত্রেও এই গল্পের খুব প্রশংসা করলাম। এর কিছুদিন পরই আহমদ নদীম কাশেমীর পক্ষ থেকে এক দীর্ঘ চিঠি এলো অজস্র ধন্যবাদ ও অফুরন্ত ভালবাসার নিদর্শন হিসাবে। এরপর আমাদের মাঝে নিয়মিত চিঠিপত্র আদান-প্রদান হতো।

কিছুকাল চলার পর 'রোমান' বন্ধ হয়ে গেল। আখতার শিরানীর সাথে আমার তখন থেকেই আর কোন যোগাযোগ ছিল না। এর মধ্যে বেশ কয়েক বছর গত হলো। রাজনৈতিক আকাশে নানা পটপরিবর্তন হলো। এমন কি দেশের ভৌগোলিক পরিবর্তন হলো। ভাগ-বাটোয়ারার পূর্বলগ্নে দেশময় যে হৈ-হুল্লোড় ও অরাজকতা হলো সে সম্পর্কে আপনারা সকলেই সুবিদিত। এ সময় হঠাৎ কাগজে খবর ছাপা হলো যে, আখতার সাহেব 'টুংক' থেকে পাকিস্তান আসছিলেন, পথিমধ্যে দুষ্কৃতিকারীরা তাঁকে হত্যা করে। আমি, ইসমত ও শাহেদ লতিফ তা শুনে মর্মাহত হই এবং তাঁর সম্পর্কে নানা স্মৃতিচারণা করি।

বেশ ক'টি পত্রিকাতেই তাঁর মৃত্যুর খবর ফলাও করে ছাপা হয়। তাঁর পুরনো কবিতা ও তাঁর কাব্যকর্ম সম্পর্কে নিবন্ধ ছাপা হলো। কিন্তু কিছুদিন পর পাল্টা খবর ছাপা হলো যে, তিনি বেঁচে আছেন এবং দিব্যি লাহোরে বসবাস করছেন। একথা শুনে বোম্বের সাহিত্য-জগতে একটা স্বস্তি ফিরে এলো।

দেশ ভাগাভাগির পাঁচ মাস পর আমি লাহোরে চলে এলাম। কেননা, সকল আত্মীয় পরিজন এখানে এসে জমা হয়েছেন। চারদিকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এবং অস্থিরতা বিরাজমান। আখতার সাহেবের সাথে দেখা করব এমন একটা চিন্তা করার মতো মানসিকতাও ছিলনা। দীর্ঘকাল পর ইকবাল দিবসে আমি তাঁকে একবারের মতো দেখেছিলাম। দুঃখ দারিদ্র ও নানা সমস্যায় জর্জরিত মনে হলো তাঁকে।

রাতের অধিবেশনের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল আখতার সাহেবের। ইউনিভারসিটি হলে লোকে লোকারণ্য। এই অধিবেশনে অংশ গ্রহণের জন্য হিন্দুস্থান থেকে সর্দার জাফরী ও কায়ফী আজমী প্রমুখ এসেছেন। অধিবেশনের সময় হয়ে এসেছে, কিন্তু সভাপতির কোন খবর নেই।

আমি সাহের লুধিয়ানভীকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আখতার সাহেব হলের বাইরে দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে মদপান করছেন। তাঁর অবস্থা কোন অবস্থাতেই সভাপতিত্ব করার মতো ছিলনা। কিন্তু তিনি নাছোর বান্দা, সভাপতিত্ব তিনি করবেনই।

আমি বাইরে গিয়ে দেখি তিনি সত্যি দেয়ালের সাথে দাঁড়িয়ে পান করছেন। জহির কাশ্মিরী বোতল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। গ্লাসের শেষ চুমুকটি দিয়ে জহিরকে বললেন, 'চলো, সময় হয়ে গেছে।' কিন্তু ভেতর থেকে কবিতা আবৃত্তির আওয়াজ আসছিল। কথা বলতে তাঁর কণ্ঠ জড়িয়ে আসছিল। বললেন, 'অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে, আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি।' বলেই তিনি জহির কাশ্মিরীকে ধাক্কা দিয়ে চলতে শুরু করলেন। এ সময় আমি তাঁর সামনে এগিয়ে গেলাম। প্রথমত তিনি আমাকে চিনতে পারেন নি। নেশায় ক্রমশ তিনি বুঁদ হয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর গা নাড়া দিয়ে বললাম, আমি মান্টো। এবারে তিনি আমাকে চিনলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন। কিন্তু যেহেতু নেশাগ্রস্ত ছিলেন, এজন্য কোন কিছুই তার কণ্ঠ থেকে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল না। জহির আমার কানে কানে বলল, আমরা তাঁকে হলে ঢুকতে দেবো না। কিন্তু তাঁকে আটকানো আমাদের সাধ্যের বাইরে ছিল। আমরা তাঁকে কিছুই বললাম না। এরই মধ্যে তিনি হলের দিকে রওয়ানা দিলেন। তাঁকে কোন ক্রমেই আটকানো যাচ্ছিল না। তিনি মঞ্চে প্রায় উঠেই যাচ্ছিলেন, এমন সময় আমি গিয়ে তাঁকে আগলে দাঁড়ালাম। কিন্তু তিনি আমাকে এড়িয়ে পায় পায় সভাপতির আসনে যেয়ে বসে পড়লেন। অনুষ্ঠানের লোকজনরা বেশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো। কি করবে কিছু স্থির করতে পারছিল না। তাঁর অবস্থা একেবারে যাচ্ছেতাই। কিছুক্ষণ তিনি আসনে বসে ঝিমুচ্ছিলেন। কিন্তু যখন দাঁড়িয়ে মাইকের সামনে যেয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন তখন অবস্থা বড় সঙ্গিন হয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। বড় টলটলায়মান অবস্থা। বার বার পরনের পাতলুন ঠিক করার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলেন তিনি আর মাইকে কি যেন বলছিলেন তার কিছুই বুঝা যাচ্ছিল না।

গ্যালারী থেকে কে একজন বলে উঠলো, 'এতো দেখছি বদ্ধ মাতাল। তাকে বের করে দাও' বলতেই হলময় হৈ চৈ পড়ে গেল। একজন চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে রোষভরে চীৎকার করে বলল, 'পাকিস্তানের পাক মাটিতে এসবই চলবে নাকি?' অন্য একজন চীৎকার করে বলল, 'হলে মেয়ে-ছেলে রয়েছে কিন্তু।'

ওদিকে আখতার শিরানীর কোন খেয়াল খবর ছিল না, তিনি বলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না। তাঁর কণ্ঠস্বরও শোরগোলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতি যখন চরমে পেঁাছল বন্ধুবান্ধব ক'জন মিলে বলপূর্বক তাকে হলের বাইরে নিয়ে গেল। এদিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য শোরশ্ কাশ্মিরী দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর ওজস্বী বক্তৃতায় সারা হল মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল।

এরপর আখতার সাহেবের সাথে আমার দেখা হয় মেয়ো হাসপাতালে। আমি পারভেজ ফিল্মস্ প্রোডাকশনের জন্যে একটি চিত্র-কাহিনী লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। একদিন আহমদ নদীম কাশেমী এসে বলল, 'শুনলাম, আখতার সাহেব দু'তিন দিন থেকে মেয়ো হাসপাতালে ভীষণ অসুস্থ অবস্থায় আছেন। এই দুদিনে আমরা কি তাঁর কোন উপকারে আসতে পারি না?'

আমরা একটা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করছিলাম। মাসুদ পারভেজ একটা বুদ্ধি বাৎলে দিলেন। তাঁর দু'তিনটা গজল বা কবিতা 'পারভেজ প্রোডাকশনের' জন্য নেয়া হোক এবং বিনিময়ে তাঁকে শ' পাচেক টাকা দেয়া হোক। প্রস্তাব মন্দ নয়, আমরা তখনি গাড়ীতে উঠলাম এবং মেয়ো হাসপাতালের দিকে চললাম।

হাসপাতালে রোগীদের দেখার জন্য আলাদা সময় নির্ধারিত ছিল। এজন্যে আমরা ওয়ার্ডে যাবার অনুমতি পেলাম না। কর্তব্যরত ডাক্তারের সাথে দেখা করে যখন বললাম, 'আমরা আখতার শিরানীর সাথে দেখা করতে চাই।' তিনি আফসোস করে বললেন, 'কোন লাভ নেই। হাসপাতালে ভর্তি হবার পর থেকে তিনি বেহুঁশ অবস্থায় আছেন।'

একথা শুনে আমরা তাঁকে দেখার জন্যে আরো ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। অবশেষে বাধ্য হয়ে ডাক্তার সাহেব আমাদের নিয়ে চললেন।

যেয়ে দেখি আমাদের রোমান্টিক কবি, সালমা এবং আজরার প্রেমিক নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ে আছেন। চারদিকের কাপড় চোপড় বেশবাস ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। অস্বাভাবিকভাবে তার শ্বাস চলাচল করছিল। আমরা তার অবস্থা দেখে সত্যি ঘাবড়ে গেলাম।

আমরা ডাক্তার সাহেবকে বললাম, 'আমরা কি তার কোন উপকারে আসতে পারি?'

ডাক্তার জবাবে বললেন,

'আমরা নিজেরাই তো প্রাণপণে চেষ্টা করছি তাকে বাঁচিয়ে তুলতে। কিন্তু তার অবস্থা খুবই জটিল। যকৃত এবং ফুসফুস প্রায় নিষ্ক্রিয়। পেটের তন্ত্রীগুলো পর্যন্ত নিস্পন্দ। তবে হার্ট'টা এখনো ভাল আছে, এইটুকুই একটু ভরসা।'

তারপরও আমরা যখন জানালাম এ অবস্থায় তার কোন না কোন কাজে সাহায্য করতে চাই, তখন ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আচ্ছা, এক কাজ করুন, আমি একটা ওষুধের নাম বলছি। যদি পারেন সংগ্রহ করে দিন। পাকিস্তানে পাবেন না, সম্ভবত হিন্দুস্থানে পাবেন।'

ডাক্তার সাহেবের কাছ থেকে ওষুধের নামটা লিখে নিলাম এবং আমি ফয়েজ সাহেবের কাছে পৌঁছে সব কিছু খুলে বললাম। তিনি তখনই অমৃতসরে টেলিফোন করে তাঁর পত্রিকার এজেন্টকে বললেন, যে ভাবেই হোক ওষুধটি সংগ্রহ করে যেন পাঠায়। কিন্তু আফসোস, ওষুধ পাওয়া গেলনা। পারভেজ সাহেব দিল্লীতে টেলিফোন করলেন, কিন্তু সেখানেও ওষুধটি পাওয়া গেলনা। ততদিনে আখতার সাহেব বেহুঁশ অবস্থাতেই তাঁর কাব্যপ্রিয়া সালমা এবং আজরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন।

কোকিল-কণ্ঠি নূরজাহান

নূরজাহানকে সম্ভবত আমি প্রথমবার 'খান্দান' ছবিতে দেখি। তখনকার দিনে সে 'বেবী' ছিল। যদিও রূপালী পর্দায় তাকে বেবীর মতো দেখানো হয়নি। একজন তরুণীর দেহে পূর্ণতার যেসব চিহ্ন থাকা প্রয়োজন তার দেহে সেই পূর্ণতার লক্ষণ পরিস্ফুট ছিল যা সে সময় মত প্রদর্শন করতে অপারগ ছিল না।

সেকালে নূরজাহান সিনেমা দর্শকদের জন্য বিতর্কের বস্তু ছিল, এবং সে দর্শকদের মধ্যে প্রলয় কাণ্ডের মত প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু আমার কাছে তার 'শেকেল-ছুরতে' এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল বলে মনে হয় না—একমাত্র তার দুর্দান্ত গলা ছাড়া। সায়গলের পরই আমি নূরজাহানের গলার প্রতি আকৃষ্ট। এমন দরাজ কণ্ঠ অপূর্ব খরজ ও তীক্ষ্ণ তীব্র শাণিত পঞ্চম আর কারো কণ্ঠে শুনিনি। আমি মনে করি যে, এই মেয়েটি একটি তান এক ঘণ্টা ধরে রাখতে পারে—যেমন বাজিকরেরা শূন্যে লম্বা দড়ির ওপর স্থির হয়ে থাকতে পারে।

নূরজাহানের কণ্ঠে এখন আর সেই লালিত্য, সেই মাধুর্য, সেই কোমলতা ও প্রাঞ্জলতা নেই—যা' তার কণ্ঠের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। যদিও লতা মুঙ্গেশকরের ঐন্দ্রজালিক কণ্ঠ আজ সর্বত্র আদৃত হচ্ছে—তবুও, যদি কখনও নূরজাহানের কণ্ঠ শোনা যায় তাহলে শ্রুতি তাকে উপেক্ষা করতে পারবেনা।

নূরজাহান যে একজন উস্তাদের মত সঙ্গীতবিদ্যায় পারদশিনী তা খুব কম লোকই জানে। ঠুমরী, খেয়াল, ধ্রুপদ সবই সে গাইতে পারে এবং তা অত্যন্ত সুষ্ঠু ও নিখুঁত ভাবেই গেয়ে থাকে। এই সঙ্গীত বিদ্যা সে অর্জন করেছে তার জন্মস্থান থেকে এবং সেখানকার পরিবেশ ছিল

সঙ্গীতশিক্ষার জন্য অত্যন্ত উপযোগী, কিন্তু খোদাপ্রদত্ত একটা বস্তুও ছিল। সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ জ্ঞান থাকা সত্বেও যদি গলায় দরদ না থাকে তাহলে সেই প্রতিভা শ্রোতাদের নিকট গ্রহণীয় হয় না।

নূরজাহান সঙ্গীতও জানতো এবং খোদাপ্রদত্ত কণ্ঠেরও অধিকারিণী ছিল।

এখানে আমি আপনাদের একটা মজার কথা শোনাই। খোদা যাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তারা প্রায়ই তার অপব্যবহার করে থাকে। আমি দেখেছি, তারা এ সবের কোনই পরোয়া করে না। বরং ইচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞানতার প্রতি উঠে-পড়ে লেগে যায়। আর তা নষ্ট হয়ে যায় অবলীলাক্রমে।

মদ গলার জন্য অত্যন্ত অপকারী কিন্তু সায়গল অত্যন্ত মদ্যপ ছিলেন। টক এবং তেলে-ভাজা খাবার গলার জন্য ক্ষতিকর একথা কে না জানে কিন্তু নূরজাহান প্রায় একপোয়া তেলের আচার খেয়ে ফেলতো। আরও মজার ব্যাপার এই যে, যেদিন তাকে সিনেমায় গান গাইতে হতো সেদিনই বিশেষ করে বেশী পরিমাণ আচার খেতো। তারপর বরফ দেয়া পানি খেয়ে মাইক্রোফোনের সামনে যেত।

অশোককুমারকেও আমি বরফ খেতে দেখেছি। যখনই গান রেকর্ড করতে যেত তখন সব সময় তাকে বরফের টুকরো চিবোতে দেখা যেত।

যতদিন রেকর্ডের অস্তিত্ব থাকবে স্বর্গত সায়গলের কণ্ঠও ততদিন জীবিত থাকবে। অনুরূপ ভাবে নূরজাহানের কণ্ঠও বহুদিন বেঁচে থাকবে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কালেও সে কণ্ঠ মধু ঢালতে সক্ষম হবে।

নূরজাহানকে আমি শুধু পর্দায় দেখেছিলাম। আমি তার 'শেকেল-ছুরত' এবং অভিনয়ে কখনো আকৃষ্ট হইনি। শুধু তার কণ্ঠ শুনে অভিভূত হয়েছিলাম। তার বয়েসও ছিল কম তাই আমি বিস্মিত হয়েছিলাম যে, এত অল্প বয়সে সে এত ভাল গান শিখলো কি করে? সেকালে খুরশীদও শ্রোতাদের কম প্রভাবিত করে নি—শামশাদও আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু নূরজাহানের কণ্ঠের নীচে সবার কণ্ঠ তলিয়ে গেল।

সুরাইয়ার উদ্ভব এদের পরে। আমার দুঃখ হয় যে, সায়গল-সুরাইয়া জুটির ছবি হল, কিন্তু নূরজাহান-সায়গলের জুটি হলোনা। জানি না

প্রডিউসরদের মাথায় এই জুটির কথা কেন ঢোকেনি। এই জুটি কোন ছবিতে রীতিমত নামলে সঙ্গীত-জগতে এক বিপ্লবের সূত্রপাত হতো।

নূরজাহানের সাথে আমার কবে সাক্ষাৎ হয়, কখন হয়, কোথায়, কেমন করে এ কাহিনী অত্যন্ত দীর্ঘ। আমি কয়েক বছর বোম্বাইতে অবস্থানের পর বিভিন্ন কারণে বিরক্ত হয়ে দিল্লী চলে যাই এবং অল-ইণ্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করি। কিন্তু এখানেও মন বসল না। বোম্বাই থেকে 'মুসাব্বির' পত্রিকার সম্পাদক নজীর লুধিয়ানবীর কয়েকটি চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, "তুমি এখানে চলে এস। খান্দানের পরিচালক শওকত হোসেন রিজভী বোম্বে এসেছেন এবং আমার কাছেই অবস্থান করছেন। তাঁর ইচ্ছা যে তুমি তাঁর জন্য একটা নতুন কাহিনী লিখে দেবে।

আমি দিল্লী ত্যাগ করলাম এ হ'ল সে সময়কার কথা যখন ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। সম্ভবত ১৯৪০ সালের ৭ই আগষ্ট আমি বোম্বে পৌঁছি। শওকতের সঙ্গে আমার দেখা হল ক্লেয়ার রোডের ১/১৭, ডেলফি চেম্বারে। এটা তার অফিস ও আবাস উভয়ই ছিল।

বড়ই সুগঠিত দেহের অধিকারী ছিল শওকত। ফর্সা রং, গাল দুটোর লালিমা আর অতি সূক্ষ্ম জন গিলবার্ট ধরনের এক জোড়া গোঁফ; কোঁকড়া চুল, দীর্ঘদেহী সুন্দর পরিচ্ছদ, পরিচ্ছন্ন পাতলুন, সদ্য পাটভাঙ্গা কোট টাই-এর নটটাও নিখুঁত, একটু দুলে দুলে হাঁটে। আমি প্রথম দর্শনেই তার অকপট বন্ধু বনে গেলাম।

আমি দিল্লী থেকে আসার সময় আমার প্রিয় ব্রাণ্ড 'ক্রাভেন-এ' সিগারেট প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে এনেছিলাম। কারণ যুদ্ধ শুরু হয়েছে--বোম্বেতে এই সিগারেট প্রায় দুষ্প্রাপ্য। শওকত আমার কাছে পঁচিশ টিন ও প্রায় পঞ্চাশ প্যাকেট সিগারেট দেখে অত্যন্ত খুশি হল।

আমরা দু'জন তখন ১/১৭, ডেলফি চেম্বারে থাকতাম। দুটো কামরা ছিল জাহাজী সাইজের। একটায় ছিল অফিস অপরটি ছিল শয়ন গৃহ। কিন্তু আমরা অফিসেই শুয়ে থাকতাম। মির্জা মুশাররফ এসে আমাদের বিছানা বিছিয়ে দিত।

শওকত যতদিন ওখানে ছিল ততদিন বেশ আনন্দেই দিন কাটত। 'ক্রাভেন-এ' সিগারেট আর নাসিকের হরিণ মার্কা হুইস্কির পেছনে পয়সা

উড়তো। শওকত 'খান্দান' তৈরীর পর একজন বড় ডাইরেক্টর বনে গেলো। কিন্তু লাহোর থেকে বোম্বে এসে কিছুদিন থাকবার পরই তার সব কিছু খরচ হয়ে গেল।

অবস্থা বড়ই নাজুক ছিল। আমি ৭ই আগষ্ট বোম্বে পৌঁছি এবং ৯ই আগষ্ট যখন টেলিফোন করতে যাই, দেখি সব লাইনই ডেড। পরে জানতে পারলাম যে, কংগ্রেসী লীডারদের গ্রেফতারী তৎপরতা চলছিল তাই নিরাপত্তার খাতিরে সমস্ত টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে।

গান্ধীজী, জওয়াহেরলাল নেহরু, মওলানা আজাদ প্রমুখ নেতাকে গ্রেফতার করে কোন অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করা হয়েছে। শহরের অবস্থা গুলীভরা বন্দুকের মত। বাইরে বের হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কয়েক দিন পর্যন্ত আমরা হরিণ মার্কা হুইস্কি খেয়েই চালালাম। এই সময়ে ফিল্ম-ইণ্ডাস্ট্রিতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যেহেতু পরিস্থিতি ছিল অনিশ্চিত—তাই কে ফিল্ম তৈরীর ঝুঁকি নেবে! অতএব যাদের সঙ্গে ছবি করার জন্য শওকতের আলাপ আলোচনা চলছিল তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হয়ে গেল এবং আমরা নজীর লুধিয়ানবীর বাড়ীর রান্না বিস্বাদ খাবার খেয়ে দিন কাটাতে লাগলাম। কিন্তু তবু কখনো কখনো জীবনের স্পন্দন শুরু হত এবং আমরা ছবির কাহিনী নিয়ে মাঝে মাঝে আলাপ আলোচনা করতাম।

এই সময় শুনতে পেলাম নূরজাহানও বোম্বে এসেছে। শওকতের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই আমি জানতে পেরেছিলাম সে কথা।

মহমে আমি কয়েকজন আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে গেলাম। তাছাড়া রেডিও আর্টিষ্ট 'সামীনা'রও ঠিকানা আনতে গেলাম। পেরে সামীনার সাথে কৃষন চন্দরের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই মেয়েটিকে আমি 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও দিল্লী' থেকে বোম্বে পাঠিয়েছিলাম। কেননা তার ফিল্মে কাজ করার শখ ছিল। তাকে আমি পৃথ্বীরাজ ও ব্রজমোহনের কাছে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। এখন আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে, সে ফিল্মে কাজ পেল কিনা।

মেয়েটি অত্যন্ত চালাক ছিল এবং অভিনয়ও বেশ ভালই করত। ডায়ালগ বলতে পারত খুব সুন্দরভাবে এবং চেহারাও ভালো ছিল; এ জন্য আমি আশান্বিত ছিলাম যে, নিশ্চয়ই সে এ লাইনে সাফল্য অর্জন করবে।

আমি জানতে পারলাম যে, সে শিবাজী পার্কের কোন একটা জায়গায় থাকে। কিন্তু জায়গাটা এতবড় যে, 'সামীনা খাতুনে'র খোঁজ পাওয়া খুবই মুশকিল। তাই আমি নিজামী সাহেবের ওখানে গেলাম—তিনি ক্যাডল রোডের একটা বাড়ীতে থাকতেন। তাঁর ঠিকানা আমি জানতাম; কেননা তিনি প্রায়ই আমাকে চিঠি লিখতেন। ইনি সেই নিজামী যিনি মমতাজ শান্তিকে তালিম দিয়েছিলেন এবং ওয়ালী সাহেব যার কাছে কয়েক বছর ধর্ণা দিয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে নিজামী সাহেবের আদর্শ অনুসরণ করেই তিনি মমতাজ শান্তিকে নিয়ে পলায়ন করেন। ইনি সেই নিজামী—যাঁর স্ত্রী গীতা নিজামী সিনেমা-জগতে পরিচিতা ছিলেন এবং অবশেষে তাঁর স্বামীকে ধোঁকা দিয়ে পরপর কয়েকজনের সাথে বিয়ের গাঁটছড়া বাঁধেন। তাঁর নামে আদালতে কয়েকটি মকাদ্দমাও দায়ের করা হয়েছিল এবং বর্তমানে তিনি একটি সুন্দরী মেয়ে সঙ্গে করে ডান্সিং পার্টি করে দেশে দেশে পাকিস্তান প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

নিজামী সাহেবের সাথে আমার পরিচয় ছিল শুধু পত্রের মাধ্যমে এবং তাও অতি নিয়মানুগ।

নিজামী সাহেব যিনি ধুতি আর গেঞ্জী পরে বসেছিলেন, আমাকে আগ্রহের সাথে স্বাগত জানালেন। তিনি আমাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার পর তিনি বললেন, 'সামীনা খাতুন' এখনই আপনার সামনে হাজির হচ্ছে।

তার একজন আধমরা গোছের হিন্দু ম্যানেজার ছিল, তাকে তিনি হুকুম করলেন, মান্টো সাহেবের জন্য এখনই সামীনা খাতুনকে হাজির কর। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন ঃ 'আমি আপনার সব রকম সেবার জন্য প্রস্তুত।' অতএব তিনি তখনই আমার জন্য মৌখিক ভাবে একটা উত্তম ফ্লাট, দামী ফানিচার ও একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করে ফেললেন।

নিজামী যাই হোন, লোকে তাঁকে ‘ভেড়ুয়া’ বলে, বেদে বলে—যাই হোক না কেন, আমি তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। কিন্তু আমার নিজের চোখে দেখে তাঁকে একজন সংগ্রামী লোক বলে মনে হল, এবং তিনি তাঁর ‘বিদ্যায়’ পুরোপুরি দক্ষ ছিলেন। আমি সেদিন প্রথম সাক্ষাৎকারে দেখলাম যে, মমতাজ শান্তির ওপর তাঁর যে প্রভাব তা কোন পিতার পক্ষেও সম্ভব নয়। আর ওয়ালী সাহেব তাঁর সামনে এমনভাবে মাথা নুইয়ে ছিলেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি যেন একজন সহিস।

তিনি এই গৃহের বাদশাহ ছিলেন এবং সকলেই তাঁকে কর দিত। তাঁর কাজ ছিল শুধু প্রডিউসরদের মদ খাওয়ানোর দাওয়াত দেওয়া, ব্লাক মার্কেট থেকে পেট্রোল কেনা এবং মমতাজ শান্তিকে তার সাফল্যের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যে, তুমি যদি এই ভঙ্গিমায় হাসতে পার তাহলে অমুক প্রডিউসর তোমাকে কন্‌ট্রাক্ট দেবে। তুমি যদি অমুক শেঠের সাথে এইভাবে করমর্দন কর তাহলে সেই রাতেই আমার পকেটে দশ হাজার টাকা এসে পড়বে।

আমি সেখানে বসে হয়রান হয়ে দেখছিলাম যে, আমি কোন জগতে এসে পড়েছি। সেখানকার সব কিছুই আর্টিফিসিয়াল। ওয়ালী সাহেব নিজামীর আদেশে তাঁর শ্লিপার এনে পায়ের কাছে রাখলেন। তার মধ্যেও কৃত্রিমতা ছিল—খোদার কসম বলছি যে, কৃত্রিমতা ছিল আর মমতাজ শান্তি অত্যন্ত সাদাসিধে পোশাকে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পরদার জন্য পেরেক ঠুকছিল। নিজামী সাহেব বলছিলেন মাণ্টো সাহেব, এই মেয়েটি বড়ই সরল। সিনেমা-জগতে থেকেও সে আশে-পাশের কোন কিছুই জানে না। আর এসব হল আমার শিক্ষার ফল।

আমার মন বলছিল এ সবই ফ্রড, সবই জাল। কিন্তু নিজামী সাহেবের সামনে তাঁর প্রশংসা করতে হল।

কিন্তু কথা হচ্ছিল নূরজাহানকে নিয়ে। মমতাজ শান্তিকে তালিম দেওয়া এবং সৎপথে পরিচালনার সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে তিনিও বললেন যে, বর্তমানে নূরজাহানও তাঁরই আশ্রয়ে আছে এবং মমতাজ শান্তির মত শিক্ষা গ্রহণ করছে। তিনি বললেনঃ মাণ্টো সাহেব, যদি

এই মেয়েটি আরো কিছুদিন লাহোরে থাকতো তাহলে ওর সর্বনাশ হয়ে যেত এতদিনে। আমি ওকে এখানে আনিয়েছি এবং তাকে বলেছি যে, দেখ মেয়ে, শুধু ফিল্ম-স্টার হলে কোন ফায়দা নেই। কোন একটা অবলম্বনও চাই। আগে থেকেই প্রেম করার প্রয়োজন নেই, আগে উপার্জন করতে শিখ। যখন ব্যাঙ্কে তোমার প্রচুর টাকা জমে যাবে তখন কোন ভদ্রলোকের সাথে ঘরসংসার পেতে বস। সারা জীবন সে তোমার গোলামী করবে। আপনার মনে কি হয় মাণ্টো সাহেব, আপনি তো একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

আমার সমস্ত বুদ্ধিই নিজামী সাহেবের ফ্লাণ্টে ঢোকার আগে নীচে ফুটপাথে পড়েছিল। আমি কি জওয়াব দেব! ব্যস, একদম বলে বসলাম যে, আপনি মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি খুব খুশী হলেন। সুতরাং তিনি তখনই নূরজাহানকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তখনই টেলিফোনের ঘণ্টি বেজে উঠল এবং একটু পরই নূরজাহানের গলা শোনা গেল, 'এখনই আসছি, কামাল সাহেবের টেলিফোন এসেছে।'

নিজামী সাহেব একটু হেসে বললেন, "এই কামাল সাহেব হচ্ছেন সৈয়দ কামাল হায়দার আমরোহী" (পুকার খ্যাত কামাল))। নিজামী সাহেব আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'অবলম্বন যদি হয়, তাহলে কামালের চেয়ে ভালো অবলম্বন নূরজাহানের আর কে হতে পারে। কিন্তু আমি তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি যে, বিয়ে-টিয়ের ধারেও যেও না। কামাল রোজগার করতে পারে তার কিছু যদি নূরজাহান পায় তো ক্ষতি কি?'

আমি হেসে বললাম: 'আপনার মত গুরু যখন আছে তখন আর চিন্তা কিসের?'

নিজামী সাহেব খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠে তখন আমাকে একটা ফার্স্ট ক্লাস লেমন স্কোয়াস খাওয়ালেন।

নিজামী সাহেবের ফ্লাটে আমি এক নজর নূরজাহানকে দেখেছিলাম এবং আমার এই উপলব্ধি হয়েছিল যে, এই মেয়েটি যৌবনের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তার হাসির ভঙ্গিমা একটা ব্যবসায়িক ঢং রচনা

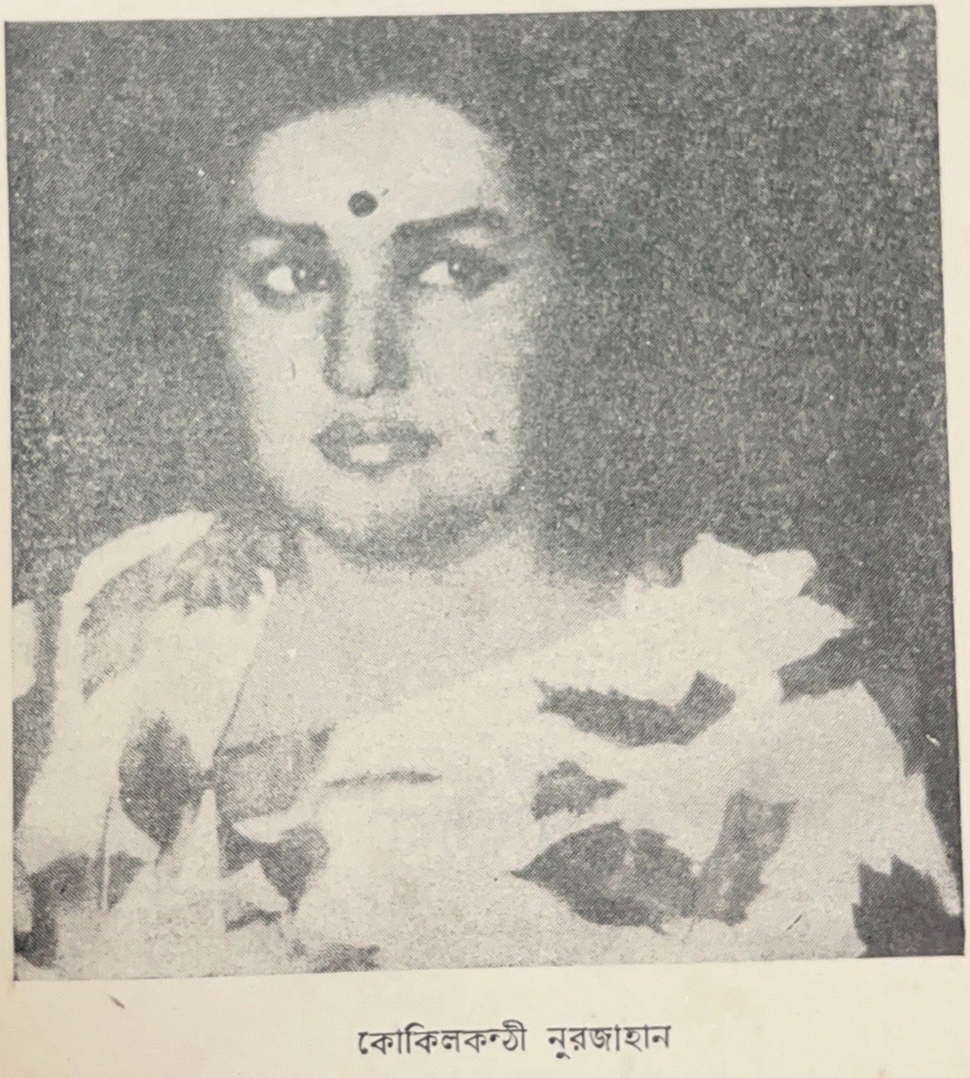

কোকিলকণ্ঠী নুরজাহান

করে রেখেছে—তার দেহে মেঘের সঞ্চারও ঘটছে—একদিন নিশ্চয়ই সে তার গুরুর যোগ্য শিষ্যায় পরিণত হবে।

সৈয়দ শওকত হোসেন রিজাভীর সাথে লাহোর পাঞ্চোলী স্টুডিওতে নূরজাহানের প্রেমালাপ শুরু হয়েছিল। এ নিয়ে মকদ্দমাও হয়েছিল। আত্মরক্ষার জন্য নূরজাহান আদালতে বিবৃতি দিয়েছিল যে, তার সাথে শওকত সাহেবের কোন সম্পর্ক নেই। সে তাঁকে ভাই এর মত মনে করে।

নূরজাহানের এই আদালতী ভাই এখন বোম্বে এসে গেছে।

আমি শওকতকে নূরজাহানের কথা বললাম যে, তার সাথে আমার দেখা হয়েছে। তখন পর্যন্ত আমি তাদের রোমাণ্টিক সম্পর্কের কথা জানতাম না। এবং বর্তমানে তাদের মনকষাকষি চলছে তাও জানতাম না। সে হুইস্কির গ্লাস জোরে টেবিলের ওপর রেখে বললো 'চুলোয় যাক।'

আমি একটু বিদ্রূপের সুরে বললাম, 'তো, হাজার বার যাক, কিন্তু সে তো তোমার 'খান্দানে' হিরোইন ছিল।'

হেসে বললো, 'মাণ্টো, কথা হল এই যে, আমি তার সম্বন্ধে কোন কথাই শুনতে চাইনে। আমি জানি সে বোম্বেতে আছে। সে আমার পেছনে এখানেও ধাওয়া করেছে। কিন্তু এখন আমার তার কোন প্রয়োজন নেই।'

আমি যখন তাকে বললাম যে, নূরজাহান কামাল আমরোহীকে টেলিফোন করে এবং নিজামীও চাচ্ছে যাতে এ দুজনের সংযোগ ঘটে তখন আমি অনুভব করলাম যে, বাইরে সে যতই অবজ্ঞা প্রদর্শন করুক না কেন; কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। সে তখনই হরিণ মার্কা হুইস্কির আধা বোতল মীর্জা মুশররফের কাছ থেকে চেয়ে নিল এবং আমরা অনেক রাত পর্যন্ত পান করলাম।

এরপর দীর্ঘকাল ধরে যখনই নূরজাহানের কথা উঠত তখনই আমি বুঝতে পারতাম যে, শওকত এখনও নূরজাহানকে তার মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। ভাই সম্পর্কটা ছিল কৃত্রিম। আসলে এই সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী তার হৃদয়-রাজ্যের অধিকারিণী ছিল, এমন কি দৈহিক সম্পর্কও

ছিল তাদের মধ্যে। তারা কোন দিনই বিচ্ছিন্ন হবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল।

একদিন আমি শওকতকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করলাম—"দেখ ভাই, সত্যি বলতো, তুমি এখনও নূরজাহানকে ভালোবাসো কিনা?" শওকত জোরের সাথে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল ঃ "হ্যা ভাই ভালবাসি, কিন্তু গোল্লায় যাক সে। আমি ধীরে ধীরে ওকে ভুলে যাব।"

কিন্তু নিয়তি তখন হাসছিল। সে যে সিদ্ধান্ত করেছিল সে সিদ্ধান্ত একেবারেই অটল। এর মধ্যেই ডাইরেক্টর ভি. এম. ব্যাসের সঙ্গে শওকতের কন্‌ট্রাক্ট হয়ে গেল। তিনি এর আগে নূরজাহানের সাথেও একটা ছবি তৈরীর জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন।

নূরজাহান বোম্বে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খবর পেয়ে গেলেন এবং তখনই তার সাথে কন্‌ট্রাক্ট করে ফেললেন। কেননা তিনি জানতেন যে, খান্দান ও অপর কয়েকটি ছবিতে সফল অভিনয় করার দরুন তার নামে যে-কোন ফাইন্যান্সিয়ারকে আটকানো সহজ হবে। আবার যখন তিনি জানতে পারলেন যে, খান্দানের ডাইরেক্টরও বোম্বে এসেছে তখন তিনি খুশিতে ফুলে উঠলেন। তিনি তখনই তাঁর কর্মচারীদের পাঠালেন। শওকত হোসেন রিজভীর সাথে কয়েকবার সাক্ষাতের পর তার সাথেও একটা ছবি তৈরির জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন।

কি ফিল্ম হবে, কেমন হবে, কাহিনী কি—এসব কারুর জানা ছিল না কিন্তু শেঠ ভি. এম. ব্যাস যখন নূরজাহান ও শওকতের সাথে তাঁর চুক্তিপত্র দেখালেন তখন তাঁর চাহিদা মাফিক টাকা পেতে বিন্দুমাত্রও কষ্ট হল না।

প্রকৃতির গতিই বিচিত্র। শওকতও জানত না যে, নূরজাহান 'সান-রাইজ পিকচারে' এসে গেছে আর নূরজাহানও জানত না যে, তার আদালতি ভাইও এই ছবিতে তার সঙ্গে আছে। বড়ই লম্বা কাহিনী। আমি সংক্ষেপেই বলি।

শেষে একদিন সবই প্রকাশ হয়ে পড়ল। নিজামী ভীত হলেন যে তাঁর পরিকল্পনা শেষে ব্যর্থ হয়। যে ছবি শওকত পরিচালনা করবে তার

নায়িকা হবে নূরজাহান। উভয়ের 'পুনর্মিলন' নিজামীর পক্ষে দুঃখজনক ছিল। অতএব তিনি নূরজাহানের অভিভাবকরূপে শেঠ ব্যাসকে বললেন যে, তিনি এসব সহ্য করতে রাজি নন। কিন্তু ব্যাস নিজামী সাহেবের চেয়েও ধূর্ত ছিলেন। তাই তিনি তাঁর গুজরাটি চালে পাঞ্জাবী কিস্তি মাত্ করে দিলেন। তিনি নিজামীকে রাজি করালেন যে, নূরজাহান শওকতের ছবিতে কাজ করবে, তাতে যত বিপত্তিই ঘটুক না কেন। সেখানে বসেই দুজন করমর্দন করলেন, উঠে কোলাকুলি করলেন এবং একে অপরকে ভাই বলে সম্বোধন করলেন।

এবার দুজনেই মনে মনে সন্তুষ্ট ছিলেন। শেঠ ব্যাসের সন্তুষ্টির কারণ ছিল যে, তিনি কাজ বাগিয়ে নিয়েছেন এবং নিজামীর খুশির কারণ ছিল যে, তিনি একজন ফিল্মীশেঠের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। শেঠ ব্যাস গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। নয়তো সেদিনই নিজামী সাহেব তাঁকে বাড়ীতে ডেকে এনে মমতাজ শান্তির হাতের রান্না মোরগ পোলাও খাইয়ে দিয়ে তাদের বন্ধুত্বের ভিত্ পাকা করে ফেলতেন। আর যদি শেঠ বোতল-রসিক হতেন তাহলে তাঁর আধমরা হিন্দু ম্যানেজারকে দিয়ে কালোবাজার থেকে দু'বোতল হুইস্কি আনিয়ে দিতেন।

এবার একটা মজার কথা শুনন। কথা তো পাকাপাকি হয়ে গেল। আমারও শেঠ ব্যাসের সঙ্গে একটা গল্প লেখার চুক্তি হয়ে গেল। আমি এবং শওকত গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করছিলাম। অগ্রিম টাকাও পেয়েছিলাম। মির্জা মুশররফ চাওলা এবং সায়গল (এরা বর্তমানে বড় ডাইরেক্টর) তখন আমাদের আরদালীর কাজ করত। আরো মজার কথা হল এই যে, মির্জা মুশররফ আমাদের সঙ্গেই পান করত, কিন্তু তৃতীয় পেগ পান করার পরই সে কাঁদতে শুরু করত। শওকতের হাত পা ধরত এবং যে সব সন্দেহ শওকতের মনে কখনও উদয় হয়নি সেই সব কথা বলত আর মাফ চাইত। তারপর কাঁদতে কাঁদতে সে তার নববিবাহিতা স্ত্রীর কথা স্মরণ করত। তারপরই শুরু হত গান। যদিও এসব ছিল ফ্রড অর্থাৎ কৃত্রিম, কিন্তু সিনেমা-জগতে এসব ছাড়া আর কিই-বা হওয়া সম্ভব।

শেঠ ব্যাস তাঁর ফিল্মের স্যুটিং শুরু করে দিয়েছিলেন। এর আগে যে সব সিনের চিত্র গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে নূরজাহানের কোন রোল ছিল না। অর্থাৎ নূরজাহান ও শওকতের সাক্ষাৎকার এখন পর্যন্তও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এক রাতে নোটিশ বোর্ডে দেখা গেল যে, নূরজাহান সেটে আসবে।

সেই রাতে আমি চলতে চলতে শিবাজী পার্কে রফিক গজনবীর বাসায় গিয়ে পৌঁছুলাম। এই খ্যাতনামা গীতিকার ও সংগীত পরিচালকের বিভিন্ন টাইয়ের বিভিন্ন প্রকার গেরোয় হরেক রকমের রোমান্স বাঁধা থাকত।

রফিক আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। তার ফ্লাটে পা দিয়েই দেখলাম যে, পুরো মহফিল জমে আছে। আমি বিনা দ্বিধায় ভেতরে গিয়ে হাজির হলাম। গিয়ে দেখি যে, সোফায় তার নতুন বৌ খুরশীদ ওরফে অনুরাধা বসে আছে। তার পাশে নূরজাহান। অপর একটা চেয়ারে মিসেস নিজামীজী বিরাজমান এবং মেঝের উপর আমার বন্ধু রফিক গজনবী এমন ভাবে বসে আছেন যেন কোন নতুন সোমনাথ অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

যাক এসব কথা। রফিক সোমনাথের উপর তার নতুন প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি একথা বলতে পারি না যে, নিজামী এবিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন কিংবা ছিলেন না এবং নূরজাহান নিজেও তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত ছিল না। খোদাই সব জানেন।

নিজামী সাহেবের কাছ থেকে আমি জানতে পারলাম যে, মমতাজ শান্তিও এখনই এসে পড়বে। আমার বিস্ময় বোধ হল একথা ভেবে যে, ওদিকে স্যুটিং হচ্ছে আর এদিকে হুইস্কির পালা চলছে। নিজামীর হাতেও গ্লাস আজে—নূরজাহানও ধীরে ধীরে রঙ্গীন পানীয় ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছিল। খুরশীদ ওরফে অনুরাধা তো পাঁড় মাতালের মত গট গট করে গিলে চলছিল।

আমি ঘরে ঢুকতেই সে তার অভ্যাস মত আমাকে একটা বড় গোছের গালাগালি দিল এবং পরক্ষণেই অতি বিনয়ের সাথে বলে উঠল "আসুন,

আসুন—বসুন।" নূরজাহানের দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "জান, এ কে?"

আমি বললাম "জানি।"

রফিক অবজ্ঞার সুরে বলল, "না, তুমি কিচ্ছু জানোনা। এ হল নূর-নূর-এ জাহাঁ। প্রাণের প্রশান্তি। খোদার কসম এমন গলা পেয়েছে যে বেহেশতের কিন্নরকণ্ঠী হুরও যদি শোনে তাহলে আকাশ থেকে নীচে নেমে আসবে ওকে অভিনন্দন জানাতে।"

আমি জানি রফিক কেন এই প্রশংসার সেতু রচনা করছে। মোদ্দা কথা; সে এই প্রশংসার সেতু অবলম্বন করে নূরজাহানের দেহ পর্যন্ত পৌঁছাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমার চোখে স্পষ্ট প্রতিভাত হল যে, নূরজাহানের এতে বিন্দুমাত্রও স্পৃহা নেই। সে রফিকের কথা শুনছিল এবং তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মাঝে মধ্যে কৃত্রিম হাসির মারফত তার জওয়াব দিচ্ছিল।

রফিক একজন হাড়-কিপটে লোক। কিন্তু সেদিন সে অস্বাভাবিক ভাবে হাতেমতাই-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তার বোতল থেকে একটা বড় পেগ সে আমাকে দান করল এবং অনুরোধ করল যে, ওটা যেন আমি এক চুমুকেই শেষ করে দিই। এমন সময় হঠাৎ টেলিফোনের ঘন্টি বেজে উঠল। খুরশীদ ওরফে অনুরাধা তার হাল্কা পাতলা কিন্তু সুন্দর হাত দিয়ে টেলিফোনের চোঙ্গা তুলে কানে লাগিয়ে অপর পক্ষের কথা শুনেই চঞ্চল হয়ে উঠল। নূরজাহানের দিকে ফিরে ভীত কণ্ঠে বলল—"শেঠ ব্যাস!"

নিজামী এতে একটুও বিচলিত না হয়ে বলে উঠলেন: "বলে দাও বেটী নূরজাহান এখানে নেই।"

খুরশীদ ওরফে অনুরাধা বলে দিল 'সে এখানে নেই।'

টেলিফোনের ব্যাপারটা শেষ হলে রফিক খুরশীদকে বলল: "শায়দা যাও ভেতর থেকে হারমোনিয়ামটা নিয়ে এস। শেঠ ব্যাস জাহান্নামে যাক।"

শায়দা হারমোনিয়ামের বাক্স খুল্‌ল, ঢাকনা তুলে বাতাস ভরে

নূরজাহান নিজের বিশিষ্ট ভঙ্গীমায় একটা সুর তুলল। রফিক ঝিমুতে লাগল আর মুখে বলতে লাগল 'বাহ্ সোবহান আল্লাহ।'

আমার ধারণায় রফিকের ওপর আল্লামা ইকবালের এই কবিতাটি খুব খাটে—

দেতে হ্যায় সুরুর আউওল
লাভে হ্যাঁয় শরাব আখির।

অর্থাৎ প্রথমে নেশায় মত্ত কর, পরে দেও পান পাত্র।

আপনারা পর্দায় নট-নটীদের অভিনয় দেখেন এবং তাদের অভিনয়ে মোহিত হয়ে যান। আমি এই নাটকের একটি দৃশ্য শুধু আপনাদের দেখাচ্ছি—যা সেদিন ওখানে অভিনীত হয়েছিল। জলজ্যান্ত শতকরা এক শ' ভাগ সত্যিকার নাটক।

নূরজাহান হারমোনিয়ামটি সোফার উপর রাখল। পাশে অনুরাধা ওরফে খুরশীদ, হাতে হুইস্কির গ্লাস। রফিক গজনবী কার্পেটের ওপর জোড়াসনে বসে আছে আর তার কামনালোলুপ চোখ দুটো নূরজাহানের মুখে, দেহে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং গান শুরু হওয়ার আগেই মাথা নাড়াতে শুরু করেছে। স্ত্রী নিজামী ডান পাশের চেয়ারে বিরাজমান রয়েছে, তার পাশেই এই অধম বসে।

নূরজাহান গাইতে শুরু করল সম্ভবত পিলু ঠুমরী—'তোরে নৈন কাজর বিন কারে'—এ সময় একটা মোটর বাইরে এসে দাঁড়াল। একজন মোটর থেকে বের হয়ে সোজা ভেতরে এসে পড়লেন। ইনি শেঠ ব্যাস।

ক্ষণেকের জন্য সবাই চকিত হয়ে উঠল—কিন্তু নিজামী তখনই অবস্থা আয়ত্তে আনতে সক্ষম হলেন। শেঠ ব্যাসের আগমন সম্বন্ধে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে চেঁচিয়ে খুরশীদকে বললেন: 'ওগো বাছা, একি জুলুম শুরু করেছ—সে ব্যথায় বাঁচে না আর তোমরা তাকে জোর করে গান গাওয়াচ্ছ। দেখ না একবার গেয়েই 'ওর হাল বিগড়ে গেছে'। তারপর তিনি নূরজাহানের দিকে ভীতি পূর্ণ চোখে চেয়ে বললেন, 'শুয়ে পড় বাছা, শুয়ে পড়।' শেষে নিজেই এগিয়ে গিয়ে তাকে শুইয়ে দিলেন। নূরজাহান জোরে জোরে কাতরাতে লাগল। রফিকও উঠে সংশয়পূর্ণ চোখে নূরজাহানকে দেখতে লাগল। নিজামী সাহেব এবার খুরশীদের

দিকে চেয়ে জোরে জোরে বললেন ঃ শায়দাঁ, ওঠ। বসে কি দেখছিস। শীগগীর গরম পানির বোতল নিয়ে এসো। খুব মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছে।

শায়দাঁ উঠে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল। নিজামী নূরজাহানকে সান্ত্বনা দিতে লাগল, তারপর শেঠ ব্যাসের দিকে চেয়ে বললেন ঃ 'ভাইজান, এ হল সেই রোগ---প্রায়শ মেয়েদের হয়ে থাকে।'

শেঠ ব্যাস চুপচাপ বসে রইলেন। আমিতো দম বন্ধ করেছিলাম।

নিজামী সাহেব আবার নূরজাহানের যন্ত্রণাকাতর দেহের দিকে ফিরে চাইলেন এবং তাকে আশ্বাস দেওয়ার প্রচেষ্টা করতে লাগলেন। তারপর আবার এসে শেঠ ব্যাসের পাশে বসে পড়লেন এবং বলতে শুরু করলেন, 'কাল থেকে বেচারী ব্যথায় মারা যাচ্ছে—আমাকে বলছিল যে, চাচাজান, আমি শুটিং এ যেতে পারব না। কিন্তু আমি বললাম, না বাছা, এটা অশুভ লক্ষণ। বোম্বেতে এটা তোমার পয়লা ছবি, তার ওপর স্যুটিং-এর পয়লা দিন—এসব ছাড়াও শেঠ ব্যাস আমাকে ভাই বলেছেন, তুমি নিশ্চয়ই স্যুটিং-এ যাবে, এজন্যই আমি এখানে এসেছিলাম যে রফিকের কাছ থেকে কিছু ব্রাণ্ডি নিয়ে তার গাড়ী করেই স্টুডিও যাবো। আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার ক্ষতি আমারই ক্ষতি। আপনি তো আমার ভাই।'

শেঠ ব্যাস চুপ করে বসে রইলেন। নিজামী ছাড়া আর কারো মুখেই রা ছিল না। রফিক গজনবী দাঁতে নখ কাটছিল এবং আমি হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে চিন্তা করছিলাম যে, এ সব হচ্ছেটা কি?

কাহিনী ছিল আমার লেখা মিউজিক রফিকের—এবং শেঠ ব্যাস আমাদের মনিব—এমন সময় এসে হাজির হলেন—যখন আমরা একটু ফূর্তি করছিলাম।

নিজামী শেঠ ব্যাসকে তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় আরো অনেক কথা বললেন যে, যখন একে অপরকে ভাই বলেছি তখন মনে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়।

ততক্ষণে খুরশীদ গরম পানির বোতলটা এনে নূরজাহানের পেটের ওপর রাখল। এতে সে কিছুটা শান্ত হল। তারপর নিজামী সাহেব চুপসে বসে থাকা শেঠ ব্যাসকে বললেন ঃ 'আপনি তশরীফ নিয়ে যান।

আমি আর রফিক এখনই নূরজাহানকে নিয়ে আসছি।' তারপর স্বগতোক্তির মত বললেন: 'আমার মনে হয় খুরশীদকেও সাথে নিয়ে যাব। কারণ মেয়েদের ব্যাপারটা মেয়েরাই ভালো জানে।'

শেঠ ব্যাস উঠে তাঁর টুপিটা ঠিক করে মাথায় বসিয়ে চলে গেলেন—এবার সবার ধড়ে জান এল। নূরজাহান তার পেটের ওপরকার গরম পানির বোতলটা (ঠাণ্ডা পানি ভরা ছিল) সরিয়ে ফেলল। তারপর নিজামীকে জিজ্ঞেস করল : 'নিজামী চাচা, আপনি তো বলেছিলেন যেওনা।'

নিজামী গম্ভীর হয়ে উঠলেন : 'আরে বাপু আমি তোমার ভালোর জন্যই একথা বলেছিলাম—প্রথম দিনই যদি সুটিং এ যাও আর প্রডিউসরকে ফিরিয়ে না দাও, তাহলে তারা ঘাড়ে চেপে বসবে। আমার মমতাজকেই জিজ্ঞেস কর —যতক্ষন স্টুডিও থেকে গাড়ী না আসবে সাধ্য কি যে সে স্টুডিওয় যায়। আর গাড়ী আসার পরও আমি তাকে এক ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখতাম। রায়বাহাদুর চুনীলাল আমার বড় একজন সুহৃদ—তাঁকে পর্যন্ত গ্রাহ্য করিনি। কোন সময় এমনও হয়েছে তিনি নিজের গাড়ীতে করেই মমতাজ শান্তিকে নিয়ে গেছেন।

নিজামী আরো কিছুক্ষণ ধরে প্রডিউসর ও শিল্পীদের মধ্যেকার সম্পর্কের বিশদ বিবরণ অতি সুক্ষ্মভাবে বয়ান করলেন এবং যেসব কৌশল শিল্পীদের অবলম্বন করা উচিত সেসব রহস্যও বিবৃত করলেন। তারপর কথার মোড় ফিরে শওকত হোসেন রিজভীর ওপর কেন্দ্রীভূত হল। নিজামী জোরের সঙ্গে নূরজাহানের মাথায় এ কথা ভরে দিলেন যে, তার সাথে নূরজাহানের আর কোন সম্পর্ক নেই।

এই আলাপে আমাকে যোগ দিতে হল, কারণ শওকতের সাথে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গেছে এবং সে এ কথাও আমার কাছে স্বীকার করেছিল যে, সে নূরজাহানকে ভালবাসে। তারপর মীর্জা মুশররফের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, শওকত নূরজাহানকে ভুলবার জন্য অপরাপর মেয়েদের পেছনে ধাওয়া করছে।

স্বভাবত শওকত ছিল একজন ওয়াচ মেকার এবং এ বিদ্যায় সে দক্ষও ছিল—তাই প্রতিটি বস্তুই সে নিপুণতার সাথে মেরামত করতে

ভালোবাসত। কোন বিকৃত দ্রব্য, কোন বাঁকা চোরা পেরেক, কোন অনিয়মিত ঘড়ি, কোঁচকানো কাপড়, কোন বিশ্রী দাগ সে সহ্য করতে পারতো না। তার চরিত্রের একটা শৃঙ্খলা ছিল, যা একটা ভালো ঘড়িতে হয়ে থাকে। কিন্তু নূরজাহানের ব্যাপারে সে একেবারেই অসহায় ছিল। সেই ঘড়ির কলকব্জা সে কেমন করে মেরামত করবে—যে ঘড়ির নাম হল হৃদয়। যদি তা এমন কোন বস্তু হত—যা সে সামনে রেখে আই গ্লাস দিয়ে দেখতে পারত। যদি তার হেয়ার স্প্রিং ও ব্যালান্স স্টাফের বিকৃতি ধরতে পারত, তাহলে সে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে সব খুলে দেখতে পারত যে, দোষটা কোথায়—কিন্তু এ ব্যাপারটা তো মনের, হৃদয়ের।

ওদিকে নূরজাহান—যার গলায় অপূর্ব স্বরের মূর্ছনা—সেও ভাবত এবং চঞ্চল হয়ে উঠত যে, কি করে তার মন থেকে শওকতের স্মৃতি ঝেড়ে ফেলা যায়। সে বড় বড় উস্তাদের মত খেয়াল গাইতে পারত—কিন্তু একটি খেয়াল তার মন ও মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখত এবং এই খেয়াল হল তার প্রিয়তমের খেয়াল। সুন্দর সুপুরুষ শওকতের—যে তার জীবনের চরম আনন্দ দান করেছিল—যে তার দেহের শিরায় শিরায় সেই অনুভূতি জাগিয়ে ছিল—যা সঙ্গীতের ন্যায় একটি সুকুমার শিল্পও জাগাতে পারেনি। সে তাকে কি করে ভুলবে—যে তার দেহ সায়রে হাবুডুবু খেয়েছে দীর্ঘকাল।

শওকত সম্পর্কে আলোচনা শুরু হতেই নূরজাহান মুখে মুখে তার প্রতি বিতৃষ্ণা ভাব প্রদর্শন করল। তখন আমি সইতে পারলাম না—আমি তাকে বললাম, ''নূরজাহান, এ সব বাজে কথা যা তুমি বলছ আমি কসম খেয়ে বলতে পারি—সেটা তোমার মনের কথা নয়। আর শওকতের মুখেও তোমার সম্বন্ধে যা শুনি—সেটাও মিথ্যে। তোমরা আসলে একে অপরের জন্য পাগল। কিন্তু উভয়েই আত্মপ্রতারণা করছ। গতকাল সন্ধ্যায়ই ''মুসাব্বির''-এর অফিসে তোমাদের কথা আলোচনা হচ্ছিল। শুধু কালই নয়—প্রতিদিনই হয়। সে বলে, বাদ দাও ওর কথা। তোমার অবস্থা ঠিক তেমনি, তার কথা আলোচনার সময়ে আমি তোমার চোখে পানি দেখেছি। তোমাকে ছেড়ে সে বাঁচতে পারে না। জানি না তুমি কিভাবে তাকে মুগ্ধ করে রেখেছ।''

নূরজাহানের মনে ভাবান্তর শুরু হল।

আমি আবার বলতে শুরু করলাম ঃ "আত্মবঞ্চনা ত্যাগ কর। আমি স্বীকার করি যে, নিজামী সাহেব অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি কিন্তু প্রেম-ভালবাসা বাসির ব্যাপারে ও'র কৌশল অচল। ওসব দুনিয়ার আর সব বাজারে চলে থাকে—এখানে এসব হল অচল মুদ্রা।"

নিজামী সাহেব আমার বক্তৃতায় এতই ডুবেছিলেন যে, যখন তিনি অসম্মতিজ্ঞাপক ভাবে মাথা নাড়লেন তখন মনে হল যে, তিনি বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তখন আমি আরও এগিয়ে গিয়েছি। নূরজাহানের চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে পানি পড়ছিল, আমি বললাম ঃ "তোমরা দু'জনই বোকা। পরস্পরকে ভালবাস; কিন্তু তা গোপন করে রাখছ। কার কাছে—কার ভয়ে—এ দুনিয়ার লোক তো কারো ভালবাসা দেখতে পারে না। তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, লোকে ভালবাসবে না। মমতাজ শান্তির জীবন অবশ্যই ঈর্ষার বিষয়। নিজামী সাহেবের মতো সহৃদয় এবং জ্ঞানী চাচার নিয়ন্ত্রণে সে খোদার ফজলে আরও উন্নতি করবে। কিন্তু—(এখানে নিজামী সাহেবের দিকে ফিরে বললাম) 'কিন্তু নিজামী সাহেব, আপনার একথা অজানা নয় যে, প্রত্যেক লোকের একই চাচা কাজে লাগে না। যে উপদেশ আপনি মমতাজ শান্তিকে দিয়ে গড়ে তুলেছেন তা নূরজাহানের পক্ষে খাপ নাও খেতে পারে। কারণ দু'জনের স্বভাবে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আমি কি মিথ্যে কথা বলছি।"

আমি এবার নিজামী সাহেবকে এমন পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলাম যে, এখন আর তাঁর পক্ষে আমার কথায় সায় না দিয়ে উপায় ছিল না। এই সুবর্ণ সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে লাগলাম। আমি নূরজাহানের মন ও মস্তিষ্কের ওপর আরও চাপ দিলাম—হয়তো তার মন এর জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল—ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম। "তোমরা একে অপরের জন্য জন্মেছ এবং এখন যে তোমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করছ, এটা অত্যন্ত মারাত্মক।"

নিজামী সাহেব উঠে গেলেন কিন্তু তিনি খুশি ছিলেন না। কিন্তু তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি আমার সাথে রুক্ষ ব্যবহার করতে পারলেন না। তিনি আমার সঙ্গে খুব খুশি হয়ে কথাবার্তা বললেন এবং

জানালেন, আপনার জন্য ফ্ল্যাট ও ফার্নিচারের ব্যবস্থা প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছি। তিনি আরো বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে, আমি এতদিন কোথায় ছিলাম—ফ্ল্যাটের চাবি তাঁর ম্যানেজারের কাছে আছে এবং তিনি সব সময়ই আমারই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ব্ল্যাক মার্কেট থেকে পেট্রোল কেনার ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন। এছাড়া তিনি জানালেন যে, আমি যেন তাঁর দাওয়াত কবুল করি—তিনি আমাকে মুরগীর গোশত ও জনিওয়াকারের ব্লাকলেবেল দিয়ে আপ্যায়ন করবেন।

আমিও তাঁর কথার জবাবে যোগ্য শব্দ প্রয়োগের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করলাম। কিন্তু তিনি একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে গেলেন, আমি যেন তাঁর দাওয়াত কবুল করি। আমাকেও বাধ্য হয়ে তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হল; কিন্তু আমি জানতাম যে, নিমন্ত্রণে মুরগীর গোশত বা জনিওয়াকারের নামগন্ধও থাকবে না।

আমি জানতাম যে, নূরজাহানের কামাল আমরোহীর প্রতি মাত্রও আকর্ষণ ছিল না। তার টেলিফোন আসত, কিন্তু সে তার জওয়াব দিত না। যখন সে তার সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ী নিয়ে আসত তখন নূরজাহান কোন কামরায় গিয়ে লুকিয়ে থাকত এবং নিজামীর কোন উপদেশই সে শুনত না।

এসব ব্যাপারে খবরাখবর আমার মারফত শওকতের কাছে পৌঁছুত। আমি আরও জানতাম যে, নূরজাহান ধূর্ত নিজামীর জালে আটকা পড়েছে—সেখান থেকে তাকে বের করা কঠিন কাজ। সুতরাং আমরা এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হলাম।

''মুসাব্বির'' সম্পাদক নজীর লুধিয়ানবী, আমি আর শওকত এই তিনজন ছিলাম। বৈঠকে প্রস্তাব নেওয়া হল যে, ক্যাডল রোডে একটা বাড়ী নেব।

নজীর লুধিয়ানবীর চেষ্টায়ই ক্যাডেল রোডের সমুদ্রতীরে নীচের তলায় আমরা একটা সুন্দর ফ্ল্যাট পেয়ে গেলাম। এতে তিনটে বাথরুম, কয়েকটি কামরা এবং একটা বড় ড্রয়িংরুম ছিল।

ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া হয়ে গেল—ভাড়া সম্ভবত একশ' পঁচাত্তর টাকা। ফার্নিচার ইত্যাদি এনে দু'সপ্তাহের মধ্যেই ঘরটা সাজান হয়ে গেল। শওকতের বেডরুম ছিল সমুদ্রের দিকে দরজাওয়ালা।

এখান থেকে পাঁচ শ' কদম চললেই নিজামীর ফ্ল্যাট। অর্থাৎ এখন নূরজাহান ও শওকতের মধ্যেকার ব্যবধান রয়ে গেল মাত্র পাঁচ শ' কদম।

আমার জিম্মায় যে কাজ ছিল সেটা আমি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলেছিলাম। কখনও নিজামীর ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হতাম। যদি নূরজাহানের দেখা পেতাম তাহলে বলতাম, শওকত আজ কতবার তার জন্য হায় হায় করেছে এবং তার বিরহে কেঁদেছে।

আমার মারফত নূরজাহান একথাও জানতে পেরেছিল যে, শওকত এখন তাদের পাড়ায়ই থাকে—এবং সে সাগর তীর ধরে পাঁচ শ' কদম গেলেই তার কাছে পেঁাছে যেতে পারে কিংবা শওকতও তার কাছে এসে পৌঁছুতে পারে।

এখানে আমি একটা কথা আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই। সেটা হল, আমি দু'জনের বিয়ের প্রবল বিরোধী ছিলাম। অভিনেত্রীদের সঙ্গে বিয়েশাদীর ব্যাপারটা আমার ধারণায় সঙ্গত নয়। দু'জন একত্রে বসবাস করুক—এ-ই যথেষ্ট। যখন ভাল লাগবে না তখন যার যার পথ দেখবে। কিন্তু শওকত তো দাসখত লেখার পক্ষপাতী ছিল। আমি তাকে অনেক বোঝালাম—সে তখন কথা মানল এবং আমাকে জানাল যে, যদি নূরজাহানের সাথে তার মিলন হয় তাহলেও সে তাকে বিয়ে করবে না।

তখন আমি আমার লেখা "নওকর"-এর পটভূমি লেখায় ব্যস্ত ছিলাম। এ ছাড়া ক্যাডল রোড ও বাইকুল্লার ব্যাবধানও বেশী ছিল—তাই শওকতের ওখানে যাতায়াত বেশ কমে গিয়েছিল। বেশ কিছুদিন পর আমি শওকতের ফ্ল্যাটে গেলাম। সব চুপচাপ। নজীর লুধিয়ানবী সকালে গোসল ও নাশতা সেরে অফিসে চলে গেছে। শওকত তখনও ঘুমিয়ে।

আমি তার শোবার ঘরে গিয়ে কড়া নাড়লাম। কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। তারপর আবার জোরে কড়া নাড়লাম—ভেতর থেকে শওকত তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বলে উঠল ঃ "কে?"

আমি বললাম ঃ "মান্টো।"

শওকত বলল ঃ "দাঁড়াও।"

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তিন মিনিট পর দরজা খুলল। ভেতরে ঢুকে দেখলাম ঘরের একমাত্র পালংকে নূরজাহান শুয়ে আছে। আমি দেখেই চেঁচিয়ে উঠলাম ''ইনকিলাব জিন্দাবাদ!''

নূরজাহানের চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছিল, এইমাত্র লণ্ড্রি থেকে তাকে ধুয়ে আনা হয়েছে। তাকে একটু চঞ্চল মত মনে হচ্ছিল, আমি তাকে বললাম ঃ ''তাহলে চিতোর গড় জয় করে নিয়েছ?'' শওকত হাসল—সে হাসিতে আত্মতৃপ্তির ভাব দেখা গেল। সে আস্তে করে বলল, ''এসো, বস।''

বলে শওকত বিজয় গর্বে একবার নূরজাহানের দিকে চেয়ে দেখল, নূরজাহান তখন চাদর মুড়ি দিয়ে খাটে শুয়েছিল। শওকত বলল ঃ 'কাঁচা সুতোয় বেঁধে নিয়ে এলাম।''

জানি না, সুতো কাঁচা না পাকা ছিল—তবে আমি এটা বলতে পারি সে সুতো হাতে পাকানো নয়—হৃদয় দিয়ে পাকানো। আর তা খুব ভালভাবে মাজা ঘষা ছিল। নয় তো পাঁচশ' কদমের ব্যবধান এত তাড়াতাড়ি কি করে অতিক্রম করল।

শওকত আমাকে বলল ঃ ''মাণ্টো, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।''

আমি আবার তাকে বললাম ঃ ''সে তোমার ইচ্ছে—কিন্তু আমার পরামর্শ হল যে, এটা তুমি ভালো করছ না। তুমি এ বিষয়ে তোমার আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে কোন পরামর্শ নিয়েছ?''

এ প্রশ্নের উত্তরে শওকত চুপ করে রইল।

বোম্বে শহরে তখন একজন হাকিম ছিলেন, তাঁর নাম ছিল আবু তাহের আশ্‌ক আজিমাবাদী। ইনি এক আজব বস্তু ছিলেন। বয়েস পঁচাত্তর বছর হলেও মন ছিল একেবারে তরুণদের মত। চোখের দৃষ্টিও বেশ পরিষ্কার ছিল। দাঁতও সব ছিল। তিনি প্রত্যেক ছবির প্রথম শো দেখতেন। পাঁচটি ভাষায় কথা বলতেন। ইংরেজী, পার্সী, আরবী, উর্দু ও গুজরাটি। খুব পরিশ্রমী লোক ছিলেন। হেকিমী চিকিৎসাও করতেন, আবার কাব্যচর্চাও করতেন। শওকতের সাথে আমি তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিই। সে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে যায় এবং তাঁকে চাচাজান বলে ডাকতে শুরু করে।

কয়েকদিন পর হাকিম সাহেব আমার কাছে এলেন। তাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম। আমার রচনার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তিনি অযাচিতভাবে আমাকে অনেক উপদেশ দিতেন। তাছাড়া তিনি আমাকে স্নেহও করতেন খুব। কেননা আমি সব সময়ই তাঁর সেবার জন্য উন্মুখ থাকতাম। কথায় কথায় তিনি আমাকে জানালেন যে, শওকতের সাথে নূরজাহানের বিয়ে হয়ে গেছে। এ খবরে আমি বিস্ময় বোধ করলাম। রীতিমত আকাশ থেকে পড়লাম আমি।

একথা আর ক'দিন গোপন থাকা সম্ভব? পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধের সাথে আমি আর কি তর্ক করব! আমার শুধু রাগ হচ্ছিল যে, শওকত কেন একথা গোপন করল। বিয়েই যদি করবে তবে তাতে আমার উপস্থিতিটা দোষের হবে কেন?

এরপর কিছুকাল গত হলো।

নিজামী একেবারে চুপসে গেলেন। এ দিকে সৈয়দ কামাল হায়দার আমরোহী টেলিফোন করে করে হয়রান হলো এবং অবশেষে সেও হতাশ হয়ে অন্য কর্মে ব্যাপৃত হল।

শওকতের বেডরুম আবাদ হয়ে গেছে। সেখানে সব সময় হৈ-হুল্লোড় আর আনন্দের ঢেউ বয়ে যেতে লাগল। নূরজাহানের কণ্ঠ থেকে মধু ঝরতে লাগল। রফিক গজনবীকে দিয়ে সুর করিয়ে রিহার্সাল চলত সব সময়।

আরেকটা ঘটনা শুনুন ঃ

আমার বড় ভাই ব্যারিস্টার সাঈদ হাসান বহুদিন ফিজি দ্বীপপুঞ্জে প্রাকটিস্ করতেন। একবার দেশে ফেরার পথে তিনি বোম্বে আসবেন বলে আমাকে খবর দিয়েছিলেন এবং তাতে লিখেছিলেন ঃ আমি যেন বোম্বে শহরে তাঁর জন্য একটা ফ্ল্যাট ঠিক করে রাখি। তখন আমি সপরিবারে মহমে থাকতাম। আমার ফ্ল্যাটটা খুবই ছোট ছিল। তাই আমি প্রথমে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। সেখানে 'মুসাব্বির' পত্রিকার সম্পাদক নজীর লুধিয়ানবীও উপস্থিত ছিলেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম শওকত আর নজীর যে ফ্ল্যাটে থাকে সেখানেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হোক। এক কামরায় ছিল নজীর, তাছাড়া ছিল শওকত আর নূরজাহান যাদের শুধু

একটা বেড্‌রুমের প্রয়োজন ছিল। অবশিষ্ট কামরাগুলো তাদের তেমন কাজে আসতোনা। তাই আমার ভাই সাহেব যিনি বিদেশী জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন--তাঁর জন্য সেখানে একটা বড় কামরার ব্যবস্থা করলাম। সুতরাং তিনি যখন বোম্বে এলেন এবং কয়েকদিন অবস্থান করবেন বলে জানালেন তখন আমরা তাঁকে ক্যাডল্‌ রোডে নিয়ে গেলাম।

তিনি কামরা দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। বাড়ীটা প্রায় নতুনই ছিল। আধুনিক ধরনের দোতলা। উপর তলায় বাড়ীওয়ালা থাকত। পেছনে সমুদ্রের দিকে প্রায় দু'শ কদম গেলেই একটা ছোট্ট বাগান পড়ত। সে বাগানে দোলনা ছিল ছেলেদের খেলবার জন্য।

সমুদ্রের হাওয়া সব সময়ই এখানে বইতে থাকত। এক এক সময় তেজ হাওয়ার জন্য সমুদ্রের দিকের সব দরজা জানালা বন্ধ রাখতে হত—যাতে ঘরের আসবাবপত্র পড়ে ভেঙ্গে চুরে না যায়।

ভাইজান তাঁর অল্প মালপত্র নিয়ে ওখানে উঠলেন। তাঁকে খুবই আনন্দিত দেখা গেল। কিন্তু কয়েকদিন পরই চরম ট্রাজেডী শুরু হয়ে গেল।

সিনেমা জগৎ হল রাতের জগৎ। দিনের বেলায় তারা নিজের নিজের বাসায় থাকে এবং সন্ধ্যা হতেই শওকতের বাসায় এসে জড়ো হত। তখন চলত হুইস্কির পালা, তার সাথে অট্টহাসি আর হৈ হুল্লোড়। তারপর কাহিনী পড়ে শুনাতো কেউ। এক এক সময় এমন গোলমাল হত যে উপর তলার লোককে বাধ্য হয়ে বলতে হত যে, তোমাদের জন্যে তো ঘুমোতে পারি না।

এক রাতে শওকত পরী চেহরা নাসীম বানুর স্তাবক কথিত মিঃ মুগনীকে দাওয়াত করল। সেখানে মির্জা মুশাররফ ছিল। আমিও সস্ত্রীক সেখানে উপস্থিত ছিলাম। খাওয়া দাওয়ার পরই আমি স্ত্রীকে নিয়ে সরে পড়লাম। কেননা আমার অন্যত্র একটা কাজ ছিল; ভাইজান শওকত আলীর পুত্র জাহেদ আলীর বাসায় নিমন্ত্রিত ছিলেন। অনেক রাতে তিনি ফিরে দেখেন যে, একদল মাতাল হৈ-হল্লা করছে। তাদের চীৎকারে কান ঝালাপালা, কারো কথাই শোনার উপায় ছিলো না। জানি না তিনি আর কি দেখেছিলেন। পরদিন সকালে তাঁর বিছানাপত্র

নিয়ে খেলাফত হাউসে গিয়ে উঠলেন এবং আমাকে আমার বন্ধুদের সম্বন্ধে এমন সব কটূক্তি করলেন যা আজও আমার কানে গরম সীসা ঢালার মত মনে হয়।

তিনি সারাজীবন শুধু আইনের বই পড়েছেন। মকদ্দমা চালিয়েছেন, আর ঘুরে বেড়িয়েছেন লাহোর, বোম্বে, পূর্ব আফ্রিকা ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জে। তিনি কি করে জানবেন সিনেমা জগতের কথা। এ জগতের প্রেমিক-প্রেমিকরাই বা কেমন হয়ে থাকে। খেলাফত হাউস যে গলিতে অবস্থিত সে গলির নাম হল 'লাভ লেন' অর্থাৎ প্রেমের গলি।

এবার নূরজাহানের দিকে ফেরা যাক। তার বড় বোন সেই ক্যাডল রোডেই গোপনে পতিতাবৃত্তি করত তার এক ভাই-এর সহায়তায়। আমি জানি মিঃ শওকত কখনও তাকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দিতনা।

নূরজাহানের ভাই একজন পাকা জুয়াড়ী ছিল। শেয়ার মার্কেটে জুয়া খেলত সে। তাই নূরজাহান ও শওকতের মিলন ঘটায় তার মনে দুঃখ হয়েছিল দারুণ। সে আবার চাচা নিজামীর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল যাতে এদের বিচ্ছেদ ঘটে এবং নূরজাহানকে দিয়ে নিজেদের সুবিধা করতে পারে। কিন্তু তাদের এ পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। শওকতকেও ভীতি প্রদর্শন করা হল, কিন্তু সেও শক্ত মানুষ ছিল। তাই তাদের তৎপরতা শেষ হয়ে গেল।

ফিল্ম 'নওকরের' স্যুটিং চলছিল। সুরারোপ করছিল রফিক গজনবী। সে খুবই মনোযোগের সাথে নিজের কাজ করত। কিন্তু আমি সব সময়ই অনুভব করতাম রফিক গজনবী সব সময় মনমরা হয়ে থাকত। তার কারণ এই যে, তারই নাকের ডগার সামনে আরেকজন এসে ছুকরীটাকে হাতিয়ে নিয়েছে।

যাইহোক, ফিল্ম নওকরের চিত্র গ্রহণের কাজ চলছিল। এই সময়ে আমার মনে হল যে, শওকত কোন একটা লোকের কাজে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না এবং ফিল্ম তৈরীর ব্যাপারে সে নিজেকে সবচে' বিজ্ঞ মনে করে থাকে। আমি তাকে কাহিনীর পুরো পটভূমিকা ও সংলাপ লিখে দিয়েছিলাম, সে তা পছন্দও করেছিল। কিন্তু পরে জানতে পারলাম যে, সে গোপনে আরও কয়েকজনকে দিয়ে সংলাপ লেখাচ্ছে। তাদের মধ্যে

আমার শ্রদ্ধেয় আশ্‌ক আজিমাবাদীও একজন। তাই আমি তীব্র ভাষায় শওকতের কাছে প্রতিবাদ জানালাম। শওকত বুদ্ধিমান ছিল—সে নানা কৌশলে আমার মাথা ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু আমার মন খারাপ হয়ে গেছিল। কারণ, কাহিনীও আমার মর্জি মত লেখা হয়নি এবং তার প্রত্যেক স্থানেই শওকত তার মর্জিমত অদল বদল করেছে।

আমি বরাবর একজন বদরাগী ও রগচটা লোক, কিন্তু তার সামনে আমার কোন প্রভাবই খাটত না। তাছাড়া কিছুদিন তার সঙ্গে কাজ করার পর আমার এ ধারণা জন্মেছিল যে, যে লোক আমার সাথে বসে হরিণ মার্কা হুইস্কি ও ক্রাভেন-এ সিগারেট উড়িয়েছে এবং আমার সব কথাতেই সায় দিয়েছে—সে ফিল্ম তৈরীর ব্যাপারে তার ঘড়ি নির্মাতার মস্তিষ্কের সাহায্যই নেবে—এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই আমি ও 'নওকরের' প্রোডাকশন থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে এলাম। তার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ ছিল, কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন রকম চিড় ধরেনি এতে। আমি প্রথমে বলেছি যে, দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির অবস্থা একেবারে খারাপ হয়ে পড়েছিল, কেউ যদি মঞ্চে দাঁড়িয়ে ''ইনকিলাব জিন্দাবাদ'' ধ্বনি দিত তাহলেই কয়েকটা ফিল্ম বন্ধ হয়ে যেত। তাছাড়া লড়াই এর জন্য কাঁচা ফিল্মও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। এই দুরবস্থার জন্য কোন ফিল্ম ডিরেক্টরেরই অবস্থা ভালো ছিল না। প্রডিউসারদের কাছেও বাহানার অন্ত ছিল না। টাকা কোথায় লড়াই শুরু হয়েছে—আজ ক্রিটের যুদ্ধ, কাল ফিনল্যাণ্ডে, পরশু জাপানী আক্রমণের আশংকা, কিন্তু সত্যি বলতে কি, প্রডিউসার ও মাড়োয়ারী পুঁজিপতিরা এই সময়েই তাদের ঝুলি ভর্তি করেছে বেশী।

এই সময়ে আরেক জায়গায় শওকত কণ্ট্রাক্ট পেল, সম্ভবত শেঠ জায়েরীর (জওহরীর বিকৃত বোম্বাই উচ্চারণ) সঙ্গে। লোকটা দারুন ধড়িবাজ ছিল—বড় বড় গুণ্ডা বদমাইশদের সাথে ছিল তার যোগাযোগ। কিন্তু যুদ্ধ তাকে শেঠ বানিয়ে দিল। এবার সে একটু আয়েশ আরাম করবার ইচ্ছে করল। তাই ফিল্ম কোম্পানী খুলল। দু'চারটে মোটরও কিনে ফেলেছিল সে। এই শেঠের সঙ্গে শওকতের কণ্ট্রাক্ট হল। সে তাকে তিন হাজার টাকা অগ্রিম প্রদান করল। তখন আমিও ছিলাম

শওকতের সঙ্গে। চেক ক্যাশ করার পর আমি তা সঙ্গে নিয়ে পোস্ট অফিসে গেলাম।

পোস্ট অফিসে গিয়ে সেই টাকার সবই শওকতের বাড়ীতে রেজেস্ট্রি বীমা করিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। আমার মনে হয় নূরজাহান আমার এই কাজ পছন্দ করেনি। কিন্তু তাতে আমার কি এসে যায় ?

এই সময়েই আমি শওকতকে জীবন বীমা করে নেবার কথা বলি। আমার কথা সে খুব কমই অমান্য করত। অতএব এভাবে দশ হাজার টাকার পলিসীও নেওয়া হয়ে গেল। আজ মনে হয়, আমার তখনকার কার্যাবলীতে কোন মুরুব্বীয়ানা ছিলনা—বালসুলভ চপলতা পরকে উপদেশ আর নিজের বেলায় উদাস থাকার নামান্তর।

নূরজাহান আরও সুন্দর হয়ে উঠেছিল। পুরুষের সান্নিধ্য নারীর সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। তার দেহে যৌবনের লাবণ্য বিকশিত হয়ে উঠেছিল। যে সব অপূর্ণতা লাহোরে পরিদৃষ্ট হয়েছিল বোম্বে এসে তা পূর্ণতা লাভ করল এবং এক বিমলানন্দে তার সারা দেহ ঝলমল করতে লাগল।

একদিন আউটডোর স্যুটিং ছিল। বোম্বাই-এর শহরতলীতে কারো একটা সুন্দর বাগান নির্বাচন করেছিল শওকত। ক্যামেরায় রেড ফিল্টার লাগিয়ে স্যুটিং চলছিল—যাতে দিনকে রাত বলে দেখানো যায়।

শওকত আমাকে অনুরোধ জানালো যে, আমিও যেন তার সাথে যাই। আমার একটু দেরী ছিল তাই শেঠ ব্যাসের গাড়ীতেই রওয়ানা হলাম। লোকেশানে গিয়ে নূরজাহানকে দেখলাম, তাকে দেখেই আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। বিচিত্র সাজে সেজেছিল নূরজাহান। মামুলী শালোয়ার কামিজ পরেছিল কিন্তু বড়ই চক্ষু পীড়াদায়ক।

শালোয়ারটা ছিল জালের তৈরী। ইংরেজীতে ওটাকে নেট বলা হয়। সাধারণত এ সব কাপড় পর্দার জন্য ব্যবহার করা হয়, জানি না এটা নূরজাহানই নির্বাচন করেছে না শওকত নিজে। কামিজও সেই একই কাপড়ের। এখন ভেবে দেখুন, এই কাপড়ে কি করে নূরজাহানকে আবৃত করা হয়েছে।

সেখানে শোভনা সমর্থও ছিল। নূরজাহানের এই সাজসজ্জা দেখে আলোর সামনে আমি অসহায়ের মত এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম— অবশেষে আমি শোভনা সমর্থের কাছে গিয়ে বসলাম। সে একপাশে লুকিয়ে ছিল।

শোভনা সমর্থ একজন শিক্ষিতা মহিলা। কথা বলতেও জানে। সে সম্ভ্রান্ত মারাঠী বংশের মেয়ে। তার মধ্যে 'হিলক-টান' (বোম্বের ভাষায় ছিনালী) ছিল না, খুব ভদ্র ও শিষ্ট। সেও এই ফিল্মে কাজ করছিল। তার সঙ্গে আমি একটা ঘাসের চাপড়ার ওপর বসে নূরজাহানের পোশাকের জ্বালা ভুলতে চেষ্টা করলাম।

আগেই বলেছি যে, ফিল্ম 'নওকরের' ওপর আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। শওকত তার খেলা খেলছিল—এবং আমি তাতে হস্তক্ষেপ করতে সংকোচ করতাম।

আমার বিস্ময়ের বিষয় ছিল যে, শওকত হল কট্টর হিন্দুস্তানী (উত্তর প্রদেশের লোক) আর সে হল পাঞ্জাবী—ধরতে গেলে 'জাটনী'—একটা গেঁয়ো মেয়ে, কিন্তু উভয়ে বেশ আনন্দে ছিল। শওকত পাঞ্জাবী ঢং-এ উর্দু বলত আর নূরজাহান উর্দু ঢং-এ পাঞ্জাবী বলার চেষ্টা করত।

ফিল্ম 'নওকর' তৈরী হয়ে যাওয়ার পর শওকতের সঙ্গে আমার সম্পর্কে ছেদ পড়ল। সে একাধারে প্রেম ও ব্যবসা শুরু করে দিল আর আমি আমার কাজে মত্ত হলাম।

শওকত প্রতিভাধর ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসায়ী লোক ছিল। সুতরাং সে যুদ্ধকালীন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে শুরু করল এবং কিছু দিনের মধ্যেই নিজস্ব ফিল্ম কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করল। একটা ভালো ছবিও সে তৈরি করল—যা বক্স অফিস হিট হয়েছিল। একেতো একজন দক্ষ পরিচালক ও সম্পাদক হিসেবে তার নাম ছিল, তারপর ফিল্ম কোম্পানী তৈরী করার পর সে শিল্প এলাকার ও নিজের প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

সাধারণত প্রডিউসার ডাইরেক্টরগণ ফিল্ম এ্যাকট্রেসকে এজন্যই বিয়ে করে না যে তারা তাদের ব্যবসায়িক জীবনের কর্মধারিণী মনে করে। কিন্তু শওকত কি উদ্দেশ্যে বিয়ে করেছিল—তা ঠিক বুঝা যায় না। কিন্তু আমি

বুঝতে পারি যে, সে নূরজাহানকে বিয়ে না করলেও তার উন্নতির কোন বাধা হত না। কেননা সে তার ব্যবসায় অত্যন্ত দক্ষ ব্যক্তি ছিল এবং গাধার মত খাটতে পারত।

জানিনা শওকত কেন আবার বোম্বে ছেড়ে পাকিস্তান এল। সম্ভবত সে একজন গোড়া মুসলমান বলে। যদি বোম্বাইতে কেউ মুসলমানদের সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য করত, তাহলে সে তখন স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে তার মাথার খুলি খুলে তার মগজ মেরামতের অপচেষ্টা করত। কিংবা এও হতে পারে যে, নূরজাহান তাকে বাধ্য করেছে যে, লাহোর তার অতি প্রিয় শহর। কেননা পাঞ্জাবীদের মতে 'লাহোর লাহোরই।'

বোম্বেতে সে খুব খ্যাতি অর্জন করেছিল। দু'একটা ফিল্ম সে এমন ভালো করেছিল যে, সে একজন সর্বজনস্বীকৃত ডাইরেক্টর বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। সে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করতে পারত সেখানে, কিন্তু সে পাকিস্তানকেই তার বাসস্থান বলে স্বীকার করল। পাকিস্তানের ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির পতনকে সে তার ঘড়ি নির্মাতার মস্তিষ্ক খাটিয়ে মেরামত করল। সে শোরীর ভস্মীভূত স্টুডিও পেয়ে গেল এবং সেটাকে একটা উন্নতমানের স্টুডিওতে উন্নীত করল।

আপনাদের খুব কম লোকেরই জানা আছে যে, শাহনুর স্টুডিওর ছোট থেকে বড় সকল কাজেই শওকত 'হোসেন রিজভীর' স্পর্শ রয়েছে।

লাহোরে এসে ও সে আমার বন্ধুই আছে, আমাকে সে সর্বপ্রকারে সহায়তা করত। একবার আমি তার কাছে গেলাম—তার গায়ের সাদা সার্টটায় বোতাম ছিল না। আমি বিস্ময় প্রকাশ করাতে সে হেসে জওয়াব দিল, 'কি করব ভাই, পয়সা নেই যে বোতাম কিনব।'

সিগারেট চাইতেই সে বলল, 'আমি কয়েকদিন থেকে ধারে সিগারেট খাচ্ছি।'

এ হল সেই লোকের অবস্থা, যার স্টুডিওর লোকেরা রেফ্রিজারেটরের পানি পান করে, যার বাগানে শত শত ফুল ফোটে, শত শত শ্রমিক যেখানে কাজ করছে, যার কাছে নূরজাহান রয়েছে'—দামী কাপড়-চোপড় সজ্জিত এবং মোটরে চড়ে যে ঘুরে বেড়ায়।

নূরজাহান সম্বন্ধে কয়েকটি অপবাদ শোনা যায় ; এবং কিছুটা হয়তো সত্যও বটে।

নূরজাহান একটু দাম্ভিক। তার তো সৌন্দর্যের ওপর গর্ব করার মত বস্তু ছিল না—শুধু এক গলা ছাড়া। এই গলায় ছিল অপূর্ব মাধুর্য। সেজন্য যদি সে বড়াই করে তাতে কোন আপত্তি উঠতে পারেনা। কিন্তু এ জন্যই যে বদমেজাজী হতে হবে তার কোন কারণ নেই।

আমার মনে আছে একবার আমার স্ত্রী বলেছিলেন ঃ 'আপনি তো নূরজাহানকে জানেন, সে কি আমাদের বাড়ীতে আসতে পারে না ?'

আমি বললাম ঃ 'কেন পারবেনা, হাজার বার আসতে পারে।'

আমি শওকতকে বলতেই সে পরদিনই আমার বাসায় তাকে পাঠিয়ে দিল। আমি অনেক একট্রেস দেখেছি—খ্যাতনাম্নী, উন্নত ধরনের কিন্তু ওদের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দৃষ্ট হয়নি।

নূরজাহান সবতাতেই কৃত্রিমতা প্রকাশ করছিল তার হাসি আলাপ সবই কৃত্রিমতায় ভরা ছিল। জানিনা এই কৃত্রিমতা তার চরিত্রে কোথা থেকে এল, কখনও এমনও মনে হত যে, তার এবং শওকতের দাম্পত্য-জীবনও হয়তো কৃত্রিম।

নূরজাহান জাঁকজমকের সঙ্গে এল। দেখা করল। আমি মনে করলাম যে, আমি এখান থেকে সরে পড়ি যাতে মেয়েরা খোলাখুলি আলাপ জমাতে পারে কিন্তু আমার স্ত্রীর এক বান্ধবীর অনুরোধে সেখানে থাকতে হল। তার ইচ্ছা, নূরজাহান যেন একটা গান করে।

আমি তাকে বললাম, 'নূরজাহান, এরা তোমার গান শুনতে চাচ্ছে, তুমি দু'একটা গান শুনিয়ে দাও।'

নূরজাহান পোশাকীভাবে জওয়াব দিল, 'না সাহেব, অন্য কোন সময় হবে—এখন গলা ঠিক নেই।'

আমি কাবাব হয়ে গেলাম, তার গলা ঠিকই ছিল, কেননা তার গলা তো ইস্পাতের তৈরী, যা কোন দিনই খারাপ হতে পারেনা। এটা শুধু ভান করছিল। আমি আবার তাকে বললাম, 'নূরজাহান এসব বাহানা এখানে চলবেনা। তোমাকে গাইতে হবে। আমিতো হাজার বার তোমার গান শুনেছি—কিন্তু এরা চাচ্ছে তোমার গান শুনতে। তাই

তোমাক ভালোমন্দ যাই হোক—গাইতেই হবে।' তবু সে আপত্তি করতে লাগল। তখন আমার স্ত্রী বললেন, 'সে যখন গাইবেনা কেন তাকে অনুরোধ করছ।' অনেক পীড়াপীড়ির পর শেষে সে ফয়েজের একটা গজল গাইয়ে শোনাল।

হতভাগী কি গলাই না পেয়েছিল, আর কি সুরেই না গেয়েছিল যে, এত বছর পরও আমার কানে সেই সুর মধুবর্ষণ করে চলেছে।

নূরজাহানের অনেক প্রেমিক ছিল—আমি এমন কতগুলো বাবুর্চিকে জানি, যারা নূরজাহানের ছবি উনুনের ধারে লটকে তার গাওয়া গান বেসুরো গলায় গাইত আর তাদের সাহেব মেমদের জন্য খাবার রান্না করত।

বাড়ীর চাকরদেরও জানি, যারা নিম্মি, নার্গিস এবং কামিনী কৌশলকে পছন্দ করত। কিন্তু নূরজাহানের পাগল অসংখ্য, কোথায়ও তার ছবি দেখলেই কেটে তাদের ভাঙ্গা বাক্সে রেখে দিত। এবং অবসর সময়ে বের করে চোখকে আনন্দ দান করত। নূরজাহানকে কেউ খারাপ বলেছে কি অমনি যুদ্ধং দেহী হয়ে রুখে দাঁড়াতো।

আর আমার ঘরেও একজন নূরজাহানের প্রেমিক আছে, সে যে-কোন সুন্দরী মেয়ে, কোন নববধূ কিংবা লাল পোশাক পরা মেয়েকেই নূরজাহান বলত। নূরজাহানের গাওয়া যত গান সবই তার কণ্ঠস্থ। সে নিজেও অত্যন্ত সুন্দর, কিন্তু নূরজাহানের কোন কোন বৈশিষ্ট্য তার কাছে এতো ভালো লাগল যে, সব সময়ই সে তার কথা বলত।

সে আমার নিকট-আত্মীয়। আমার ভাগিনেয়ের সন্তান। তার নাম শাহেদ জালাল। আমরা তাকে আদর করে টাকু বলতাম। তাকে আমরা অনেক বুঝালাম যে, নূরজাহানের কথা ছেড়ে দাও, সে বিবাহিতা মহিলা। তার ছেলেপিলে আছে, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না।

ফিল্ম দেখতো, তাতে যদি নূরজাহান না থাকে তখন তার মন বিগড়ে যায়। তাই ঘরে এসে নূরজাহানের গান গেয়ে সে গায়ের জ্বালা জুড়োয় এবং মা বাপকে বলে যে, আমি নূরজাহান ছাড়া আর কাউকেই চাইনে।

কয়েকদিন পর তার দাদা শওকত রিজভীর কাছে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, 'দেখ, তোমার স্ত্রীর একজন প্রেমিক জন্মেছে। সে

একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে তার জন্য। শেষে এমন না হয় যে তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। আর তুমি হাপিত্যেশ করতে থাক।'

সে খুব অধীর হয়ে উঠল, কারণ দাদা মিয়া তাকে এ সব কথা কেন শোনালেন, একটু অপ্রতিভও হয়ে গেল সে। তারপর জিজ্ঞেস করল কে এই লোকটা ! দাদা মিয়া বললেনঃ আমার নাতী।

'আপনার পৌত্র ? বয়েস কত ?'

মিয়া সাহেব বললেনঃ 'এই প্রায় চার বছর হবে।'

এটা অল্পদিনের কথা। নূরজাহাহান যখন একথা শুনল তখন খুব আনন্দ করল—সে বলল যে, আমি নিজেই গিয়ে আমার প্রেমিককে বিয়ে করব। শাহেদ জালালও খুব খুশী হল। নূরজাহান কখন এসে তাকে দুলহা বানাবে সেই প্রতীক্ষায় সে দিন কাটাতে লাগল।

এর কিছুদিন পরে নূরজাহানের আরেকটি প্রেমিকের কথা সোনা গেল তার বয়স চার বছর নয় অনেক বেশী। সম্ভবত সে নাপিত বা হাজাম ছিল, সব সময় তার গান গাইত আর তার কথাই বলত। একজন তাকে জিজ্ঞেস করল যে, তুমি কি সত্যি নূরজাহানকে ভালবাস ?

হাজাম গম্ভীরভাবে জওয়াব দিলঃ 'এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।' তার বন্ধু তাকে পরখ করবার জন্য বললো, 'যদি ভালোবাস তাহলে মহিওয়ালের মত নিজের মাংস কেটে দিতে পার তাঁকে ?'

হাজাম তখনই তার ধারালো ক্ষুরটা বের করে দিয়ে বন্ধুকে বললো, আমার দেহের যে জায়গার গোশ্‌ত পার কেটে নাও।

না জানি তার বন্ধু কেমন লোক ছিল, সে তখনই তার বাহু থেকে এক পোয়া পরিমাণ মাংস কেটে ফেলল, তারপর ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। হাজাম অতিরিক্ত রক্তপাতের দরুন অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

এই হতাশ প্রেমিককে যখন মেয়ো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল তখন একটু জ্ঞান ফিরতেই তার মুখ দিয়ে বের হল 'নূরজাহান !'

এ ছাড়া বর্তমানে নূরজাহানের নামে একটা মকদ্দমা চলছে। সে নবাগতা চিত্রতারকা নিঘাত সুলতানকে স্টুডিওর ভেতরে নিষ্ঠুরভাবে মেরেছিল। আদালতে আছে তাই সে সম্বন্ধে কোনকিছু বলা আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়তে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে,

নূরজাহান সেই মেয়েটিকে মারল কেন ? সত্যি বলতে কি, আমি খবরের কাগজে পড়ে নিঘাত সুলতানার নাম জানতে পারলাম। জানি না, এই মোহতারেমা কি করে কবে সিনেমায় এলেন ! শুনেছি তিনি ঢাকার বাসিন্দা হবে হয়তো—দেখা যাক, মকদ্দমায় কি হয়।

নূরজাহানের সুস্থ সুন্দর স্বামী জীবিত। সুন্দর সুন্দর সন্তানের জননী সে—যার জন্য লাহোরের হাজাম তার গোশত কেটে দিতে পারে। তার চার বছর বয়েসী প্রেমিক শাহেদ জালাল এখনও তাকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখে আর যেসব বাবুর্চি উনুনের পাড়ে তার ছবি রেখে থালা মাজবার সময় বেসুরো গলায় নূরজাহানের গাওয়া গান গায় এবং এমনি করেই তাদের দুঃখে গড়া জীবনকে সরস করে তোলে। আর অপরদিকে একজন আমি—যে, তার স্বল্প কাপড়ে নির্মিত বক্ষবাস দেখে চোখ বন্ধ করি। জানি না অত উঁচু করে বক্ষবাস পরার মধ্যে সে কি সৌন্দর্য খুঁজে পায়। আর সৈয়দ শওকত হোসেন রিজবী কি করে এসব সহ্য করে—যা সব সময়ই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।*

---

*এ প্রবন্ধ রচনার পর মাণ্টো আর বেশীদিন বেঁচে ছিলেন না। তাই নূরজাহানের জীবনের পরবর্তী বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্বন্ধে আর কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। তবে নূরজাহান আর বর্তমানে শওকত রিজভীর স্ত্রী নয়। তরুণ চিত্রনায়ক এজাজকে তিনি কয়েক বছর আগে বিয়ে করেছেন। বর্তমানে এরা লাহোরের অন্যতম সুখী পরিবার।